# উন্নয়ন সোপানে বাংলাদেশ

## প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দশটি বিশেষ উদ্যোগ

**উন্নয়ন সোপানে বাংলাদেশ : প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দশটি বিশেষ উদ্যোগ**

**প্রধান সম্পাদক**
আবুল কালাম আজাদ

**সম্পাদনা পরিষদ**
শাহরিয়ার শহীদ
আনিসুর রহমান
আশেকুন নবী চৌধুরী
মাহফুজা জেসমিন

**সার্বিক তত্ত্বাবধান**
বাসস ইনফোটেইনমেন্ট

**প্রকাশক**
বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা (বাসস)

**প্রকাশকাল**
ফেব্রুয়ারি ২০১৮

**প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ**
রফিক উল্যাহ

**মূল্য :** ৫০০.০০

**মুদ্রণ**
ডটনেট লিমিটেড

কপিরাইট © বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা
ISBN : 978-984-34-3622-1

বাংলাদেশ উন্নয়ন সোপানে এগিয়ে চলেছে। নিম্ন আয়ের সারি থেকে দেশ এখন নিম্ন-মধ্যবিত্তের কাতারে। এই সীমা অতিক্রমও অনতিদূর। এ দেশ এগিয়ে যাবে আরো অনেক দূর। ২০২১ সালে পূর্ণ ডিজিটাল বাংলাদেশ। ২০৪১ সালে দারিদ্র্যমুক্ত উন্নত দেশ।

এই এগিয়ে চলার পাথেয় সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা। অর্থাৎ তাঁর দেশ গড়ার সংগ্রাম, রাজনৈতিক দর্শন এবং অর্থনৈতিক পরিকল্পনা-যা বাস্তবায়ন করে চলেছেন অন্যতম বিশ্বনেতা মানবতার জননী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। দেশ গড়ার এই অঙ্গীকার ও অগ্রযাত্রা পিতা-কন্যার সম্পর্ককে ব্যক্তিগত পরিধি ছাড়িয়ে বাঙালি এবং বাংলাদেশের ইতিহাসে যুক্ত করেছে এক অনন্য মাত্রা।

বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও পথ ধরে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বেই এই সরকার বাস্তবায়ন করে চলেছে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচি। দেশের উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় 'মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দশটি বিশেষ উদ্যোগ' বাস্তবায়নের ফল সুদূরপ্রসারী।

বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা (বাসস) এই দশ বিশেষ উদ্যোগের ওপর নিয়মিত প্রতিবেদন প্রকাশ করছে। বর্তমান প্রকাশনাটি তারই সংকলন। বাসস-এর নিজস্ব প্রতিবেদকরা এবং বাসসের সেবা গ্রহণকারী বিভিন্ন দৈনিক সংবাদপত্রের সাংবাদিকরা প্রতিবেদনগুলো তৈরি করেছেন।

বাসস-এর সাংবাদিকরা বাংলা ও ইংরেজিতে প্রকাশিত এসব প্রতিবেদন অনুবাদ ও সম্পাদনা করেছেন। প্রকাশনার সার্বিক তত্ত্বাবধান করেছে বাসস ইনফোটেইনমেন্ট। সংশ্লিষ্ট ছবিগুলো বাসসের নিজস্ব সংগ্রহ এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট থেকে নেয়া হয়েছে।

উন্নয়ন সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে এ ধরনের কর্মকাণ্ড আগামীতেও অব্যাহত থাকবে, এটাই বাসসের অঙ্গীকার।

**আবুল কালাম আজাদ**
ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান সম্পাদক
বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা (বাসস)

বিশেষ উদ্যোগ ১

# একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প

"শেখ হাসিনার উপহার, একটি বাড়ি একটি খামার, বদলাবে দিন তোমার আমার"

## একটি বাড়ি একটি খামার

খুলনায় একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পের অনেক সদস্যই এখন স্বাবলম্বী ০৪
স্বাবলম্বী হয়ে উঠছে রাজশাহীর তানোর উপজেলার দরিদ্র জনগোষ্ঠী ০৬
রংপুরে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর ভাগ্য পরিবর্তনে একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প ০৭
২০২০ সালের মধ্যে ১ কোটি ৮০ লাখ লোককে দারিদ্র্যমুক্ত করার পরিকল্পনা ০৯
দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে ২০২০ সালের মধ্যে একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পের আওতায় আনার পরিকল্পনা ১১
36, 499 become self-reliant in Khulna through One House, One Farm project 13
Rural poor people attain financial solvency thru' self-employment 15
EBEK changing living of rural people in Rangpur 18
Govt targets freeing 1.80 crore poor from poverty trap by 2020 21
Govt plans bringing all poor under One House One Farm Project by 2020 23

## প্রকল্পের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

দেশের দরিদ্র মানুষের জন্য স্থায়ী তহবিলের ব্যবস্থা করা এবং ওই তহবিল আয়বর্ধক কাজে নিয়মিতভাবে ব্যবহার করে স্থায়ী আয়ের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য দূর করা।

## যেভাবে সমিতির তহবিল গঠিত হয়

১. একটি গ্রাম বা ওয়ার্ডের ৬০ জন দরিদ্র মানুষকে (৪০ জন মহিলা ও ২০ জন পুরুষ) নিয়ে একটি সমিতি গঠন করা হয়।

২. সমিতির সদস্যরা মাসে ২০০ টাকা সঞ্চয় করেন। ৬০ জন সদস্য মাসে ২০০ টাকা করে সঞ্চয় করলে বছরে জমা হয় ১ লাখ ৪৪ হাজার টাকা। তবে কম সঞ্চয় করলেও সদস্য হওয়া যায়।

৩. প্রকল্প হতে সঞ্চয়ের বিপরীতে সমপরিমাণ (১.৪৪ লাখ) টাকা বোনাস দেয়া হয়। তবে সঞ্চয়ের পরিমাণ কম হলেও প্রকল্প থেকে সমপরিমাণ টাকা বোনাস দেয়া হয়।

৪. ৬০ জনের সমিতিকে বছরে ১.৫০ লাখ টাকা ঘূর্ণায়মান ঋণ তহবিল হিসেবে প্রকল্প থেকে অনুদান দেয়া হয়।

৫. এভাবে ৬০ জন দরিদ্র মানুষের সমিতির ১ বছরে মূলধন হয় প্রায় ৪.৫০ লাখ টাকা এবং ২ বছরে প্রায় ৯.০০ লাখ টাকা।

## গঠিত মূলধনের মালিকানা এবং সঞ্চিত অর্থ ভাণ্ডার

গঠিত মূলধনের মালিকানা স্থায়ীভাবে সমিতির। এ অর্থ সমিতির নামে ব্যাংক হিসেবে রক্ষিত থাকে। তবে অর্থ লেনদেনের জন্য প্রকল্পের অনলাইন ব্যাংকিং সফটওয়্যার ব্যবহৃত হয়। সব লেনদেন ওই সফটওয়্যারের মাধ্যমে সম্পন্ন করতে হয়।

## মূলধন গঠনের শর্ত

এ মূলধন গঠনে সরকারি সহায়তার প্রধান শর্ত হলো, গঠিত মূলধন সমিতির সদস্যরা স্থায়ীভাবে আয়বর্ধক কাজে ব্যবহার করবেন এবং নির্দিষ্ট মেয়াদ শেষে ৮% সার্ভিস চার্জসহ পুনরায় সমিতির হিসেবে জমা হবে ও পুনরায় ঋণ নেবেন। এ মূলধন শুধু সমিতির সদস্যরা ব্যবহার করবেন।

## সমিতিভুক্ত হওয়ার সুবিধা

নিজের সঞ্চয় নিজেরই থাকবে। পাঁচ বছর পূর্ণ হলে সঞ্চয়ের ওপর ৫% লাভ পাওয়া যাবে। সমিতির সদস্য হিসেবে দুই বছরে ৪ হাজার ৮০০টাকা সঞ্চয় জমা রেখে সমিতির তহবিল থেকে প্রথমবার ১৯ হাজার টাকা, দ্বিতীয়বার ২০ হাজার টাকা, তৃতীয়বার ৩০ হাজার টাকা, চতুর্থবার ৪০ হাজার টাকা পর্যন্ত ঋণ নিয়ে আয়বর্ধক কাজে ব্যবহার করা যায়। ঋণের কিস্তি সমিতি নির্ধারণ করে। অন্যান্য ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠানের মতো সাপ্তাহিক/পাক্ষিক/মাসিক বাধ্যতামূলক কিস্তি পরিশোধের বাধ্যবাধকতা নেই। এক বছরের মধ্যে যেকোনো সময় ফেরত দেয়া যায় এবং আবার ঋণ নেয়া যায়। এ ছাড়া আয়বর্ধক কাজে ভালো করলে প্রকল্প থেকে আরো বেশি পরিমাণ টাকা (এক লাখ টাকা পর্যন্ত) ন্যূনতম (৫%) সুদে ঋণ নেয়া যাবে। অন্য কোনো প্রকল্প/প্রতিষ্ঠানে বা এনজিওতে এভাবে স্থায়ী তহবিল গড়ার সুযোগ নেই। এ ছাড়া পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের সদস্য হয়ে অল্প সুদে বেশি পরিমাণ ঋণ পাওয়ার সুযোগ আছে।

## সদস্যপদ প্রত্যাহার

কোনো সদস্য সমিতি ত্যাগ করতে চাইলে যে কোনো সময় নিজের সঞ্চিত টাকা ৫% সুদসহ তুলে নিয়ে সমিতি থেকে চলে যেতে পারবেন। তবে পাঁচ বছর পূর্ণ হওয়ার আগে ত্যাগ করলে লভ্যাংশ পাবেন না।

## অর্জন

- সারাদেশে একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পের আওতায় এ পর্যন্ত ৫৫ হাজার ৭৮৬টি গ্রাম উন্নয়ন সমিতি গড়ে উঠেছে।
- সমিতির উপকারভোগী পরিবারের সংখ্যা ২৯ লাখ ৩৫ হাজার ৮৪৩।
- প্রকল্পের প্রত্যক্ষ উপকারভোগীর সংখ্যা ১ কোটি ৪৭ লাখ।
- বছরে প্রকল্পভুক্ত পরিবারে আয় বৃদ্ধি গড়ে ১০ হাজার ৯২১ টাকা।
- প্রকল্প এলাকায় নিম্ন আয়ের পরিবারের সংখ্যা ১৫% থেকে কমে ৩%-এ দাঁড়িয়েছে।
- প্রকল্প এলাকায় অধিক আয়ের পরিবারের সংখ্যা ২৩% থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৩১%-এ উন্নীত হয়েছে।

## ভবিষ্যত পরিকল্পনা

- দারিদ্র্যের হার ২২.৮ থেকে ১৮.৬ শতাংশে নামিয়ে আনা এবং ২০২০ সালের মধ্যে চরম দারিদ্র্যের হার ৮ শতাংশে নামিয়ে আনার লক্ষ্যে এ প্রকল্প কাজ করছে।
- ২০২১ সালের মধ্যে বর্তমান দারিদ্র্যসীমার নিচের ১ কোটি পরিবারকে প্রকল্পভূক্ত করে দারিদ্র্যকে শূন্যের কোঠায় পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে রোডম্যাপ প্রণয়ন করা হয়েছে।
- লিজকৃত মজা খাস পুকুর/ডোবা/ খাল পুন:খনন করে মাছ/হাঁস চাষের ব্যবস্থা করা।
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আঙ্গিনার পাশের নিচু জায়গা ভরাট করে সবজি ফলজ/ঔষধি গাছ চাষের আওতায় আনা।
- বসত বাড়ি দুর্যোগ সহনীয় করে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

তথ্য: www.ebek-rded.gov.bd, ছবি: চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর

## খুলনায় ‘একটি বাড়ি একটি খামার’ প্রকল্পের অনেক সদস্যই এখন স্বাবলম্বী

খুলনা জেলার রূপসা উপজেলার জাবুসা গ্রামের ভূমিহীন নারী লিপি বেগম। একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প থেকে ২০১১ সালে ১০ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে গরু পালন শুরু করেন। দুই বছরের মধ্যে ২০ হাজার টাকায় সেই গরু বিক্রি করে ঋণের টাকা পরিশোধ করেন। এরপর তিনি ২০ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে একটি গাভী কেনেন। বছর ঘুরতে না ঘুরতেই একটি বাছুর দেয় গাভীটি। এখন এই গাভী প্রতিদিন যে দুধ দেয় তা থেকে ছেলেমেয়ে খাওয়ার পর বাকিটা বাজারে বিক্রি করে একশ’ টাকা পান। আগামী ছয় মাসের মধ্যে ঋণের সব টাকা পরিশোধ হবে। এতে তার সম্পদ হবে এই গাভী ও বাছুর। সব মিলিয়ে এখন অনেকটাই সচ্ছল তিনি। ভবিষ্যতে গাভীর পাশাপাশি হাঁস-মুরগি পালন করে আর্থিক মুক্তির স্বপ্ন দেখছেন তিনি ও তার পরিবার।

শুধু লিপি বেগমই নন এই প্রকল্পের ফলে এমন সুখের বাতাস বইছে জেলার অনেক পরিবারে। খুলনার নয়টি উপজেলায় ২০০৯ সাল থেকে চলছে ‘একটি বাড়ি একটি খামার’ প্রকল্প। গ্রামের হতদরিদ্র মানুষকে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করা এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য। জেলায় খেলাপি ঋণের পরিমাণ ১০ কোটি টাকা হলেও স্বাবলম্বী হয়েছেন অধিকাংশ সদস্য। ঋণের অর্থ আদায়ে প্রকল্পের দায়িত্বপ্রাপ্তরা তৎপর হলে প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য পূরণ হবে।

বাংলাদেশ রুরাল ডেভেলপমেন্ট বোর্ড (বিআরডিবি) খুলনা জেলা অফিসের তথ্য অনুযায়ী জেলার ৬৮টি ইউনিয়নে সমিতি আছে ৬১৪টি। যার সদস্য সংখ্যা ৩৬ হাজার ৪৯৯ জন। সমিতির সদস্যরা ঋণ নিয়েছে প্রায় ৫৪ কোটি টাকা। এই টাকার মধ্যে রয়েছে সদস্যদের জমানো ২০ কোটি ২৫ লাখ, সরকারি অনুদান ১৬ কোটি ৮৬ লাখ ও সরকারি ঋণ সহায়তা ১৭ কোটি ২৩ লাখ টাকা। এর মধ্যে নয় হাজারের বেশি গ্রহীতা ঋণ খেলাপি হয়েছে। তাদের কাছে পাওনা ঋণের পরিমাণ প্রায় ১১ কোটি ৯৬ লাখ টাকা। যা এক বছরের অধিক সময় ধরে সদস্যদের কাছে আটকে আছে। এতে বাধাগ্রস্থ হচ্ছে প্রকল্পের কার্যক্রম।

রূপসা উপজেলার জাবুসা গ্রাম উন্নয়ন সমিতি সভাপতি আবদুল গফ্ফার বলেন, মাত্র ৮ শতাংশ সুদের হারে ৫ থেকে ৩০ হাজার টাকা পর্যন্ত সমিতির

সদস্যদের ঋণ দেয়া হয়। যা সে সুদ সমেত এক বছরের মধ্যে দেবে। কিন্তু অনেক সদস্য টাকা নিয়ে সময় মতো ফেরত দিচ্ছে না। এতে করে নতুন কোনো সদস্য ঋণ নিতে চাইলে অর্থের অভাবে তা দেয়া সম্ভব হচ্ছে না।

বিআরডিবির উপ-পরিচালক তোফাজ্জেল হোসেন বলেন, সমিতির কিছু সদস্য সময় মতো অর্থ ফেরত না দেয়ায় সমিতি পরিচালনায় অসুবিধা হচ্ছে। তবে এর জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে পারেন সমিতির সভাপতি, সাধারণ সম্পাদকসহ সমিতির সদস্যরা। কেননা প্রকল্পের নিয়ম অনুযায়ী সমিতিকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে কাদের ঋণ দেয়া যাবে, টাকার পরিমাণ কত হবে এবং কত দিনে এই ঋণ পরিশোধ করবে। খেলাপিদের বিরুদ্ধে বিআরডিবি থেকে কোনো ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে কিনা এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, এখনও পর্যন্ত ঋণ খেলাপিদের বিরুদ্ধে কার্যকর কোনো পদক্ষেপ নেয়া হয়নি।

জেলা প্রশাসক আমিনুল আহসান বলেন, প্রধানমন্ত্রীর নিজস্ব উদ্যোগ ও দারিদ্র বিমোচনে সরকারের সামাজিক নিরাপত্তার অগ্রাধিকারভিত্তিক কর্মসূচি হচ্ছে ‘একটি বাড়ি একটি খামার’ প্রকল্প। গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য বিমোচনে গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে প্রকল্পটি। তাই এই প্রকল্পে কোনো অনিয়ম থাকলে তার বিরুদ্ধে দ্রুত ব্যবস্থা নেয়া হবে। খেলাপি ঋণ আদায়েরও উদ্যোগ নেয়া হবে। প্রয়োজনে উপজেলা নির্বাহী অফিসারসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলোচনা করে সব প্রতিবন্ধকতা দূর করা হবে।

সরকারের ভিশন-২০২১ বাস্তবায়নের বিশেষ উদ্যোগ হচ্ছে ‘একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প’। জেলায় এ প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছে ২০০৯ সাল থেকে। ২০১০ সালে ৬৮ ইউনিয়নে বিনামূল্যে গরু, টিন ও হাঁস-মুরুগী দেয়া হয়। পরবর্তীতে সমিতির মাধ্যমে সদস্য নির্বাচন করে দুগ্ধ খামার, গবাদিপশু পালন, হাঁস-মুরগি পালন, মৎস্য চাষ, ধান উৎপাদনসহ বিভিন্ন কাজে ঋণ দেয়া হয়।

প্রকল্পটি ২০০৯ সাল থেকে শুরু হয়ে ২০১৪ সালে শেষ হওয়ার কথা থাকলেও প্রথমবার এর মেয়াদ ২০১৬ সালের জুন পর্যন্ত বাড়ানো হয়। পরে দ্বিতীয় মেয়াদে প্রকল্পের মেয়াদ বেড়েছে ২০২০ সালের জুন পর্যন্ত।

প্রতিবেদন : এস এম জাহিদ হোসেন

## স্বাবলম্বী হয়ে উঠছে রাজশাহীর তানোর উপজেলার দরিদ্র জনগোষ্ঠী

হাঁস চাষ এবং মুদি দোকানের আয় থেকে স্বাবলম্বী হয়ে উঠছে রাজশাহীর তানোর উপজেলার দরিদ্র জনগোষ্ঠী।

উপজেলার বিল সোহর গ্রামের বাসিন্দা রশিদা বিবি বলেন, 'দীর্ঘস্থায়ী দারিদ্র্য আমাকে চরম আর্থিক কষ্ট ও অনিশ্চয়তার মাঝে ফেলে দিয়েছিল। কিন্তু হাঁস পালন ও মুদি দোকানের আয় থেকে আমি এখন স্বাবলম্বী হয়েছি। আমার জীবনের এ পরিবর্তন ২০১৪ সালে শুরু হয়েছে।'

তিনি ৬০ সদস্যবিশিষ্ট গ্রাম উন্নয়ন সমিতির কাছ থেকে ৫ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে প্রথমে বাড়িতে ছোট আকারের হাঁসের খামার করেন। স্থানীয় বাজারে ডিম এবং হাঁসের মাংসের প্রচুর চাহিদা রয়েছে। পরিস্থিতি বুঝে তিনি খামারের আয় থেকে একটি মুদি দোকান চালু করেন।

রশিদা বিবি বলেন, 'এখন আমি খুব খুশি। কারণ আমি দোকান চালানো এবং হাঁসের ডিম বিক্রি করে নিয়মিত রোজগারের পথ খুঁজে পেয়েছি।'

একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পের উপজেলা সমন্বয়কারী হাবিবুর রহমান বলেন, সমিতির অন্য সদস্যরা বিভিন্ন ক্ষুদ্রব্যবসা পরিচালনার মাধ্যমে তাদের আয় চালু রাখে।

গোদাগাড়ী উপজেলার অনন্তপুর গ্রামের আরেক গৃহবধূ রিনা বেগম (২৫) ষাঁড় পালনের মাধ্যমে সামাজিক মর্যাদা পুনরুদ্ধার করেছেন। প্রাথমিক পর্যায়ে ২০১৪ সালে তিনি ১০ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে ব্যবসা শুরু করেন। এখন তিনি ৯০ হাজারের কাছাকাছি মূল্যের দুটি ষাঁড়ের মালিক। তিনি নিয়মিত সমিতির ঋণ পরিশোধ করে যাচ্ছেন। যা অতীতে কল্পনা করাও কঠিন ছিল। তিনি বলেন, 'দারিদ্র্যের জন্য মানুষ আমাকে উপেক্ষা করতো। আজ সবাই আমাকে সম্মান করে।'

রিনার স্বামী আনোয়ার হোসেন বলেন, 'আমি তার কাজে সত্যিই গর্বিত।'

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ডের (বিআরডিবি) উপ-পরিচালক জাকিরুল ইসলাম বলেন, 'জেলার ৯টি উপজেলায় ৯১২টি গ্রাম উন্নয়ন সমিতি রয়েছে। এর সদস্য সংখ্যা ৩১ হাজার ৮২৪ জন মহিলাসহ ৪৭ হাজার ৭৩৬ জন।

চরঘাট উপজেলার সারদা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান হাসানুজ্জামান মধু প্রারম্ভিক উদ্যোগ হিসেবে দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য এই প্রকল্পটির কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, 'আমাদের সবার উচিত আন্তরিকভাবে সরকারকে সহযোগিতা করা।'

প্রতিবেদন : আয়নাল হক, অনুবাদ : আজম সারোয়ার চৌধুরী

## রংপুরের গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর ভাগ্য পরিবর্তনে একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প

একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পটি কার্যকরভাবে রংপুর জেলার গ্রামীণ এলাকার হাজার হাজার দরিদ্র, ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষি পরিবারের ভাগ্যে পরিবর্তন এনে দিয়েছে।

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ডের (বিআরডিবি) উপ-পরিচালক মোঃ আবদুস সবুর বলেন, 'একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পের সহায়তায় ৫৭ হাজার ৬৩৪ জন সুবিধাভোগী সদস্যের অধিকাংশই আত্মনির্ভরশীল হয়ে উঠেছে।'

ব্যবসা উন্নয়ন, পণ্যের মার্কেটিং সুবিধা এবং তহবিল গঠনে সহায়তাকল্পে এই পর্যন্ত ১,০২০টি গ্রাম উন্নয়ন সমিতিতে প্রতিটি গ্রামের ৬০টি পরিবারকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

সবুর বলেন, প্রতি সমিতির ৬০ (মহিলা-৪০,পুরুষ-২০) জনের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন, তহবিল সংগ্রহ, আয় বৃদ্ধি ও পারিবারিক স্তরে খামার কর্মসূচি দ্বারা টেকসই উন্নয়নে গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সহায়তা করার জন্য সরকার এ প্রকল্পটি চালু করে।

দক্ষতার জন্য প্রশিক্ষণ, পরিবারিক খামার ২০ জন সদস্যের প্রত্যেকে মাসিক ২০০ টাকা করে দুই বছরে ৪ হাজার ৮০০ টাকা হিসেবে সমিতির তহবিলে ২ লাখ ৮৮ হাজার টাকা জোগাড় করেছে।

তিনি আরো বলেন, সরকার প্রতিটি সমিতির তহবিলে কল্যাণ অনুদান হিসেবে ২ লাখ ৮৮ হাজার টাকা এবং নিজস্ব মূলধন বৃদ্ধিকল্পে আবর্তিত ঋণ সুবিধায় আরো ৩ লাখ টাকা প্রদান করে। বর্তমানে জেলার ১,০২০টি সমিতির সর্বমোট তহবিল প্রায় ৬১ কোটি টাকা।

মমিনপুর ইউনিয়ন পরিষদের কুরশা বলরামপুর গ্রাম উন্নয়ন সমিতির সুবিধাভোগী সদস্য জাকিয়া বেগম বাসসকে বলেন, স্বামী ও চার সন্তানসহ ছয় সদস্যের পরিবার নিয়ে অতীতে তিনি দুঃখ-কষ্টে জীবন-যাপন করেছেন।

তিনি বলেন, আমি ২০১২ সালে ১০ হাজার টাকা ঋণ নেই এবং আমার স্বামী রেজাউল ইসলামের সহায়তায় গবাদি পশু ব্যবসা শুরু করি। তিনি আরো বলেন, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তারা সফলভাবে ঋণের টাকা পরিশোধ করেছেন। এরপর তিনি ২০১৪ সালে গবাদি পশু ব্যবসার পাশাপাশি বর্গাচাষী হিসেবে ফসল চাষের জন্য ১৮ হাজার টাকা ঋণ গ্রহণ করেন।

বর্তমানে তাদের পরিবারের জমি, বাড়ি ও ব্যবসা ছাড়াও চারটি ভেড়া, একটি ষাঁড়, একটি বকনা বাছুর এবং অন্যান্য দুই লাখ টাকা সমমূল্যের সম্পদ রয়েছে।

জাকিয়া বলেন, আমরা ইতিমধ্যেই আমাদের মেয়ে নাজমুন নাহার এর বিয়ে দিয়েছি। জাকারিয়া এ বছর এসএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে মেয়ে তাসমিনা ষষ্ঠ শ্রেণিতে এবং ছেলে সৈকত প্রথম শ্রেণিতে লেখাপড়া করছে। হরিদেবপুর ইউনিয়ন পরিষদের হরকুলি গ্রাম উন্নয়ন সমিতির সদস্য মোমিনুল ইসলাম বিপ্লব বলেন, ২০১২ সালে ৭ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে হরকুলি বাজারে তিনি ছোট হোটেল ব্যবসা শুরু করেন।

তিনি বলেন, নিয়মিত টাকা পরিশোধের পর ব্যবসা বাড়ানোর জন্য ২০১৪ সালে ১৮ হাজার টাকা এবং ২০১৫ সালে আবার ৩০ হাজার টাকা নিয়ে বর্তমানে আমার স্ত্রী আম্বিয়া বেগমের সহায়তায় সফলভাবে হোটেল ব্যবসা পরিচালনা করে যাচ্ছি।

আমাদের দুই ছেলে ও একমাত্র মেয়ে এখন স্কুলে যায় এবং আমাদের কাছে দুই লাখ টাকা মূল্যের সম্পদ রয়েছে। বিপ্লব আশা প্রকাশ করেন যে, উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ার পর তার সন্তানেরা দেশের যোগ্য নাগরিক হয়ে উঠবে।

হরিদেবপুর ইউনিয়নের সাতমাইল পাড়ার গ্রাম উন্নয়ন সমিতির সদস্য শেফালি বেগম (৪৫) জানান তিনি ২০১২ সালে ৭ হাজার এবং ২০১৪ সালে ১৫ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে এক একর আবাদি জমি দশ বছরের জন্য লিজ নেন। তিনি বলেন, 'আমি এ জমিতে বিভিন্ন রকম ফসল চাষাবাদ করি। বছর শেষে আমার ৩০ হাজার টাকা আয় হয়। আমার দুই মেয়ে মায়া মনি ও জেমিকে বিয়ে দেয়ার পর আমাদের কাছে এখন তিন লাখ টাকার সম্পদ আছে।

এই প্রকল্পকে দেশের সবচেয়ে কার্যকর প্রকল্প হিসেবে উল্লেখ করে বিভাগীয় কমিশনার কাজী হাসান আহমেদ বলেন, ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশ নির্মাণের জন্য গ্রামীণ দারিদ্র্য দূরীকরণে প্রকল্পের সফল বাস্তবায়ন একান্ত কাম্য।

প্রতিবেদন : মামুন ইসলাম, অনুবাদ : আজম সারোয়ার চৌধুরী

## ২০২০ সালের মধ্যে ১ কোটি ৮০ লাখ লোককে দারিদ্র্যমুক্ত করার পরিকল্পনা

সরকার ২০২০ সালের মধ্যে একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পের অধীনে আরো ১ কোটি ৮০ লাখ লোককে দারিদ্র্যমুক্ত করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে।

প্রকল্প পরিচালক আকবর হোসেন বাসসকে বলেন, সরকারের বিশেষ বরাদ্দ থেকে ৮ হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে ৩৬ লাখ পরিবারকে আর্থিক সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে সরকার এ লক্ষ্য অর্জন করবে। এই প্রকল্পের প্রথম দুই ধাপে দেশের ৬৪টি জেলার ৪৮৫টি উপজেলার ৪০ হাজার ৫২৭টি গ্রামের ২২ লাখ পরিবারের প্রায় ১ কোটি ৫০ লাখ অতিদরিদ্র লোককে দারিদ্র্যমুক্ত করা হয়েছে।

প্রকল্প পরিচালক বলেন, এই প্রকল্পের তৃতীয় ধাপে সারাদেশে ৬০ হাজার ৫১৫টি গ্রামের ১ কোটি ৮০ লাখ দরিদ্র লোককে স্বাবলম্বী করে তুলতে সহায়তা দেয়া হবে। পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে এ প্রকল্পের আওতায় প্রায় ৩ কোটি লোক দারিদ্র্যমুক্ত হবে।

অফিস সূত্র জানায়, প্রকল্পের তৃতীয় ধাপের জন্য সরকার ৮ হাজার ১০ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে। মোট বরাদ্দের ৭৫ শতাংশ অনুদান হিসেবে দেয়া হবে। অবশিষ্ট টাকা প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের প্রশিক্ষণ ও অন্যান্য সহায়তা হিসেবে ব্যয় করা হবে। সরকার প্রকল্পের প্রথম ও দ্বিতীয় ধাপ বাস্তবায়নের জন্য ৩ হাজার ১৬২ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়।

এই প্রকল্পের অধীনে সারাদেশে প্রতিটি গ্রামে ৬০ জন দরিদ্র লোককে নিয়ে গ্রাম উন্নয়ন সমিতি গঠন করা হয়েছে। এর মধ্যে ২০ জন পুরুষ ও ৪০ জন নারী। গ্রাম সংগঠনগুলো গঠনের পর সমিতির সদস্যরা প্রতিমাসে ২০০ টাকা করে সঞ্চয় শুরু করেন। এতে প্রত্যেকের নামে বছরে ২ হাজার ৪০০ টাকা সঞ্চয় হয়। পাশাপাশি সরকার অনুদান হিসেবে প্রত্যেক পরিবারকে ২ হাজার ৪০০ টাকা করে দেয়। এতে একজন সদস্যের বছরে মোট ৪ হাজার ৮০০ টাকা জমা হয়। বছর শেষে ব্যাংকের বার্ষিক মুনাফাসহ প্রত্যেকের প্রায় ৫ হাজার টাকা মূলধন হবে।

পাশাপাশি সরকার ঘূর্ণায়মান মূলধন হিসেবে প্রতিটি গ্রাম উন্নয়ন সমিতিকে অনুদান হিসেবে বছরে ১ লাখ ৫০ হাজার টাকা দেবে। এই টাকা তাদের ব্যক্তিগত সঞ্চয় ও সরকারের কাছ থেকে পাওয়া বোনাসের সঙ্গে যোগ হবে। এভাবে বছরে একটি সমিতির মোট মূলধন হবে ৪ লাখ ৫০ হাজার টাকা। আকবর হোসেন বলেন, আমরা ক্ষুদ্র ঋণের পরিবর্তে ক্ষুদ্র সঞ্চয়ের মাধ্যমে তাদের স্থায়ী মূলধন গড়ে দেয়ার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

এ প্রকল্পের মাধ্যমে সমিতির সদস্যদের কৃষি, নার্সারি, মৎস্য, পোল্ট্রি ও পশু পালনের ওপর প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। প্রশিক্ষণ নেয়ার পর মাত্র ৮ শতাংশ সুদে সমিতির তহবিল থেকে ঋণ নিয়ে তারা নিজস্ব উদ্যোগে ব্যবসা শুরু করতে পারেন। সমিতির সদস্যরা উপযুক্ত প্রশিক্ষণ গ্রহণ ও ব্যবসা শুরু করার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য সপ্তাহে একদিন করে সন্ধ্যায় বৈঠক করেন।

প্রকল্প পরিচালক বলেন, এই প্রকল্প এরই মধ্যে দারিদ্র্য বিমোচনে সহায়ক ভূমিকা রেখেছে।

বিশ্বব্যাংকের প্রতিবেদন অনুযায়ী, গত বছর দেশে অতি দরিদ্রের হার কমে ১২.৯ শতাংশ হয়েছে। ২০০৯ সালে এই প্রকল্প শুরু হওয়ার আগে এই হার ছিল ২২ শতাংশেরও বেশি।

প্রতিবেদন : তানজিম আনোয়ার, অনুবাদ : মাহফুজা জেসমিন

## দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে ২০২০ সালের মধ্যে একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পের আওতায় আনার পরিকল্পনা

গত কয়েক বছর আগের স্মৃতি এখন বুলবুলি বেগমের কাছে শুধুই এক দীর্ঘ দুঃস্বপ্ন। হঠাৎ স্বামীর মৃত্যুর পর কীভাবে সংসার চালাবেন তাই নিয়ে যখন দিশেহারা অবস্থা তখনই সরকারের 'একটি বাড়ি একটি খামার' প্রকল্পের মাধ্যমে তার জীবনে স্বস্তি ফিরে আসে। দুই মেয়ে, এক ছেলেকে নিয়ে তিনি টিকে থাকার পথ খুঁজে পান।

আব্দুর রাজ্জাকের স্ত্রী বুলবুলি বেগমের সম্বল শুধু স্বামীর রেখে যাওয়া সামান্য জমি। এ থেকে যে ফসল হয় তাতে মাত্র তিন মাসের খোরাক হয়। বছরের বাকি সময়টা কেমন করে চলবে তার। তাই সামান্য জমির ভরসায় না থেকে দিনমজুর হিসেবে কাজ শুরু করেন। এরই মধ্যে ২০১১ সালে বগুড়ার দুপচাচিয়ার খোলাশ গ্রামে 'একটি বাড়ি একটি খামার' প্রকল্পের কাজ শুরু হয়। বুলবুলি বেগম যুক্ত হন এই প্রকল্পে। এখন তার পেছন ফিরে তাকানোর অবকাশ নেই। একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প বদলে দিয়েছে তার ভাগ্য।

বুলবুলি বেগম খোলাশ গ্রাম উন্নয়ন সমিতির সদস্য হয়ে এই প্রকল্প থেকে ১০ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে পুতুলের ব্যবসা শুরু করেন। নিজ বাড়িতে পুতুল কারাখানা থেকে এখন বুলবুলি বেগমের মাসিক আয় ৭ হাজার থেকে ৮ হাজার টাকা। এর মধ্যে তিনি তার দুই মেয়েকে বিয়ে দিয়েছেন এবং ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে নিজের পুতুল ব্যবসাও চালিয়ে যাচ্ছেন।

শুধু বুলবুলি বেগম নন, এই প্রকল্পের মাধ্যমে তার মতো অনেক দরিদ্রই আজ নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছেন। সমাজে সম্মানজনকভাবে বেঁচে থাকার পথ খুঁজে পেয়েছেন।

একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক আকবর হোসেন জানান, সরকার দেশের সব দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে স্বাভাবিক ও মানসম্মত জীবন যাপনের সুযোগ করে দিতে ২০২০ সালের মধ্যে দেশব্যাপী এক লাখ গ্রাম উন্নয়ন সমিতি গঠন করবে।

প্রকল্প পরিচালক বলেন, প্রত্যেক এলাকায় দরিদ্র জনগোষ্ঠী চিহ্নিত করে তাদের গ্রাম উন্নয়ন সমিতিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। যার মধ্যে ৪০ জন মহিলা ও ২০ জন পুরুষ সদস্য থাকে। তাদের নিজস্ব তহবিল সৃষ্টির লক্ষ্যে সদস্যগণ

সমিতিতে মাসিক ২০০ টাকা সঞ্চয় করেন। সরকার প্রকল্পের মাধ্যমে সদস্য সঞ্চয়ের বিপরীতে সমপরিমাণ উৎসাহ বোনাস প্রদান করেন।

তিনি বলেন, সারাদেশে এক লাখ সমিতির মাধ্যমে ৬০ লাখ পরিবারের ৩ কোটি মানুষের প্রকল্প সুবিধা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। তিনি আরো বলেন, একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পের মূল দর্শন হলো ক্ষুদ্র ঋণের পরিবর্তে ক্ষুদ্র সঞ্চয়ের মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য স্থায়ী তহবিল গঠন করে পুঁজির অভাব দূর করা এবং পাশাপাশি কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা।

দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে আয়বর্ধক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্তকরণের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্য নিয়ে ২০০৯ সালে 'একটি বাড়ি, একটি খামার' প্রকল্প যাত্রা শুরু করে। বর্তমানে এই প্রকল্পের আওতায় উপকারভোগীর সংখ্যা দেড় কোটির ওপরে।

তিনি বলেন, বর্তমানে দেশের ৪ হাজার ৫৫০টি ইউনিয়নের সব ওয়ার্ডে সমিতি আছে। সমিতির সংখ্যা প্রায় ৫৬ হাজার। এর সঙ্গে ৩০ লাখ দরিদ্র পরিবার সরাসরি যুক্ত। ফলে প্রতি পরিবারে গড়পড়তায় ৫ জন সদস্য থাকলে দেড় কোটি মানুষ এই প্রকল্প থেকে উপকৃত হচ্ছেন।

সমিতি গঠনের মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর তহবিল গঠনের প্রক্রিয়ায় সরকারের দেয়া বোনাসসহ সদস্যদের বর্তমান স্থায়ী তহবিলের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৩ হাজার ২০০ কোটি টাকা।

আকবর হোসেন বলেন, সদস্যরা ঋণ নিয়ে সবজি আবাদ, মাছের খামার, হাঁস-মুরগি বা পশু পালন কিংবা ক্ষুদ্র ব্যবসার মাধ্যমে নিজেরা স্বাবলম্বী হচ্ছেন। প্রকল্পের আওতায় সদস্যদের ঋণ প্রদানের পাশাপাশি কর্মসৃজনমূলক প্রশিক্ষণও দেয়া হয়।

প্রতিবেদন : রাশেদুল ইসলাম

## 36,499 become self-reliant in Khulna through One House, One Farm Project

The "Ekti Bari, Ekti Khamar" (One House, One Farm Project, one of the Prime Minister's 10 special initiatives, so far benefitted 36,499 people of 5,000 families in Khulna district since its launching in 2009.

"Some 36,499 members of 614 cooperative societies in 68 unions of the district got financial assistance under the project to be self-reliant," Deputy Director of Bangladesh Rural Development Board (BRDB) Tofazzel Hossain said.

He noted that the members, so far, received a loan of Taka 54 crore, of which Taka 20.25 crore came from the regular savings of the society members while the government gave Taka 16.86 crore as grants and Taka 17.23 crore as project loans.

"Most of the people already paid back their loans after becoming self-reliant," said Hossain, but pointed out that some others yet to pay back Taka 10 crore loan.

While visiting Jabusha village of Rupsha upazila in Khulna. This correspondent found that many people, including a good number of women came out of extreme poverty with the support of the one house, one farm project.

"I bought a cow for Taka 20,000 by taking loan from the Society in 2011. The cow gave birth of a calf in a year, which I sold for Taka 20,000 after two years and paid back half of my loan," said Lipi Begum, 30. She also earns Taka 200 everyday by selling cow milk after meeting the milk demand of her two children.

"I have a plan to set up a poultry farm this year", said Lipi.

President of Jabusha village development committee Abdul Gaffar said, each member of the Cooperative Society can get Taka 5,000 to Taka 30,000 at 8.0 percent interest for one year. Khulna Deputy Commissioner Aminul Ahsan told BSS that 'One House, One Farm'

project is playing a vital role for reducing poverty. "We requested the officials concerned and non-governmental organisations (NGOs) to cooperate with the beneficiaries of the project so people can get ultimate advantage out of it," he said.

He said the government has taken the project to expedite economic development in rural area for improving the living standard of the people and help them come out of poverty.

Report: S M Zahid Hossain

## Rural poor attain financial solvency thru' self-employment

Rashida Bibi, 40, a resident of Beel Sohar village under Tanore upazila, no longer belongs to ultra-poor people as she came out of the poverty cycle after finding the way of a better livelihood though self-employment.

Running duck farms and a grocery shop has now become a consistent source of income, which is gradually increasing due to rising local demands.

"The income has ended my endemic poverty coupled with uncertainty that I languised for long," said Rashida Bibi.

The transformation in her life began in 2014. Initially, she received a loan worth Taka 5,000 from her 60-member Village Development Organisation (VDO) and established a small-scale duck farm at her home. The VDO runs with the support from the government's Ekti Bari Ekti Khamar (One House One Farm) project.

"Ducks farming is less expensive, simple and commercially viable," she said sharing her experience. Bibi said that she made good profit by selling ducks and eggs at the local markets, and eventually opened a grocery shop with earning from the farm.

"Now, I'm very happy as I have found the path of regular earning through operating the shop and the duck farm successfully," added Rasheda, who has no educational background.

Habibur Rahman, Upazila Coordinator of Ekti Bari Ekti Khamar (One House One Farm) project, said many other members of the VDO are operating various micro-businesses for income generation.

He said Rasheda is sincere in attending courtyard meeting and paying regularly the monthly installment of Taka 200 to the society.

After divorce, she used to work as housemaid to earn for her own and her baby girl. Her struggle was for 20 years before getting the way out.

Rina Begum, 25, another housewife of Anantapur village under Godagari Upazila, got good living standard and social dignity from bull fattening. She received a loan of Taka 10,000 to start the business in 2014. Now, she owns two bulls valued at around Taka 90,000.

"People used to ignore me for my poverty," she remembers. "Nowadays, everybody respects me."

"I am really proud of her," says Rina's husband Anwar Hossain who helps her in the work. "She brought a positive change to our lives. She sets a great example for other local women. She is always helpful to neighbours so they can fatten bull in a more scientific way because of her advice."

Referring to some field level problems, Rabiul Islam, 30, of Jhikra village under Charghat Upazila, said none member is allowed to borrow more than Taka 25,000 at a time. But, this amount isn't sufficient to start many businesses.

He, however, was hopeful that there would be no such problem when Pally Sanchoy Bank would be fully operational acrross the country.

Zakirul Islam, Deputy Director of Bangladesh Rural Development Board (BRDB), said there are 912 VDOs with 47,736 members, including 31,824 women, in nine upazilas of the district.

The beneficiary members have formed a combined deposit worth Taka 21.92 crore through paying Taka 200 monthly instalment each. On behalf of the project, the committees were given Taka 14.75 crore while the members got Taka 18.12 crore as grant.

Hasanuzzaman Madhu, Chairman of Sardaha Union Parishad under Charghat Upazila, terms the scheme as an effective venture for poverty eradication.

"All of us should extend wholehearted cooperation to support the government endevour," he said.

Isahaque Ali Biswash, Chairman of Godagari Upazila, said the rural poor women have got a great opportunity of becoming self-reliant with the breakthrough project.

"Rural poverty could be eradicated for ever if we can transform VDOs into powerful financial units," he said.

Report: Aynal Haque

## EBEK changing living of rural people in Rangpur

The 'Ekti Bari, Ekti Khamar (EBEK)' project is significantly changing living standard of thousands of poor people, and small and marginal farmers in rural areas of Rangpur district.

"So far 57,634 members, one from a family, were brought under the project, most of which became self-reliant through various income generating activities," said Deputy Director of Bangladesh Rural Development Board (BRDB) Md Abdus Sabur.

The government launched the project in 2012 to assist rural poor come out of poverty by generating income through various activities under Village Development Organisation (VDO). There are 1020 VDO in Rangpur district.

Sixty families or members of a village have been brought under each of the VDO. The families were given support for skill development and capital formation to set up and run family farms, business and other income generating activities.

“Each of the 60 members, including 40 females and 20 males of every VDO, deposited Taka 200 per month that generated a fund of Taka 2.88 lakh for each of the associations in two years,” Sabur said.

He said the government provided another Taka 2.88 lakh as welfare grant and another Taka 3 lakh as revolving loan to each of the VDO, raising total fund of 1,020 VDO`s to around Taka 61 crore.

The VDO`s provide revolving loans up to Taka 30,000 to a member for income generation provided that the member pays back previous loan installments regularly.

“After getting fund from the VDO`s, the families develop small farms including fisheries, livestock, poultry, nursery and vegetable gardening using whatever the land they have in their possession,” Sabur said.

Zakia Begum, 36, member of Kursha Balorampur VDO under Mominpur union said she and her husband along with four children were in hardship only a few years ago.

“Things began to change after starting a small cattle farm by taking Taka 10,000 as revolving loan in 2012 and eventually obtaining another Taka 18,000 loan in 2014 to increase investment in the cattle business and start farming as sharecropper,” she said.

As her incomes were increasing, she purchased 50 decimals of crop land and built a house. Her family now has four sheep, one bullock, a heifer and other assets worth Taka two lakh in addition to land, house and business.

“I arranged marriage of my daughter Nazmun Nahar and bore all expenses of my son Zakaria to pass the SSC examination this year. I also supports studies of two other

children, daughter Tasmina, a student of class six and son Saikat, a student of class one," said a happy Zakia.

VDO Member of Horkoli VDO Mominul Islam Biplob, 30, under Haridebpur union said he got Taka 7,000 loan and invested the same amount in his small hotel business at Horkoli Bazar in 2012.

"After regular repayments, I got Taka 18,000 in 2014 and again Taka 30,000 in 2015 to expand my business with the assistance of my wife Ambia Begum who prepares various food items at home for my hotel," he said.

Our two sons and only daughter now go to schools, and we have assets worth Taka two lakh, said Biplob hoping that his children would be able to lead a better life after getting higher education.

Member of Satmail Para VDO, Shefali Begum, 45, under Haridebpur union said she received Taka 7,000 in 2012, then Taka 15,000 in 2014 and took lease of one acre of cultivable land for ten years.

"I grow various crops in the land round-the-year and earn around Taka 30,000 in a year. My family now has assets worth Taka three lakh after spending for weddings of my two daughters Maya Moni and Jemy," she said.

Terming EBEK as one of the most effective projects, Rangpur Divisional Commissioner Kazi Hasan Ahmed said its successful implementation would free the people from poverty.

Report: Mamun Islam

## Govt targets freeing 1.80 crore poor from poverty trap by 2020

The government has set a target of freeing another 1.80 crore people from poverty by 2020 under its visionary project - "One House, One Farm", according to official sources.

The target will be achieved by providing financial and livelihood support to 36 lakh households from a special allocation of Taka 8,000 crore, Project Director Akbar Hossain told BSS.

The project in two phases had already provided support to nearly 1.50 crore ultra poor of over 22 lakh households at 40,527 villages under 485 upazilas of all 64 districts across the country.

"In the next phases, he said another 1.8 crore poor people of 60,515 villages across the country would get support to be self-reliant," the project director said.

With successful implementation of the next phase, the total number of beneficiaries of the project would cross 3 crore, he said.

The official said the government has allocated Taka 8,010 crore for the third phase of the project. Of the total allocation, 75 per cent will be added to the revolving fund as grant. Rest of the fund will be spent for providing livelihood training to the beneficiaries and for logistics support for the project. So far the government has allocated Taka 3,162 crore for implementing the first and second phase of the project.

Under the project, Village Development Organisation (VDO) has been formed in every village with 60 poor people, 40 female and 20 male. After formation of the

village organisation, the members start saving Taka 200 per month that turns Taka 2,400 in a year. The government also gives Taka 2,400 per farm family per year as grant.

Besides, a fund of Taka 150,000 per year is given by the government as grant to each of the VDO`s as revolving capital. This fund is merged with their individual savings and bonus from the government.

"We took initiative to build their capital through micro savings instead of micro credit," Akbar said.

The VDO members are given training on five farming livelihood activities including agriculture, nursery, fishery, poultry and livestock.

After getting the training, the beneficiaries start their own business by taking loan from the VDO's revolving fund at only 8.0 per cent interest.

The members of VDO meet in weekly evening meeting to decide which framing training they will take and which kind of business they can start.

The project had already helped reducing poverty rate, said the project director.

According to a World Bank report, the extreme poverty rate dropped to 12.9 percent recent year, which was over 22.0 per cent before launching the project in 2009.

Report: Tanjim Anwar

## Govt plans bringing all poor under One House One Farm Project by 2020

The days of hardship that Bulbuli Begum went through in the past few years now seemed a long nightmare. She was absolutely clueless about what she should do after sudden death of her husband. But a state-supported project lit a light showing her the way of survival with her daughters and sons.

When she was in frantic move in search of a good job for decent living, the "One House One Farm Project" was launched in her village Kholash of Dupchachia upazila in Bogra. It was 2011. From that year, Bulbuli Begum did not get any time to look back at the days of hardship and frustration. Instead, she started dreaming of good life that eventually became a reality. The housewife is now a successful entrepreneur, thanks to the One House One Farm Project. Bulbuli Begum became a member of Kholash Gram Unnayan Samity of the project and borrowed Tk 10,000 from the samity to start a toy making business. Presently, she makes profits of Tk 7000-Tk 8,000 in every month from her home-based toy factory.

Like Bulbuli, thousands of poor people have been able to change their fortune with the help of this Project.

"The government is now planning to establish a total of one lakh Village Development Organisation (VDO) across the country by 2020 for providing all poor people a decent life", Director of the scheme Akbar Hossain said.

The project director said the poor people are included in the VDO after their proper identification. Each of the VDO consists of 60 members 40 females and 20 males.

The members of the VDO deposit Tk 200 a month each for building their own fund, while the government provides equal incentive as bonus against the savings of the members.

"We could support three crore people of 60 lakh families through the one lakh VDO`s," he said, adding that the main philosophy of the project is to remove the shortage of capital by creating a permanent fund for the poor and generate employment through small savings instead of microcredit.

Launched in 2009 with a goal of poverty reduction by involving poor people of the country in the income-generating activities, the project so far brought over 1.50 crore beneficiaries under it support.

He said the VDO exists at all wards of 4,550 unions of the country while 30 lakh poor families are directly involved in around 56,000 VDO`s.

In the process for creating fund of poor people through constituting samities, Akbar said, the permanent fund of the members including bonus given by the government has stood at Tk 3,200 crore.

Akbar said the members of the VDO are becoming self-reliant by cultivating vegetables, farming fish, running small poultry farms and rearing livestock.

Report: Rashedul Islam, Translation: AZM Sajjad Hossain Sabuj

বিশেষ উদ্যোগ ২

# আশ্রয়ণ প্রকল্প

"আশ্রয়ণের অধিকার শেখ হাসিনার উপহার"

## আশ্রয়ণ প্রকল্প

আশ্রয়ণ প্রকল্প ভূমিহীনদের আয়বর্ধক পরিবারে উন্নীত করেছে ২৯
খুলনার ৩০ হাজার ভূমিহীন পরিবারের জীবন পাল্টে দিয়েছে আশ্রয়ণ প্রকল্প ৩১
১৫০ পরিবারের ভাগ্য গড়ে দিয়েছে চেংমারি আশ্রয়ণ প্রকল্প ৩৪
প্রত্যাশা আশ্রয়ণ কেন্দ্রে মাথা গোজার ঠাঁই হয়েছে ৭০টি প্রতিবন্ধী পরিবারের ৩৭
আশ্রয়ণ প্রকল্প ১ লাখ ৬০ হাজার গৃহহীন পরিবারকে পুনর্বাসন করেছে ৪০
Ashrayan project makes landless families self-reliant 43
Ashrayan project changes life of landless in Khulna 45
150 families rebuild future under Ashrayan project 47
Shelter home people want more support 50
1.60 lakh homeless families rehabilitated in Ashrayan project 52

১৯৯৭ সালের ১৯ মে কক্সবাজার জেলাসহ পার্শ্ববর্তী এলাকা ঘূর্ণিঝড়ে আক্রান্ত হওয়ায় বহু পরিবার গৃহহীন হয়ে পড়ে। সে সময়কার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ওই এলাকা পরিদর্শনে যান। তিনি মানুষের দুঃখ-দুর্দশা দেখে গৃহহীন পরিবারগুলোকে পুনর্বাসনের তাৎক্ষণিক নির্দেশ দেন। তারই পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৯৭ সালে 'আশ্রয়ণ' নামে একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। সম্পূর্ণ বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে ১৯৯৭ সাল থেকে এ পর্যন্ত তিন (০৩)টি পর্যায়ে এ আশ্রয়ণ প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রথম পর্যায়ে (১৯৯৭-২০০২), আশ্রয়ণ প্রকল্প দ্বিতীয় পর্যায় (২০০২-২০১০) এবং আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পে (২০১০-২০১৭) ১ হাজার ৭৭৭ কোটি টাকা ব্যয়ে মোট ১ লাখ ৪০ হাজার ১২৮টি পরিবার পুনর্বাসন করা হয়। এর মধ্যে আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের মাধ্যমে ৮৬৯ কোটি টাকা ব্যয়ে ৩৪ হাজার ২১৫টি পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়। এ প্রকল্পের সাফল্য ও ধারাবাহিকতায় ২০১০-২০১৭ (সংশোধিত) মেয়াদে ৫০ হাজার গৃহহীন, ছিন্নমূল পরিবার পুনর্বাসনের লক্ষ্যে আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়।

পুনর্বাসিত ভূমিহীন, গৃহহীন, দুর্দশাগ্রস্ত ও ছিন্নমূল পরিবারের স্বামী-স্ত্রীর যৌথ নামে ভূমির মালিকানা স্বত্বের দলিল/কবুলিয়ত সম্পাদন, রেজিস্ট্রি ও নামজারি করে দেয়া হয়। পুনর্বাসিত পরিবারগুলোর জন্য সম্ভাব্য ক্ষেত্রে কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণ, মসজিদ নির্মাণ, কবরস্থান, পুকুর ও গবাদি পশু প্রতিপালনের জন্য সাধারণ জমির ব্যবস্থা করা হয়। পুনর্বাসিত পরিবারের সদস্যদের বিভিন্ন উৎপাদনমুখী ও আয়বর্ধক কর্মকাণ্ডের জন্য ব্যবহারিক ও কারিগরি প্রশিক্ষণ দান এবং প্রশিক্ষণ শেষে তাদের মধ্যে ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ করা হয়। গ্রামে বসবাসরত প্রকল্প উপকারভোগীদের (যেমন : নাম/স্বামীর নাম, সন্তান সংখ্যা, ঋণ ইত্যাদি) এবং গ্রামে প্রকল্পের তথ্য সংরক্ষণ করার জন্য ডাটাবেজ প্রণয়ন করা হয়েছে। ডাটাবেজের ঠিকানা: (http://ashrayandbpmo.gov.bd).

## আশ্রয়ণ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য

১. ভূমিহীন, গৃহহীন, ছিন্নমূল, অসহায় দরিদ্র জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসন
২. ঋণ প্রদান ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহে সক্ষম করে তোলা
৩. আয়বর্ধক কার্যক্রম সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণ

## আশ্রয়ণ প্রকল্পের আওতায় গৃহীত প্রধান কার্যাবলী

- প্রকল্প বাছাই;
- ভূমি উন্নয়ন;
- ব্যারাক নির্মাণ;
- উন্মুক্ত পদ্ধতিতে উপকারভোগী বাছাই;
- ভিজিএফ (VGF) প্রদান (ব্যারাকে ওঠার পরবর্তী তিন মাস);
- প্রশিক্ষণ প্রদান;
- ঋণ প্রদান;
- বৃক্ষরোপণ;
- ঘাটলা ও অভ্যন্তরীণ রাস্তা নির্মাণ;
- টিউবওয়েল স্থাপন;

**আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প :** আশ্রয়ণ প্রকল্পের ধারাবাহিকতায় আশ্রয়ণ-২ (জুলাই ২০১০-জুন ২০১৭) নামে একটি প্রকল্পের কার্যক্রম বর্তমানে চলমান রয়েছে।

এ প্রকল্পে ঘূর্ণিঝড়, সিডর, আইলা আক্রান্ত এলাকার জন্য পাকা ব্যারাক, অন্যান্য অঞ্চলের জন্য সেমি-পাকা ব্যারাক এবং নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর জন্য তাদের কৃষ্টি, সংস্কৃতি ও রীতিনীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বিশেষ ডিজাইনের গৃহ নির্মাণের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

## সংক্ষেপে প্রকল্প পরিচিতি

**উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য:** ৫০ হাজার ভূমিহীন, গৃহহীন, ছিন্নমূল পরিবারকে পুনর্বাসন।

**মূল ডিপিপি অনুমোদন:** ৩১ আগস্ট, ২০১০।

**সংশোধিত ডিপিপি অনুমোদন:** ১৩ আগস্ট, ২০১৩।

**প্রকল্পের মেয়াদ:** জুলাই ২০১০-জুন ২০১৭।

**মোট প্রাক্কলিত ব্যয়:** ২২০৪০০.১৯ লাখ টাকা।

**অর্থের উৎস:** বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব তহবিল।

## আশ্রয়ণ প্রকল্প বাস্তবায়ন পদ্ধতি ও বিভিন্ন ধাপ

- খাসজমি, রিজিউমকৃত জমি, দানকৃত জমি এবং সম্ভাব্য ক্ষেত্রে ক্রয়কৃত জমি চিহ্নিত করে উপজেলা প্রশাসন কর্তৃক আশ্রয়ণ প্রকল্পের স্থান নির্বাচন এবং জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে প্রকল্প প্রস্তাব প্রেরণ;
- আশ্রয়ণ প্রকল্প কর্তৃক প্রস্তাবিত প্রকল্পের প্রাক-জরিপ যাচাই;
- অনুমোদিত প্রাক্কলন ও নকশা অনুসারে উপজেলা প্রশাসন কর্তৃক নির্বাচিত স্থানে মাটির কাজ সম্পাদন;
- আশ্রয়ণ প্রকল্প কর্তৃক মাটির কাজের কর্মোত্তর জরিপ যাচাই;
- ব্যারাক নির্মাণের জন্য সশস্ত্র বাহিনীর অনুকূলে অগ্রিম অর্থ বরাদ্দ;
- সশস্ত্র বাহিনী কর্তৃক ব্যারাক নির্মাণ ও উপজেলা প্রশাসনের নিকট হস্তান্তর;
- সরকার অনুমোদিত নীতিমালা অনুযায়ী উপজেলা প্রশাসন কর্তৃক উন্মুক্ত পদ্ধতিতে পরিবার বাছাই;
- প্রকল্পে পুনর্বাসিত স্বামী-স্ত্রীর যৌথ নামে ভূমির মালিকানা সত্তের দলিল/ কবুলিয়ত সম্পাদন, রেজিস্ট্রি ও নামজারি সম্পাদন;

## অর্জন

- সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়িত এই প্রকল্পের ৩টি পর্যায়ে ১৯৯৭ থেকে জুন ২০১৭ পর্যন্ত ১ লাখ ৫৯ হাজারের বেশি পরিবার পুনর্বাসিত হয়েছে।
- আশ্রয়ণ প্রকল্প-২ এর আওতায় ২০১০ সাল থেকে এ পর্যন্ত ৫৩ হাজারের বেশি পরিবার পুনর্বাসিত হয়েছে।
- ইতিমধ্যে ৮০২টি প্রকল্পে গ্রামে বিদ্যুৎ সংযোগ দেয়া হয়েছে এবং প্রায় ৪ লাখ বৃক্ষরোপণ করা হয়েছে।
- 'নিজ জমিতে গৃহ নির্মাণ' কর্মসূচির আওতায় এ পর্যন্ত ৬০১টি ভিক্ষুক পরিবারসহ ১৫ হাজার ৭৭৫টি গৃহহীন পরিবারকে ঘর নির্মাণ করে দেয়া হয়েছে।
- ২০১০ থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত ২৩ হাজার ৫৭৫টি পরিবারের মাঝে ৩৭.৮৭ কোটি টাকা ঋণ দেয়া হয়েছে। ২৬ হাজার ৩০টি পরিবারকে ১০.৫৩ কোটি টাকা ব্যয়ে পেশাভিত্তিক প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে।

## ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

- আশ্রয়ণ প্রকল্প-২এর আওতায় ২০১৯ সালের মধ্যে ২ লাখ ৫০ হাজার গৃহহীন ছিন্নমূল পরিবারকে পুনর্বাসন করার কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।
- আশ্রয়ণ প্রকল্প এলাকায় সোলার প্যানেল স্থাপনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করা।
- প্রকল্প এলাকায় বাড়িগুলোকে দুর্যোগ সহনীয়ভাবে তৈরি করা।
- প্রকল্প এলাকায় পুকুর খনন করা এবং টেকসই সংযোগ সড়ক ও কালভার্ট তৈরি করা।
- দুর্যোগ সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রকল্প এলাকার বাসিন্দাদের প্রশিক্ষণ দেয়া।

তথ্য : www.ashrayanpmo.gov.bd, ছবি : চলচিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর

## আশ্রয়ণ প্রকল্প ভূমিহীনদের আয়বর্ধক পরিবারে উন্নীত করেছে

বাসাবাড়িতে আধুনিক পদ্ধতিতে মুরগি পালনের মাধ্যমে রিকশাওয়ালা সবিজ মিয়ার স্ত্রী লতিফা আক্তার এখন দীর্ঘদিনের দারিদ্র্য থেকে মুক্তি লাভ করেছেন।

রাজশাহী জেলার চারঘাট উপজেলার হালিদাগাছি আশ্রয়ণ প্রকল্পের অধিবাসী লতিফা দুই কন্যা ও এক পুত্র সন্তানের জননী। ২০১৫ সালের শুরুতেই তিনি মুরগি পালন করে স্বাবলম্বী হয়ে ওঠেন।

প্রাথমিক পর্যায়ে তিনি লোকাল সার্ভিস প্রোভাইডারস (এলএসপি)-এর মাধ্যমে যথাযথ খাবার ভ্যাকসিন প্রদান এবং বাজারজাতকরণসহ মুরগি পালনের প্রশিক্ষণ নেন।চলতি বছর ডিম ও মুরগি বিক্রি করে ৩ হাজার ৫০০ টাকা আয় করেছেন। তিনি বাসসকে বলেন, স্থানীয় মুরগির ডিমের চাহিদা ও মূল্য অন্যান্য জাত থেকে বেশি।

হালিদাগাছি মাইক্রো অ্যান্ড স্মল এন্টারপ্রাইজের (এমএসই) ২৫ সদস্যের সমিতিতে যোগ দেয়ার পর লতিফা পোল্ট্রি পালন ও বাজারজাতকরণে বাড়তি সুবিধা নিয়েছেন।

বড় মেয়ে সাজিমা আক্তার নিকটবর্তী জাফরপুর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণির ছাত্রী। মায়ের আয় দিয়ে তার পড়াশোনার খরচ মেটানো হয়। সে আগামী দিনে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত হতে চায়।

এখানে সরকারের আশ্রয়ণ কেন্দ্রে স্থায়ী আবাসস্থল হওয়ার পরে লতিফার মতো ২৮০ জন ভূমিহীন লোকের জীবনযাত্রার মান তুলনামূলকভাবে উন্নত হয়েছে।

অপর এক গৃহবধূ আলিমা বেগম বলেন, আমরা বাগানপাড়া এলাকায় রাস্তার পাশের শেডে বাস করি। আমার স্বামী ভ্যান চালান এবং পরিবারের তিন সদস্যকে নিয়ে এখানে বসবাস করছি। অতীতের কঠিন জীবনের কথা স্মরণ করলে তার চোখ জলে ভরে ওঠে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০১৪ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি হালিদাগাছি আশ্রয়ণ প্রকল্প-২ উদ্বোধন করেন। ভূমিহীনদের জন্য এখানে আবাসন ইউনিট গড়ে তোলা হয়।

বাগমারা উপজেলার ঠাকুরজি আশ্রয়ণ প্রকল্পে বসবাসকারী কৃষক মনোয়ার হোসেন (৩৮) বলেন, আমরা সমবায় ভিত্তিতে মাছ চাষ ও শাকসবজি উৎপাদন করছি এবং দুই সন্তানকে নিকটবর্তী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাঠাচ্ছি। মনোয়ার হোসেন বলেন, প্রকল্পে ৪টি পুকুর আছে, সমবায় ভিত্তিতে সেখানে মাছ চাষ করা হচ্ছে। দরিদ্র ও অসহায় দুস্থরা এখানে আশ্রয় পেয়ে খুশি।

অপর এক গৃহবধূ জাকিয়া বেগম জানান, তারা তাদের বাসার পাশে পোল্ট্রি ফার্ম ও শাকসবজি উৎপাদন করছেন। এখানে খাবার পানির সংকট নেই। ৫০ পরিবারের এ আবাসনে প্রতি ১০ পরিবারের জন্য ১টি করে টিউবওয়েল আছে।

জাহানারা বেগম ৩ ছেলে, এক মেয়ে নিয়ে সেখানে বাস করছেন। এখানে আসার আগে তারা নদীর তীরে কঠিন জীবন কাটিয়েছেন।

তিনি বলেন, বর্তমান সরকার আমাদের বাসস্থান দিয়েছে। আমরা শাকসবজির ক্ষেত ও পোল্ট্রি চাষ করছি। বিদ্যুৎ পর্যাপ্ত হওয়ায় আমাদের সন্তানদের লেখাপড়ার কোনো সমস্যা হচ্ছে না। তিনি আল্লাহর কাছে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও তাঁর সরকারের প্রশংসা এবং মঙ্গল কামনা করেন।

বাগমারা উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান জাকিরুল ইসলাম শান্ত বলেন, সত্যিকার ভূমিহীন, অতিদরিদ্র এবং আশ্রয়হীন মানুষ এই প্রকল্পে আশ্রয় পেয়েছে।

অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক সালাউদ্দিন বলেন, বর্তমান সরকারের মেয়াদে উপজেলায় ৯টি আশ্রয়ণ প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে। এতে ১ হাজার ৩২টি পরিবার পুনর্বাসিত হয়েছে।

প্রতিবেদন: আয়নাল হক, অনুবাদ: আজম সারোয়ার চৌধুরী

## খুলনার ৩০ হাজার ভূমিহীন পরিবারের জীবন পাল্টে দিয়েছে আশ্রয়ণ প্রকল্প

এক টুকরো জমি তো দূরে থাক, তাদের থাকার জায়গাই ছিল না। নিঃস্ব ভূমিহীন সেই মানুষগুলোই এখন স্বপ্ন দেখছে সুন্দরভাবে বাঁচার। মানুষের মতো বেঁচে থাকার। সরকারের আশ্রয়ণ প্রকল্পের অধীনে তারা এখন পেয়েছে

একটি নিজস্ব ঘর। একটু আশা। জেলার ৩০ হাজার ৩১২টি ভূমিহীন পরিবারের জীবন পাল্টে দিয়েছে আশ্রয়ণ প্রকল্প।

সরেজমিনে দেখা যায়, জেলার ডুমুরিয়া উপজেলার ভেণ্ডারপারা এলাকায় আশ্রয়ণ প্রকল্পে ভূমিহীন ২৬০টি পরিবারকে একটি করে ঘর দিয়েছে সরকার। পাকা মেঝে ও দেয়াল ঘেরা টিনশেডের একটি লম্বা ঘরে অনায়াসেই বাস

করতে পারে  ছোট একটি পরিবার। প্রতি দশটি পরিবারের জন্য একটি টিউবওয়েল, পাঁচটি পরিবারের জন্য একটি স্যানিটারি ল্যাট্রিন এবং বিদ্যুৎ ব্যবস্থাও আছে এই প্রকল্প এলাকায়।

জ্যোস্না বেগম এই আশ্রয়ণ প্রকল্পে একটি ঘর পেয়েছেন। তিনি বলেন, কিছুদিন আগেও কাটাখালি এলাকার একটা গাছের নিচেই ছিল আমাদের ঘর। এক কথায় আমরা ছিলাম যাযাবরের মতো। এখন আমাদের একটা নিজের ঠিকানা হয়েছে। স্বামী রিকশাভ্যান চালিয়ে যা পায় তাতে তিনজনের সংসার ভালোভাবেই চলে যায়।

কষ্টের দিনগুলো মনে করে জ্যোস্না বেগমের কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসে। তিনি বলেন, সেসব কষ্টের দিন গেছে আমাদের। আজ এখানে তো কাল ওখানে। স্বামীরও তেমন কোনো আয় ছিল না। খেয়ে না খেয়েই চলত আমাদের সংসার। সবচেয়ে বেশি কষ্ট হতো প্রাত্যহিক কাজের সময়। সে যে কী লজ্জায় পড়তাম বলে বুঝানো যাবে না। এখন আর সেসবের ভাবনা নেই। নিজেদের একটা ঠিকানা হয়েছে এই যথেষ্ট। এজন্য সরকারের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ।

একই এলাকার বাসিন্দা পঁয়ত্রিশ বছর বয়সী মো. বিল্লাল ছানা। পেশায় কৃষক। কিন্তু থাকার নিশ্চয়তাটুকু পেয়ে তার স্বপ্নও বদলেছে। তিনি বলেন, আমরা কয়েকজনে মিলে সমবায় ভিত্তিতে মাছ চাষ এবং সবজি চাষ করি। এখন আমার দুই বাচ্চা ভেণ্ডারপারা (আশ্রয়ণ প্রকল্প এলাকা) সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যায়।

তিনি বলেন, প্রকল্পের ভেতরে চারটি পুকুর আছে। আমরা সেসব পুকুরে সমবায় ভিত্তিতে মাছ চাষ করি। এ ছাড়াও কিছু সবজি চাষ করি। এখানে জায়গা পাওয়ায় আমরা সবাই সরকারের কাছে কৃতজ্ঞ। কিন্তু আরেকটু ভালোভাবে বাঁচার জন্য চাই কাজের সুযোগ। তাই তিনি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে প্রত্যেক পরিবারের জন্য চাষাবাদের জমি বরাদ্দ দেওয়ার আবেদন জানান। তিনি বলেন, যদি কিছু জমি পাওয়া যায়, সেখানে চাষাবাদ করে আমরা অর্থনৈতিকভাবে আরো স্বাবলম্বী হতে পারব। সে আয় থেকে আমাদের ঘর-বাড়িও মেরামত করতে পারব।

জাকিয়া বেগম বলেন, আমরা এখানে সমবায় ভিত্তিতে সবজি চাষ এবং হাঁস-মুরগি পালন করি। এখানে বিশুদ্ধ খাওয়ার পানিরও কোনো অভাব নেই। প্রকল্পের পক্ষ থেকে প্রতি দশটি পরিবারের জন্য একটি করে টিউবওয়েল দেয়া হয়েছে।

শুকজান বিবি বলেন, আগে আমি- আমার তিন ছেলে ও এক মেয়েকে নিয়ে নদীর তীরে থাকতাম। খুব কষ্টে আমাদের দিন কাটত। এখন আর সেসব দিনের মত কোন চিন্তা নেই। এখন আমার সব ছেলেমেয়েই স্কুলে যায়। বাড়িতেও পড়ালেখার কোনো অসুবিধা হয় না। এখানে বিদ্যুতের ব্যবস্থাও আছে। তিনি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং তাঁর সরকারের দীর্ঘায়ু ও সাফল্য কামনা করেন।

ভেণ্ডারপারা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সিরাজুল ইসলাম বলেন, মূলত ভূমিহীন, অতি দরিদ্র এবং আশ্রয়হীনরাই এসব আশ্রয় কেন্দ্রে জায়গা পেয়েছে। তিনি এই আশ্রয় কেন্দ্রটি মেরামত করার জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

খুলনার ডেপুটি কমিশনার মো. আমিন উল আহসান বলেন, বর্তমান সরকারের সময় জেলার নয়টি উপজেলায় সর্বমোট ৪১টি আশ্রয়ণ প্রকল্প করা হয়েছে। এসব প্রকল্পের আওতায় ৩০ হাজার ৩১২টি গৃহহীন পরিবারকে ঘর দেয়া হয়েছে।

তিনি বলেন, আশ্রয়ণ প্রকল্পের বাসিন্দাদের সরকার শুধু থাকার সুযোগই সৃষ্টি করেনি, তাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ, স্বাস্থ্যসেবা, স্যানিটেশন, বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থা এবং তাদের সন্তানদের শিক্ষার ব্যবস্থাও করেছে।

প্রধানমন্ত্রী  শেখ হাসিনার দশটি বিশেষ উদ্যোগের একটি হচ্ছে আশ্রয়ণ প্রকল্প। তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকার ১৯৯৭ সালে প্রথম এই প্রকল্প হাতে নেয়। মূলত সে সময় ঘূর্ণিঝড়ের কারণে গৃহহীন হয়ে যাওয়া সেন্ট মার্টিন এলাকার বাসিন্দাদের কাছে খুবই জনপ্রিয় হয়ে উঠে এই আশ্রয়ণ প্রকল্প। পরবর্তীতে ভূমিহীন ও অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য এ আশ্রয়ণ কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়।

প্রতিবেদন : এস এম জাহিদ হোসেন, অনুবাদ : প্রদ্যুত শ্রী বড়ুয়া

## ১৫০ পরিবারের ভাগ্য গড়ে দিয়েছে চেংমারি আশ্রয়ণ প্রকল্প

রংপুর জেলার গংগাচড়া উপজেলার সদর ইউনিয়নে, চেংমারি আশ্রয়ণ প্রকল্প পুনর্বাসিত ১৫০টি ভূমিহীন পরিবারকে প্রশিক্ষণ ও আর্থিক সহায়তা দিয়ে তাদের ভাগ্য গড়ে দিয়েছে।

বারবার নদী ভাঙনের ফলে সবকিছু হারিয়ে এই পরিবারগুলো বর্ণনাতীত দুঃখ-দুর্দশার মধ্য দিয়ে ভাসমান জীবনযাপন করে আসছিলো। 'চেংমারি আশ্রয়ণ ধাপ-২ প্রকল্প' ও 'চেংমারি আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প' এর মাধ্যমে পুনর্বাসিত হওয়ায় বদলে যায় তাদের জীবনের গল্প।

গংগাচড়া উপজেলার সমবায় কর্মকর্তা মাসুদ রানা বলেন, 'চেংমারি আশ্রয়ণ ধাপ-২ প্রকল্প' এর মাধ্যমে ২০১০ সালে ৫০টি পরিবার এবং ২০১২ সালে 'চেংমারি আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প' এর মাধ্যমে আরো ১০০টি পরিবারকে পুনর্বাসিত করা হয়"।

পরবর্তীতে স্থানীয় সরকার বিভাগ তাদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও সহযোগিতা দেয়। পাশাপাশি আয়বর্ধক কাজ করার জন্য উপজেলা সমবায় অফিস তাদের মধ্যে বিনা সুদে ঋণ দেয়।

'চেংমারি আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের' মাধ্যমে ২০১২ সালে পুনর্বাসিত হন নূর মোহাম্মদ (৪২) ও লায়লা খাতুন (৩৫) দম্পতি । নূর মোহাম্মদ বলেন, "কুড়িগ্রাম জেলার উলিপুর উপজেলার হাতিয়া গ্রামে আমার পৈতৃক বাড়ি ছিল। ২৭ বছর আগে ব্রহ্মপুত্রের ভাঙনে আমাদের সব সম্পত্তি বিলীন হয়ে গেলে আমি ভূমিহীন হই। কাজের সন্ধানে গংগাচড়া এসে অন্যের জায়গায় বসবাস শুরু করি। পরে স্থানীয় লায়লা খাতুনকে বিয়ে করে এখানেই স্থায়ীভাবে থেকে যাই।

তিনি বলেন, ২০১২ সালে আমার পরিবার, আমার স্ত্রীর বিধবা বোন শেফালী বেগমের (৫০) পরিবার ও শেফালী বেগমের মেয়ে বাতাসী বেগমের (৩০) পরিবার একসঙ্গে 'চেংমারি আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের' মাধ্যমে পুনর্বাসিত হই।

নূর মোহাম্মদ বলেন, 'উপজেলা সমবায় অফিস থেকে ট্রেনিং নেয়ার পর আয়বর্ধক কাজের জন্য প্রথমে আমি ৫ হাজার টাকা ও শেফালী বেগম এবং

তার মেয়ে বাতাসী বেগম ১০ হাজার টাকা করে বিনা সুদে ঋণ পাই'। এদিকে বাতাসী বেগমের স্বামী আব্দুল লতিফ একটি হোটেলে দৈনিক ৩৫০ টাকা রোজে ও নূর মোহাম্মদের ছেলে ৫৫০ টাকা রোজে রাজমিস্ত্রির কাজ করে পরিবারে টাকার জোগান দেন।

লায়লা খাতুন বলেন, 'আমরা সব টাকা একত্র করে দুটি ছাগল, একটি ষাঁড় ও একটি মুদি দোকান দেই। দুই বছর পর দুটি ছাগল ১০ হাজার টাকা ও ষাঁড়টি ৪৫ হাজার টাকায় বিক্রি করি"। নূর মোহাম্মদ নিয়মিত উপার্জন করতে একটি অটো রিকশা চালানো শুরু করেন।

শেফালী বেগম ও বাতাসী বেগম প্রথম ঋণ পরিশোধ করায় তারা দ্বিতীয়বার প্রত্যেকে ১৪ হাজার টাকা করে ঋণ পান। দ্বিতীয় ঋণ পরিশোধ করায় তারা প্রত্যেকে আবার ১৬ হাজার টাকা করে ঋণ পান। বাতাসী বেগম জানান, এই

কয় বছরে তারা ৫৫ শতক আবাদযোগ্য জমি তিন লাখ টাকায় ইজারা নিয়েছেন এবং সেখানে তিনটি শস্য উৎপাদন করে বছরে এক লাখ টাকা আয় করেন। এদিকে লায়লা খাতুনকে দিয়ে তারা একটি মুদি দোকানও চালান।

বাতাসী বেগম বলেন, 'আমরা ৭৫ হাজার টাকায় তিনটি ষাঁড় কিনেছি। এগুলো আগামী কোরবানির ঈদে দেড় লাখ টাকায় বিক্রি করার আশা আছে।

নূর মোহাম্মদ বলেন, এখন আমার পরিবার নিয়ে সুখে, স্বাচ্ছন্দে জীবনযাপন করছি। বর্তমানে আমাদের নিজেদের প্রায় সাত লাখ টাকার সম্পত্তি আছে। আমাদের ছেলেমেয়েরা এখন স্কুলেও যাচ্ছে।

২০১০ সালে 'চেংমারি আশ্রয়ণ ধাপ-২ প্রকল্প' এর মাধ্যমে পুনর্বাসিত দম্পতি নূর সাহেব ও তার স্ত্রী লাকী বেগম। আয়বর্ধক কাজের প্রশিক্ষণ নেয়ার পর ২০১২ সালে উপজেলা সমবায় অফিস প্রথমে ৬,০০০ টাকা ঋণ নিয়ে বর্গাচাষী হিসেবে শষ্য উৎপাদন শুরু করেন।

প্রথম ঋণ পরিশোধের পর ২০১৪ সালে তারা ৮ হাজার টাকা ঋণ পান। এই টাকা দিয়ে একটি ষাঁড় কেনেন। যা ২০১৬ সালে ২৪ হাজার টাকায় বিক্রি করে দ্বিতীয় ঋণ পরিশোধ করেন এবং গত বছর আবারো ১৮ হাজার টাকা ঋণ নেন।

বর্তমানে তাদের তিন লাখ টাকার নিজস্ব সম্পত্তি আছে বলে জানান তার স্ত্রী লাকী বেগম। এবারে তারা দুটি ষাঁড় কিনেছেন। চাষাবাদের জন্য ১২ শতক আবাদযোগ্য জমি ২৪ হাজার টাকায় ইজারা নিয়েছেন। পাশাপাশি লাকী বেগম নিজে একটি মুদি দোকানও চালান। তাদের বড় মেয়ে ষষ্ঠ শ্রেণিতে, ছেলে তৃতীয় শ্রেণিতে ও ছোট মেয়ে প্রথম শ্রেণিতে পড়ছে।

গংগাচড়া সদর ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান আল সুমন আব্দুল্লাহ বলেন, সরকারি সহযোগিতার পাশাপাশি 'আশ্রয়ণ প্রকল্প' এই দুটি প্রকল্পের মাধ্যমে কার্যকরীভাবেই ১৫০ টি পরিবারকে পুনর্বাসিত করেছে এবং তাদের আত্মনির্ভরশীল হয়ে উঠতে সাহায্য করেছে।

প্রতিবেদন : মামুন ইসলাম, অনুবাদ : সৈয়দ এলতেফাত হোসেইন

## প্রত্যাশা আশ্রয়ণ কেন্দ্রে মাথা গোজার ঠাঁই হয়েছে ৭০টি প্রতিবন্ধী পরিবারের

গাজীপুর জেলার কালিয়াকৈর সদর উপজেলার প্রত্যাশা আশ্রয়ণ কেন্দ্রে মাথাগোজার ঠাঁই পেয়েছে কুষ্ঠ রোগীসহ প্রতিবন্ধী ৭০টি পরিবারের প্রায় পৌনে তিনশ' সদস্য।

ভিক্ষাবৃত্তি প্রতিরোধে প্রাথমিক প্রচেষ্টা হিসেবে ২০০০ সালের ২৮ জানুয়ারি প্রত্যাশা আশ্রয়ণ প্রকল্প গড়ে তোলা হয়।

প্রথমে ৫৪টি পরিবারকে এখানে আনা হয়েছিল। ৫৪টির মধ্যে প্রত্যেক পরিবারেই একজন করে সদস্য এক সময়ে কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত ছিলেন। যাদের কেউ হারিয়েছেন হাত আবার কেউ হারিয়েছেন পা। রোগ মুক্তি হলেও পঙ্গুত্বের কারণে তারা কোনো কাজ করতে পারেন না। কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশন, আগারগাঁও পঙ্গু হাসপাতাল এলাকার আশপাশের বস্তিই ছিল তাদের ঠিকানা। খোলা আকাশই ছিল তাদের ছাদ।

কালিয়াকৈর উপজেলার বোয়ালিয়া ইউনিয়নের বান্দাবাড়ি গ্রামে এ আশ্রয়ণ কেন্দ্রে বর্তমানে ৭০টি পরিবারকে মোট ৭ দশমিক ৯২ একর খাসজমি বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। এর মধ্যে বসতবাড়ির জন্য ৭ দশমিক

শূন্য ৫ একর, কমিউনিটি সেন্টারের জন্য দশমিক শূন্য ১০ একর, স্কুলের জন্য দশমিক শূন্য ৫৭ একর, কবরস্থানের জন্য দশমিক শূন্য ১০ একর, মসজিদের জন্য দশমিক শূন্য ৫ একর জমি।

বান্দাবাড়ি গ্রামটি ভাওয়ালের গভীর অরণ্যে অবস্থিত হলেও ২০০০ সালের ১০ অক্টোবর হতে প্রত্যাশা আশ্রয়ণ প্রকল্প চালুর পর এখানে দোকানপাট গড়ে ওঠে। বিদ্যুৎও পৌঁছে যায়।

কিন্তু ২০০১ সালে বিএনপি জোট ক্ষমতায় আসার পর থেকে তাদের প্রাপ্য সব ধরনের সুযোগ-সুবিধা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। তখন সরকারের আবাসন বাস্তবায়ন সংস্থার (আবাস) মাধ্যম প্রত্যাশা আশ্রয়ণ প্রকল্পের সদস্যরা কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করেও কোনো সুফল পাননি।

আশ্রয়ণ প্রকল্পের নেতা মতিউর রহমান বলেন, সময়মতো ওষুধ ও চিকিৎসা দেয়া হলে এখানকার কুষ্ঠ রোগীর সংখ্যা কমে যেত। তবে গত ১৬ বছরে কুষ্ঠ রোগের হার অনেক কমেছে। অর্থাৎ প্রত্যাশা আশ্রয়ণ প্রকল্পের ৬০টি পরিবারের বর্তমানে মোট জনসংখ্যা হচ্ছে প্রায় ২৭৫ জন।

প্রতিবন্ধী মতিউর রহমানের বাড়ি লালমনিরহাট জেলার পাটগ্রামের বাউরা ইউনিয়নে। কাজ-কর্ম করতে অক্ষম। আট সদস্যের পরিবার-পরিজন নিয়ে তিনি থাকতেন ঢাকার কমলাপুর রেল স্টেশনের ৮নং প্ল্যাটফর্ম-এর নিচে একটি বস্তি ঘরে। তার দুই হাতেরই আঙ্গুল নেই। হাতে-পায়ে বেশ সমস্যা। হাঁটতে খুবই কষ্ট হয়। আট সদস্যের সংসারে ভিক্ষাবৃত্তিই তার একমাত্র আয়ের উৎস ছিল। বর্তমানে তারা এখানে থাকেন এবং স্থানীয়ভাবে কাজ করে সংসার চালান। ২০০০ সালের ১০ অক্টোবর তিনি প্রত্যাশায় আসেন পরিবারের সবাইকে নিয়ে। এখানকার প্রায় ৪০ জন ছেলে-মেয়ে আশপাশের প্রাইমারি ও হাইস্কুলে লেখাপড়া করে।

আশ্রয়ণ কেন্দ্রের সদস্য হাফিজুর রহমান জানান, এ পর্যন্ত প্রায় ১২ জন সদস্য বার্ধক্যসহ বিভিন্ন কারণে মারা গেছেন। এ ছাড়া আশ্রয়ণ কেন্দ্রের রহিমা বেওয়া, বাবুল, মজিদ, মোখলেছ, শামসুল, নূরু, আমীন, কাশেম, মিজানুর রহমান, হাবিবুর, আলাউদ্দিনসহ আরো কয়েকজন সদস্য জানান, তাদের একবার এককালীন ঋণ দেয়া হয়েছিল ১০ হাজার টাকা। ইতোমধ্যে

তারা সবাই এই ঋণের টাকা পরিশোধ করেছেন। এরপর আর কোনো ঋণ দেয়া হয়নি। অনেকে প্রতিবন্ধী ও বয়স্কভাতা ও উপবৃত্তি পান না বলে জানালেন।

তারা আরো জানান, ২০০১ সালে বিএনপি-জামাত জোট ক্ষমতায় আসার পর প্রত্যাশা আশ্রয়ণ প্রকল্পের পরিবারগুলো চরমভাবে অসহায় হয়ে পড়েছিল। তারা বলেন, 'আমরা সেই সাত-আট বছর অনেক কষ্টে জীবন-যাপন করেছি। বর্তমানে সেই পরিস্থিতি আর নেই।'

আশ্রয়ণ প্রকল্পের ৫০ জন বেকার ছেলে-মেয়ের চাকুরির ব্যবস্থা করা জন্য তারা যথাযথ কর্তৃপক্ষের প্রতি অনুরোধ জানান।

কালিয়াকৈর উপজেলা নির্বাহী অফিসার সানওয়ার হোসেন বলেন, আশ্রয়ণের মানুষ মাছচাষ এবং কৃষিকাজের জন্য যথেষ্ট অর্থ পেলে তাদের জীবনযাত্রা আরো উন্নত হবে।

তিনি বলেন, আশ্রয়ণ কেন্দ্রের ভেতরে একটি বড় পুকুর রয়েছে। উপজেলা কর্তৃপক্ষ মৎস্য খাতের জন্য পুকুরটি খনন করতে অর্থ বরাদ্দ করেছে।

কালিয়াকৈর এলাকা ও গাজীপুর সদরের অংশ নিয়ে গাজীপুর-১ আসনের নির্বাচিত সংসদ সদস্য ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আ.ক.ম মোজাম্মেল হক এ প্রসঙ্গে বলেন, প্রত্যাশা আশ্রয়ণ প্রকল্পটি ২০০০ সালে আমাদের নেত্রী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা চালু করেন। ২০০১ সাল থেকে প্রত্যাশা আশ্রয়ণ প্রকল্পটির আশ্রিতরা সব ধরনের সুযোগ-সুবিধা বঞ্চিত ছিল। বর্তমানে তাদের জন্য আবার সুযোগ সুবিধা দেয়া হয়েছে। কিন্তু তারা সেখানে থাকতে চায় না। ঢাকায় এসে ভিক্ষা করে।

তবে তাদের কোনো সমস্যা বা দাবি থাকলে তা শিগগিরই সমাধান করা হবে বলে মন্ত্রী জানান।

প্রতিবেদন : আতাউর রহমান

## আশ্রয়ণ প্রকল্প ১ লাখ ৬০ হাজার গৃহহীন পরিবারকে পুনর্বাসন করেছে

দেশে আশ্রয়ণ প্রকল্পের মাধ্যমে ১ লাখ ৬০ হাজার গৃহহীন পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ উদ্যোগের অংশ হিসেবে দেশের সব গৃহহীন পরিবারের আবাসন সুবিধা নিশ্চিত করতে এ প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়।

প্রকল্পের অধীনে গৃহহীন প্রত্যেক পরিবার একটি করে ঘর পেয়েছে। ২১ হাজার ৭৪৫টি পরিবারকে ৩২ কোটি ৫২ লাখ টাকা ঋণ দেয়া হয়েছে। ঋণের টাকায় এসব পরিবার আয়বর্ধক নানা কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে নিজেরা স্বাবলম্বী ও দারিদ্র্যমুক্ত হয়েছে।

আশ্রয়ণ প্রকল্পের উপ-প্রকল্প পরিচালক এস এম হামিদুল হক বাসসকে বলেন, এই প্রকল্পের মাধ্যমে সুবিধাভোগীদের কেবল একটি করে ঘরই করে দেয়া হয়নি, পাশাপাশি পরিবারের সদস্যদের চাহিদামতো কর্মমুখী প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। প্রশিক্ষণ শেষে পরিবার প্রতি ৩০ হাজার টাকা করে সুদমুক্ত ঋণ দেয়া হয়। এই ঋণ নিয়ে তারা আয়বর্ধক কর্মকাণ্ডে যুক্ত হয়ে নিজেদের ভাগ্যের পরিবর্তন করে।

তিনি বলেন, প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হলো– ভূমিহীন, গৃহহীন ও ছিন্নমূল অসহায় মানুষের আবাসন সুবিধা দেয়ার পাশাপাশি ঋণ ও প্রশিক্ষণ দিয়ে তাদের জীবিকা নির্বাহে সক্ষম করে তোলা। প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্নপ্রসূত এ প্রকল্প সারাদেশের গৃহহীন প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসনসহ দারিদ্র্য বিমোচনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে।

১৯৯৭ সালের ১৯ মে কক্সবাজার জেলাসহ পার্শ্ববর্তী এলাকা ঘূর্ণিঝড়ে আক্রান্ত হওয়ায় বহু পরিবার গৃহহীন হয়ে পড়ে। সে সময় তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এসব গৃহহীন পরিবারকে তাৎক্ষণিক পুনর্বাসনের নির্দেশ দেন। এরই প্রেক্ষিতে সে বছরই 'আশ্রয়ণ' নামের এই প্রকল্পের যাত্রা শুরু হয়। শুরু থেকে তিনটি পর্যায়ে নিয়মিতভাবে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

হামিদুল হক জানান, প্রকল্পের তিনটি পর্যায়ে এ পর্যন্ত ১ হাজার ৮৮১টি প্রকল্প এলাকায় ১ লাখ ৬০ হাজার গৃহহীন পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়েছে। এর মধ্যে ১ হাজার ৮৩৭টি গ্রামে ব্যারাক নির্মাণ করে ১ লাখ ৪৪ হাজার ১২০টি পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়েছে। এ ছাড়া 'যার জমি আছে ঘর নাই'– এমন পরিবারকে নিজ জমিতে গৃহনির্মাণ করে পুনর্বাসিত পরিবারের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৫ হাজার ১৪২টি। ৬৯১টি ভিক্ষুক পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়েছে। পার্বত্য এলাকায় ৩৮টি বিশেষ ঘর এবং ২০টি টং ঘর নির্মাণ করে দেয়া হয়েছে।

তিনি বলেন, দেশের সব ছিন্নমূল ও গৃহহীন মানুষকে এই প্রকল্পের আওতায় আনার পরিকল্পনা সরকারের রয়েছে। এর অংশ হিসেবে চলমান আশ্রয়ণ প্রকল্পের অধীনে সরকার নিজস্ব অর্থায়নে ২০১৯ সালের জুনের মধ্যে আড়াই লাখ গৃহহীন পরিবারকে পুনর্বাসন করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

প্রকল্পের বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন পদ্ধতি প্রসঙ্গে হামিদুল হক বলেন, উপজেলা টাস্কফোর্স কমিটি খাসজমি শনাক্ত করে প্রকল্প প্রস্তাব পাঠায়। প্রকল্প অফিস সেটি সরেজমিন যাচাইয়ের পর সশস্ত্র বাহিনীর কাছে ব্যারাক নির্মাণের জন্য অগ্রিম টাকা দেয়। টাকা দেয়ার ৪৫ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে ব্যারাক নির্মাণের কাজ শেষ হয়। এরপর সুবিধাভোগী পরিবার বাছাই করা হয়। তিনি জানান, সুবিধাভোগী পরিবার বাছাইয়ের ক্ষেত্রে মুক্তিযোদ্ধা, বিধবা, স্বামী পরিত্যক্তা নারীসহ ভূমিহীন বা গৃহহীন পরিবারকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়।

উল্লেখ্য, আশ্রয়ণ প্রকল্পে সুবিধাভোগী প্রত্যেক পরিবার থেকে অন্তত দু'জন সদস্যকে ৭ দিনের উপার্জনমূলক কুটির শিল্প, মৎস্য চাষ, নার্সারি, হস্তশিল্প, সেলাই, পোশাক শিল্প বা দর্জির কাজের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। প্রশিক্ষণকালীন প্রত্যেক সদস্য দৈনিক ২০০ টাকা করে ভাতা পান। ২০১০ সাল থেকে এখন পর্যন্ত ২৪০টি প্রকল্পে ২৫ হাজার ২৪০টি পরিবারকে ৯ কোটি ২২ লাখ টাকা ব্যয়ে পেশাভিত্তিক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।

এর পাশাপাশি এই প্রকল্পের আওতায় ৩ লাখ ৬৪ হাজার ৩২৭টি বৃক্ষ রোপণ, ৬৯০টি প্রকল্প এলাকায় বিদ্যুৎ সংযোগ দেয়া হয়েছে।

'যার জমি আছে ঘর নাই' কর্মসূচির আওতায় পুনর্বাসিত ১৫ হাজার ১৪২টি পরিবারের মধ্যে ৩ হাজার ৭১০টি সেমি-পাকা এবং অবশিষ্টগুলো টিনের ঘর তৈরি করে দেয়া হয়েছে। নীলফামারী জেলার কিশোরগঞ্জ উপজেলায় ৬৯১ জন ভিক্ষুককে পুনর্বাসন করা হয়েছে।

প্রকল্প গ্রামগুলোর জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, মা ও শিশুর স্বাস্থ্য পরিচর্যা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে পরিবার পরিকল্পনা বিভাগ পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম পরিচালনা করছে। বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার আওতায় স্কুলগামী সব শিশুর স্কুলে যাওয়া নিশ্চত করা হচ্ছে।

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও সুস্বাস্থ্য নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে প্রকল্প এলাকাগুলোতে স্যানিটারি ল্যাট্রিন ও গোসলখানা নির্মাণ করা হয়েছে। হামিদুল হক বলেন, প্রকল্পের সব সুবিধাভোগীর জন্য শতভাগ স্যানিটেশন নিশ্চিত করার পাশাপাশি সুপেয় পানির জন্য গভীর ও অগভীর নলকূপ স্থাপন করা হয়েছে। এ ছাড়া প্রকল্প এলাকায় রাস্তাঘাট করে দেয়া হচ্ছে।

চলমান প্রকল্পের সাফল্যের উদাহরণ দিয়ে এই কর্মকর্তা বলেন, আশ্রয়ণ প্রকল্পে পুনর্বাসিত সুবিধাভোগীরা আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে স্বাবলম্বী হয়েছেন। যেসব ভিক্ষুক এই প্রকল্পের সহায়তা পেয়েছেন তারা এখন নিজের ভাগ্য পরিবর্তন করে নিজেদের সম্মানজনক পেশায় প্রতিষ্ঠিত করছেন।

প্রতিবেদন : রাশেদুল ইসলাম

## Ashrayan project makes landless families self-reliant

Latifa Akhter, 40, wife of a rickshaw-puller Sabuj Mian, has become self-reliant by running a small-scaled poultry farm at her home.

Latifa, a resident of Halidagachhi Charghat upazila of the Rajshahi district, started her poultry farm in 2015 under the Ashrayan Project.

At the preliminary stage, Latifa, mother of two daughters and a son, received training from the Local Service Providers (LSPs) on chick rearing, its proper feeding, vaccination and marketing.

In 2017, she earned Taka 3,500 so far selling eggs and chickens. She told the BSS that both the demand and prices of native variety of chick are higher than that of others at markets.

As a part of 25-member of Halidagachhi Micro and Small Enterprise (MSE), she gets some privileges of poultry rearing and its marketing. Her elder daughter Sazima Akhter, a student of class nine at Zafarpur Secondary Girls School, gets all educational expenses from her mother's earning.

Like Latifa, members of 280 landless families are now living better life for implementation of the government's Ashrayan Project.

"Once we lived under a shed on the roadside in Baganpara area. Now, we have got a permanent house to live," said Alima Begum, 45, another housewife. Her eyes were filled with tears when she was recalling her earlier hardships.

Prime Minister Sheikh Hasina launched the 'Halidagachhi Ashrayan Project II' on February 8, 2014, which has already become popular among landless people of the upazila.

Monwar Hossain, 38, a farmer of Jhikra Thakurjhi Ashrayan Project in Bagmara Upazila, said he along with other marginal people are farming fish and vegetables on cooperative basis.

Hossain said there are four ponds in the project where different varities of fishes are cultivated under cooperative system. The poor and destitute people are happy getting shelter there, he added.

Zakia Begum, a housewife in the same area, said they have vegetables and poultry farms around their houses.

She said pure drinking water is also made available for 50 households in the project area.

Jahanara Begum, another housewife, said she and her family members used to live on the bank of a river before getting settler in the project area.

“Now, the government has given us a shelter. We are cultivating vegetables as well as rearing poultry. Our children can continue their studies at home without any hassle as electricity available here.”

“May Allah bless Prime Minister Sheikh Hasina and her government,” she said in an emotion-chocked voice.

Chairman of Bagmara Upazila Parishad Jakirul Islam Santu said the genuine landless, ultra poor and shelterless people have got accommodation facilities under the project.

Additional Deputy Commissioner (general) Md Salahuddin said a total of 21 Ashryan Projects have been implemented at nine upazilas sheltering 1,032 families.

He said the Ashrayan Project has not only given shelters to the poor families, but also created opportunities for self-employment besides providing health services, sanitation, drinking water and education for children.

Report: Aynal Haque

## Ashrayan project changes life of landless in Khulna

Members of 260 landless families in different villages of the country's southern district Khulna are now dreaming of a better life with support of the government's Ashrayan Project.

"We used to live under a shed on a roadside tree in Katakhali area. Now we have got a permanent place to live," said Josna Begum, 40, who lives at a shelter centre at Vanderpara of Dumuria upazila. Eariler she and her husband, a rickshaw van puller, had little to have a roof upon their heads.

However, the Ashrayan Project, one of the ten special initiatives of Prime Minister Sheikh Hasina, changed their live. Launched in 1997 after a catastrophic cyclone that submerged Saint Martin Island, the project has now become an effective housing for the landless people.

Md. Billal Hossain, 35, a farmer and another inhabitant of the shelter centre, said he and many others are farming fish and vegetables on cooperative basis and started sending their kids to nearby Vandarpara (Ashrayan Project) government primary school. He said there are four ponds in the project where fishes are cultivated under cooperatives system. The poor and destitute people are now happy getting shelter there, he added.

He, however, urged the authorities concerned to carry out repairing works of the houses on time to avoid damages especially during the rainy seasons.

Zakia Begum, 35, has been living here for 13 years. She grows vegetables and run poultry farm around her houses for income generation.

Elderly Shukzan Bibi, who lives with her three son and daughters, said they earlier lived on the bank of a river in a hardship.

"Now, the government has given us a shelter. We are growing vegetables and running poultry farm. There is no problem for study of my children as electricity is available here. May Allah bless Prime Minister Sheikh Hasina and her government," she said.

Sirazul Islam, Headmaster of Vanderpara Primary School, said real landless, ultra poor and shelter-less people have got refuge under the project.

"Repairing and maintenance of the houses are now necessary as the shelter centres were built 13 years ago," he said.

Khulna Deputy Commissioner Md. Amin Ul Ahsan said, a total of 41 shelter centres have been constructed in nine upazilas of the district where 30,312 families were rehabilitated.

Report : S M Zahid Hossain

## 150 families rebuild future under Asrayan Project

Some 150 homeless families have rebuilt their future through various income generating activities at two 'Asrayan' projects in Sadar union of Gangachara upazila in Rangpur district. Before rehabilitation most of the families were shelter-less and struggling for food after losing their land to river erosion.

"Fifty homeless families were rehabilitated at 'Chengmari Asrayan Phase-2 Prokalpo' in 2010 and another 100 floating families at 'Chengmari Asrayan-2 Prokalpo' in 2012," said Gangachhara Upazila Cooperatives Officer Masud Rana.

Later, the local government department provided them with necessary trainings, inputs and supports while Upazila Cooperative Office disbursed revolving interest-free loans for income generating activities.

Noor Mohammad, 42, and his wife Laila Khatun, 35, at 'Chengmari Asrayan-2 Prokalpo' shared their experience of struggle with this correspondent that they came through in the past 16 years before rehabilitation in 2012.

"I became homeless around 27 years ago after losing my paternal home to the erosion of the Brahmaputra," said Mohammad, adding that his parental home was at village Hatia under Ulipur upazila.

Mohammad came to Gangachhara in search of job, started living on the land of others in Chengmari village and got married to a local girl Laila Khatun there.

He said his family along with the family of his sister-in-law Shefali Begum (50), a widow, her daughter Batashi Begum

(30) and her husband, were rehabilitated at 'Chengmari Asrayan-2 Prokalpo' in 2012.

"After getting trainings, I first got Taka 5,000 and my sister-in-law and her daughter got Taka 10,000 each as revolving loans to launch income generating activities under supervision of Upazila Cooperative Office," Mohammad said.

Besides, Abdul Latif, 35, husband of Batashi, starts working at a hotel to earn Taka 350 a day and Naymul Islam, 24, son of Noor Mohammad begins working as a mason to earn Taka 550 a day to build a good saving together.

"With the saving, we purchased two goats, one bull and opened a grocery shop," said Laila Khatun, adding that they sold the goats at Taka 10,000 and bull at Taka 45,000 after two years.

By this time, Noor Mohammad started driving an auto rickshaw to earn more while Shefali and Batashi got Taka 14,000 each after repaying first loans and again got Taka 16,000 each last year after repaying second loans.

"We have taken lease of 55 decimals of farm land at Taka three lakh and are cultivating three crops a year there to earn Taka one lakh," said Batashi.

"We have also purchased three bulls for Taka 75,000 and will sell those before next Eid-ul-Azha at about Taka 1.50 lakh," Batashi said.

"We now own assets worth Taka seven lakh to lead a happy life with family members and children who go to schools regularly," said a happier Mohammad.

Talking to BSS at nearby ‘Chengmari Asrayan Phase-2 Prokalpo’, Nur Saheb, 38, and his wife Lucky Begum, 32, narrated their success story of winning over poverty since their rehabilitation there in 2010.

“After getting training on income generation activities, Upazila Cooperative Office provided us with Taka 6,000 first loan in 2012 when we started cultivating crops as sharecroppers,” said Nur Saheb.

After repaying first loan, the family again got Taka 8,000 in 2014, purchased a bull, sold the same at Taka 24,000 in 2016, paid the second loan and again got Taka 18,000 loan last year.

“We have again purchased two bulls, taken lease of 12 decimals of cultivable land at Taka 24,000 and opened a grocery shop,” said Lucky adding that they now own assets worth Taka three lakh.

“Our elder daughter Nasrin studies in class six, only son Russel in class three and younger daughter Nushrat in class one at local schools,” said Lucky, now a happy housewife.

Gangachhara Sadar Union Chairman Al Suman Abdullah said ‘Asrayan Prokalpo’ has been effectively changing fortune since its launching.

Report: Mamun Islam

## Shelter home people want more support

Less than 50 kilometres away from the capital city Dhaka and near the Bhawal National Park, a small neighbourhood known as Pratashya, has become a home for many differently able people. The place is connected with Dhaka-bound highway by a narrow paved road that goes through the most common flora of the unique sal forest of the national park.

The government under its shelter project developed the locality in January 2000 to provide a decent and safe accommodation to 54 families. Each of the families included at least one person who had been suffering from leprosy for years.

The members of the families did not have any other option than bagging for living while they used to live on streets in different areas of the capital city, including Kamalapur Railway Station and National Orthopaedic Hospital in Agargaon. Some of them also lived in different slums in Dhaka.

In an attempt to freeing the ultra poor people from begging by rehabilitating them in a suitable place where they could earn a decent living, the government initially brought 54 families and later 16 more to the place that eventually named as Pratashya (The Hope). Currently, around 375 members of 70 families live in this shelter home, which is situated in village Bandabari of Kaliakair upazila.

"I along with my family members used to live in a slum near Kamalapur Railway Station when begging was the only means for living," said Md Matiur Rahman. Years ago he migrated to the capital city from a village of Lalmonirhat district in search of a job. Finally he ended up in the shelter home where his family members got some jobs for earning. Rahman is unable to work as he lost all of the fingers of his two hands to prolonged leprosy. He, however, became happy after getting a shelter in Pratashya.

Like Matiur, many of the people who had been suffering from leprosy for long were cured after getting proper treatment at the shelter, said Hafizur Rahman, a resident of Pratashya.

Initially each of the families of the rehabilitees in Pratashya was given eight decimal of land and Taka 10,000 in cash. The support was good enough to start rebuilding their life. But they had to go through a tough time when the BNP-led government stopped all support to them. Some of the rehabilitees returned to the capital city for living on begging. The situation started improving again with the Awami League-led government resuming basic support to the families of the shelter home.

“We still need more support to be self-reliant,” said Rahman when many of the residents there echoed his voice.

Kaliakair Upazila Nirbahi Officer Sanwar Hossain also shared the same view saying that the people of the shelter home would get far better life if they can get enough fund for fishing and cropping.

He said there is a big pond inside the home, which is now too shallow for fish farming. The upazila authorities, however, allocated a small fund for dredging the pond for fisheries. Some of the residents of Pratashya said that most of the families regularly send their children to schools when some others are getting training on making handicrafts. They urged for setting up a candle factory there, which would create jobs for some of the trained persons.

“We have already provided many of the necessary supports to the rehabilitees of the shelter home,” said Liberation War Affairs Minister AKM Mozammel Haque. He is the parliament member, elected from this area. The minister said there were some problems in handing over the lands to some families. The problem would also be solved soon.

Report : Ataur Rahman, Translation : A Z M Sajjad Hossain Sabuj

## 1.60 lakh homeless families rehabilitated in Ashrayan project

The government as part of its special initiatives to provide housing facilities to all homeless people has so far rehabilitated 1.60 lakh homeless families across the country through its major social safety initiative -Ashrayan Project.

Along with providing housing facilities, the government so far has provided Taka 32.52 crore credit to 21,745 families so that they could engage themselves in different income-generating activities to be self-reliant.

"The government is not only providing housing facilities to the beneficiaries under the programme, it also providing them with necessary trainings on different income-generating activities to make them economically self-reliant," said Deputy Project Director of Ashrayan Project SM Hamidul Haque.

Haque said each of the families was given Taka 30,000 collateral-free loan so that they could engage themselves in various income generating activities to come out of abject poverty.

Giving details, he said the main objective of the project is to make the homeless, landless and shelterless poor capable of running their own income-generating initiatives with getting interest-free loan and training on various trades.

He said Prime Minister Sheikh Hasina's dream 'Ashrayan Project' has been playing a crucial role in poverty reduction besides rehabilitating the homeless people.

The project began in 1997 when the then Prime Minister Sheikh Hasina directed the authorities concerned to take immediate steps to rehabilitate the cyclone-affected people in Cox's Bazar and its adjoining districts.

A large number of people became homeless when a devastating cyclone hit the country's prime beach resort town and other parts of the coastal belt on May 19, 1997. Hamidul Haque said a total of 1.60 lakh families have been rehabilitated under 1881 projects in three phases in rural areas. Among those, 1,44,120 families have been rehabilitated in different Barac houses in 1837 villages across the country.

Besides, 15,142 families were rehabilitated in their own land by constructing houses when 691 beggar families were given shelter in different shelter centres. Apart from these, 58 different categories of houses were set up in Chittagong hill tract areas for the same purpose.

Haque said the government as part of its plan to bring all homeless and landless people under the project, has decided to rehabilitate over 2.50 lakh homeless people under the project by 2019 through its own resources.

Regarding implementation of the project, he said the Upazila Taskforce Committee identifies the 'Khas land" and later sends a proposal to the project office. The project office scrutinizes the proposal for construction of Barack houses for the project.

Bangladesh armed forces division is provided fund for construction of the Barack houses those are distributed among the beneficiaries. Freedom fighters, widows and wives deserted by their husbands, landless women and homeless peoples are given priority in getting support from this project.

Under the project, at least two persons of a family are given a week-long training on small industries, fisheries, nursery, handicrafts, garment industry and tailoring. Each of the participants is provided a daily allowance of Taka 200 during the training period. Since 2010, a total of 25,240 families had been provided training under 240 projects, spending Taka 9.22 crore. Besides, so far nearly 3.65 lakh saplings were planted while 690 villages were brought under electricity coverage under the projects.

The family planning department has been conducting family planning activities aimed at controlling population and ensuring child and maternal health in the project areas.

Hamidul Haque said hundred per cent sanitation facilities along with supply of pure drinking water have been ensured for all beneficiaries in the project areas. Apart from this, roads have been constructed there for ensuring better communication.

He said many beneficiaries living in Ashrayan Project across the country have become economically self-reliant through self employment.

Many beggars, who were taken shelter in different centres, have also changed their fate by engaging themselves in various activities which made them dignified citizens.

Report : Rashedul Islam, Translation : Aminul Islam Mirja

বিশেষ উদ্যোগ ৩

# ডিজিটাল বাংলাদেশ

"শেখ হাসিনার উপহার, ডিজিটাল সরকার"

## ডিজিটাল বাংলাদেশ

আইসিটি খাতে অগ্রগতি অব্যাহত রাখতে বাজেটে দিক নির্দেশনা ৫৯
ইন্টারনেট ব্যবহারে বাংলাদেশ সার্কভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে এগিয়ে ৬১
গুরুত্বপূর্ণ ও চাঞ্চল্যকর মামলার তদন্ত করছে সাইবার কেন্দ্র ৬৩
প্রায় আড়াই লাখ অপরাধীর ডিজিটাল ডাটাবেজ তৈরি করেছে র‍্যাব ৬৫
দুর্নীতি প্রতিরোধে ডিজিটাল মনিটরিং সফটওয়্যার তৈরি করছে দুদক ৬৭
Govt outlines strategy for steady progress in ICT sector 68
Bangladesh leads major SAARC nations in internet access 71
Cyber centre probing sensational cases 73
RAB prepares digital database of 2.53 lakh criminals 75
ACC developing software to check institutional graft 78

১২ ডিসেম্বর, ২০০৮ বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ তাদের নির্বাচনী ইশতেহারে ঘোষণা করে যে, ২০২১ সালে স্বাধীনতার ৫০ বছরে বাংলাদেশ 'ডিজিটাল বাংলাদেশে' পরিণত হবে। এরই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ সরকার ডিজিটাল বাংলাদেশ নির্মাণে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করে।

## ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে স্তরে স্তরে অনুন্নত জীবনধারাকে বদলে বাংলাদেশের সমাজকে জ্ঞানভিত্তিক সমাজে রূপান্তর করা।
- দেশের মানুষের জীবনযাপন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ব্যবস্থাপনা, কর্মপদ্ধতি, শিল্প-বাণিজ্য ও উৎপাদন, অর্থনীতি, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনধারা ডিজিটাল পদ্ধতিতে পরিচালনা করা।
- ডিজিটাল টুলস ব্যবহার করে জনগণের উন্নত জীবনযাপনের স্বপ্ন বাস্তবায়ন, মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ এবং সাংবিধানিক অধিকার রক্ষার নিশ্চয়তা দেয়া।

- রাষ্ট্রের প্রত্যেক নাগরিকের কাছে এই প্রযুক্তি সহজলভ্য ও সুলভ করা। যাতে দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠী ডিজিটাল প্রযুক্তিকর্মী হিসেবে গড়ে উঠতে পারে।

## ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নে গৃহীত কর্মসূচি

- সরকারের কাজ করার পদ্ধতি ডিজিটাল করা;
- জনগণের দোরগোড়ায় সেবা পৌঁছানো;
- ডিজিটাল ভূমি ব্যবস্থা ;
- বিচার ব্যবস্থাকে ডিজিটাল করা;
- ডিজিটাল স্বাস্থ্য ব্যবস্থা;
- ডিজিটাল নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা;
- শিক্ষা ব্যবস্থাকে ডিজিটাল করা;
- কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য ব্যবস্থার ডিজিটাল রূপান্তর;
- যোগাযোগ ব্যবস্থায় ডিজিটাল পদ্ধতির প্রচলন করা; এবং
- তথ্যের অবাধ চলাচলের জন্য ডিজিটাল ব্যবস্থা গ্রহণ করা ইত্যাদি।

## অর্জন

- ৪ হাজার ৫৫৪টি ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার, ৩৮৮টি উপজেলা ডিজিটাল সেন্টার, ৬১ টি জেলা ডিজিটাল সেন্টার, ৩২৫ টি পৌর ডিজিটাল সেন্টার ও ৪০৭টি নগর ডিজিটাল সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। এ সব তথ্য সেবাকেন্দ্র থেকে অনলাইনে ১১৬ ধরনের সেবা দেয়া হচ্ছে।
- সারাদেশে স্থাপিত ডিজিটাল সেন্টারের মাধ্যমে রুরাল ই-কর্মাস কার্যক্রম শুরু হয়েছে।
- ডিজিটাল প্রযুক্তির বিকাশের ফলে বর্তমানে দেশে মোবাইল গ্রাহকের সংখ্যা প্রায় ১৩ কোটি এবং ইন্টারনেট গ্রাহকের সংখ্যা প্রায় ৭ কোটি।
- ৪৩ হাজার অফিস ও ২৫ হাজার ওয়েবসাইট নিয়ে বিশ্বের বৃহত্তম ওয়েব পোর্টাল 'জাতীয় তথ্য বাতায়ন' চালু হয়েছে।

- জীবন-জীবিকাভিত্তিক তথ্য এক জায়গা থেকে খুঁজে পেতে বাংলা ভাষায় জাতীয় ই-তথ্যকোষ চালু হয়েছে।
- ২৩ হাজার ৫০০ টি মাধ্যমিক, ৫ হাজার ৫০০টি মাদ্রাসা ও ১৫ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম স্থাপিত হয়েছে।
- প্রথম শ্রেণি থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত সব পাঠ্যপুস্তক অনলাইনে প্রাপ্তির জন্য ই-বুক প্লাটফর্ম তৈরি করা হয়েছে।
- ওয়েবসাইট ও এসএমএস-এর মাধ্যমে পাবলিক পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ ও ভর্তি প্রক্রিয়া চালু হয়েছে।
- দেশের সব ভূমি রেকর্ডকে (খতিয়ান) ডিজিটাল করার উদ্দেশ্যে প্রায় ১০০ কোটি টাকার 'ডিজিটাল ল্যান্ড রেকর্ডরুম সার্ভিস' শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।
- ১ হাজার ৩৫৫টি সরকারি অফিসে ই-ফাইলিং চালু হয়েছে।
- ই-পেমেন্ট ও অনলাইন ব্যাংকিং চালু করা হয়েছে।
- বাংলাদেশ ডাক বিভাগ ইলেকট্রনিক মানি ট্রান্সফার সার্ভিস (ইএমটিএস)-এর মাধ্যমে জুন ২০১৭ পর্যন্ত ৭ হাজার ১২৫ কোটি টাকা প্রেরণ করেছে।
- পোস্টাল ক্যাশ কার্ডের মাধ্যমে টাকা জমা, উত্তোলন ও ট্রান্সফারসহ নির্দিষ্ট আউটলেট থেকে কেনাকাটা সম্ভব হচ্ছে।
- ডিজিটাল স্বাস্থ্যসেবা, টেলিমেডিসিনের মাধ্যমে একজন নাগরিক বিনামূল্যে এবং সহজে স্বাস্থ্য বিষয়ক পরামর্শ নিতে পারছেন।
- বাংলাদেশ রেলওয়ে অনলাইন ও মোবাইল টিকিটিং সেবা চালু করেছে।
- ডিজিটাল কার্যক্রমের আওতায় নাগরিক পরিসেবার বিল পরিশোধ, ই-টিন গ্রহণ ও অনলাইন ট্যাক্স প্রদান সম্ভব হয়েছে।
- ডিজিটাল মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে মামলা নিষ্পত্তি করা হচ্ছে।
- হজ্ব ব্যবস্থাপনাকে আরো কার্যকর, সহজ এবং সুশৃঙ্খল করার লক্ষ্যে অনলাইন হজ্ব ব্যবস্থাপনা চালু করা হয়েছে।

- ২০১৬-১৭ অর্থবছর পর্যন্ত ৯৫% জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন সম্পন্ন হয়েছে।
- কৃষি সম্পর্কিত সর্বাধুনিক প্রযুক্তি, সেবা ও তথ্য সবার মাঝে ছড়িয়ে দেয়ার লক্ষ্যে কৃষি কল সেন্টার চালু করা হয়েছে।
- সব সেবা ফরম এক ঠিকানায় প্রাপ্তির লক্ষ্যে 'ফর্মস বাতায়ন' চালু করা হয়েছে।
- আইটি সেক্টর গত ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ৪০০ মিলিয়ন ডলার বৈদেশিক মুদ্রা আয় হয়েছে। ২০১০ সাল থেকে প্রতিবছর সব শ্রেণি ও পেশার মানুষকে ই-সেবার সঙ্গে পরিচিত করানোর লক্ষ্যে ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলা অনুষ্ঠিত হচ্ছে।
- তথ্যপ্রযুক্তি খাতে বিশেষ অবদানের জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০১৫ সালের 'আইসিটি টেকসই উন্নয়ন পুরস্কার' অর্জন করেন।

## ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

- আইসিটি খাতে গবেষণা ও উন্নয়ন ব্যয় জিডিপির ০.৬ শতাংশ থেকে ১ শতাংশে উন্নীতকরণ।
- ২০১৮ সালের মধ্যে আইসিটি খাত থেকে বৈদেশিক আয়ের লক্ষ্যমাত্রা ১ বিলিয়ন ডলার নির্ধারণ করা হয়েছে।
- ব্রডব্যান্ড কভারেজ ৩০ শতাংশ থেকে ৩৫ শতাংশে উন্নীতকরণ।
- ইউনিয়ন, উপজেলা, জেলা, পৌর ও নগর পর্যায়ে আরো ডিজিটাল সেন্টার স্থাপন করা এবং সেবার পরিধি সম্প্রসারণ করা।
- প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কম্পিউটার ল্যাবের সংখ্যা আরো বাড়ানো।
- এলজিইডিসহ দেশের সব সিটি কর্পোরেশন, উপজেলা পরিষদ ও পৌরসভায় ১০০% ই-জিপি বাস্তবায়ন করা।
- ২০১৯-২০ সময়ের মধ্যে ১০০% জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন সম্পন্ন করা।

ছবি ও তথ্য : চলচিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর

## আইসিটি খাতে অগ্রগতি অব্যাহত রাখতে বাজেটে দিক নির্দেশনা

ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্য অর্জনে দেশের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) খাতে অগ্রগতি অব্যাহত রাখতে এবারের জাতীয় বাজেটে একটি সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

জাতীয় সংসদে গত ১ জুন ২০১৭ অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত উপস্থাপিত ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের বাজেটে আর্থিক বরাদ্দ এবং নীতিমালার বিষয়ে আইসিটি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক বলেন, এই বাজেট হচ্ছে আইসিটি খাতে অগ্রগতি বজায় রাখার লক্ষ্যে একটি দিক নির্দেশনা।

বাজেটে অর্থ বরাদ্দ বৃদ্ধির কথা উল্লেখ করে আইসিটি প্রতিমন্ত্রী বলেন, এতে স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় যে, ডিজিটাল বাংলাদেশ অর্জনে বর্তমান সরকারের আন্তরিক প্রচেষ্টা রয়েছে।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের জন্য ২০১৭-১৮ অর্থবছর বরাদ্দ হচ্ছে ৩ হাজার ৯৭৪ কোটি টাকা, যা ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেটের চেয়ে ২ হাজার ১৫৫ কোটি টাকা বেশি।

আবুল মাল আবদুল মুহিত তার বাজেট বক্তৃতায় বেসরকারি খাতে আইসিটি সম্প্রসারণের কথা উল্লেখ করে বলেছেন, সরকার বিভিন্ন এলাকায় বেসরকারি খাতে অটোমেশন এবং ই-জিপি প্রক্রিয়া এগিয়ে নিতে উৎসাহ দিচ্ছে।

তিনি বলেন, ‘আইসিটির সেবার মাধ্যমে সরকারি অফিসগুলোতে বিভিন্ন উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়িত হচ্ছে।’

আইসিটি সম্পর্কিত প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো স্থাপন এবং নীতি সংস্কার বাস্তবায়নে সরকার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। অর্থমন্ত্রী বলেন, দেশের বিভিন্ন স্থানে আইসিটি পার্ক স্থাপন করা হবে এবং এতে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণ করা হবে।

বাজেট বক্তৃতায় মুহিত ডিজিটাইজেশন প্রক্রিয়া দ্রুততর করার ক্ষেত্রে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগের তালিকাও তুলে ধরেন। সরকার মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ২৩ হাজার ৩৩১টি এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১৫ হাজারটি শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব এবং মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম প্রতিষ্ঠা করেছে।

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ৬৪ জন ডেপুটি কমিশনারের অফিস এবং সাত বিভাগীয় কমিশনারের অফিসসহ ২০টি মন্ত্রণালয় ও বিভাগে ইতোমধ্যে ই-ফাইলিং সিস্টেম চালু করা হয়েছে।

এর পাশাপাশি প্রায় ১৮ হাজার ৫০০ সরকারি অফিসকে একটি একক নেটওয়ার্কের আওতায় আনা হয়েছে। সাবমেরিন ক্যাবলের বিদ্যমান ক্ষমতা ৪৪ (গিগাবাইট পার সেকেন্ডে) জিবিপিএস থেকে বাড়িয়ে ২০০ জিবিপিএস করা হয়েছে।

২০১৭ সালের এপ্রিল মাসের হিসাব অনুযায়ী দেশে মোবাইল টেলিফোন গ্রাহকদের সংখ্যা বেড়ে প্রায় ১৩.৩১ কোটি এবং ইন্টারনেট গ্রাহকের সংখ্যা বেড়ে ৭ কোটিতে দাঁড়িয়েছে।

মাধ্যমিক স্তরে, উপজেলা আইসিটি ট্রেনিং এবং রিসোর্স সেন্টার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং ৩১৫টি উপজেলায় কোনো সরকারি স্কুল না থাকায় ২৯৫ টি বেসরকারি স্কুল মডেল স্কুলে রূপান্তরিত হয়েছে।

৩ হাজার ৫৫০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার ল্যাব এবং ২৩ হাজার ৩৩১টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

তথ্য, যোগাযোগ ও প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক বাসসকে বলেন, আইসিটি খাতে বিনিয়োগ উৎসাহিত করার লক্ষ্যে এই খাত সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন উপকরণের ওপর ভ্যাটের হার হ্রাস করা হয়েছে।

এ খাতের উন্নয়নের জন্য বাধা অপসারণের লক্ষ্যে ৯৪ ধরনের কাঁচামাল ও যন্ত্রাংশের ওপর ভ্যাট হার হ্রাস করা হয়েছে। এ ছাড়াও এই খাতের জন্য ৩০ শে জুন, ২০১৯ পর্যন্ত স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত পণ্যের ওপর ভ্যাট ছাড় দেয়া হয়েছে।

আইসিটি প্রতিমন্ত্রী আশা প্রকাশ করেন যে, এই বাজেট দেশের প্রযুক্তিগত পণ্যের স্থানীয় চাহিদা পূরণে সহায়ক হবে।

প্রতিবেদন : মাহমুদুল হাসান রাজু, অনুবাদ : রুহুল গণি জ্যোতি

## ইন্টারনেট ব্যবহারে বাংলাদেশ সার্কভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে এগিয়ে

ইন্টারনেট ব্যবহারের দিক থেকে বাংলাদেশ সার্কভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে অনেক এগিয়ে রয়েছে এবং বর্তমানে দেশের ৪২ শতাংশ মানুষ বিভিন্ন কাজে ইন্টারনেট সংযোগ ব্যবহার করছে।

বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন রেগুলেটরি কমিশনের তথ্য মতে, এশিয়ার অনেক প্রভাবশালী দেশকে পেছনে ফেলে ২০১৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বাংলাদেশের মোট ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা দাঁড়ায় ৬৭.২৪৫ মিলিয়ন, যা দেশের মোট জনসংখ্যার ৪১.৫২ শতাংশ।

প্রাপ্ত তথ্য মতে, প্রতিবেশী দেশ ভারতে মোট ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যে ৪৬ কোটি, যা ওই দেশের মোট জনসংখ্যার ৩৪.৮৩ শতাংশ। শ্রীলঙ্কায় ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা ৬০.৮৭ লাখ, যা মোট জনসংখার ২৯.৩০ শতাংশ এবং পাকিস্তানে মোট জনসংখ্যার ১৭.৮১ শতাংশ মানুষ ইন্টারনেট ব্যবহার করে থাকে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সময়োপযোগী বিশেষ সিদ্ধান্ত গ্রহণের ফলে গত নয় বছরে দেশে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর হার ২.৬৭ শতাংশ থেকে ৪১.৫২ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। ২০০৮ সালে দেশে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর হার ছিল ২.৬৭ শতাংশ, যা ২০১৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে দাঁড়ায় ৪১.৫২ শতাংশ।

সূত্র জানায়, এ বছরও সরকার তথ্য, যোগাযোগ ও প্রযুক্তি খাতকে বিশেষ অগ্রাধিকার দিচ্ছে। অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত ২০১৭-২০১৮ অর্থ-বছরের প্রস্তাবিত বাজেটে ৩ হাজার ৯৭৪ কোটি টাকা তথ্য, যোগাযোগ ও প্রযুক্তি বিভাগের জন্য বরাদ্দ দেয়ার প্রস্তাব করেছেন। যা ২০১৬-১৭ অর্থ-বছরের সংশোধিত বাজেটের তুলনায় ২ হাজার ১৫৫ কোটি টাকা বেশি।

ইতোমধ্যে স্বল্প মূল্যে দ্রুতগতি সম্পন্ন ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সংযোগের মাধ্যমে সব সরকারি অফিস, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং ইউনিয়ন পরিষদসহ সারাদেশকে শতভাগ থ্রি-জি নেটওয়ার্কের আওতায় আনতে ও ২০২০ সালের মধ্যে ফোর-জি চালু করতে সরকার ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

তথ্য, যোগাযোগ ও প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক বলেন, ‘আমরা সব উপজেলাকে ফাইবার অপটিক কেবলের আওতায় নিয়ে এসেছি। দেশের সব ইউনিয়নকে ফাইবার অপটিক কেবলের আওতায় নিয়ে আসতে ইনফো সরকার-৩ শীর্ষক প্রকল্প চলমান রয়েছে’।

তিনি আরো বলেন, ‘প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরকারের অব্যাহত নীতি সহায়তা এবং ডিজিটাল ডিভিডেন্ডের সুযোগকে কাজে লাগিয়ে ২০২১ সালের মধ্যে এ খাত থেকে রফতানি আয় ৫ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত করতে এবং ২০ লাখ কর্মসংস্থান তৈরির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে’।

তথ্যপ্রযুক্তি খাতের ক্রমাগত বিকাশের মাধ্যমেই বাংলাদেশ ২০২১ সালের মধ্যে উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উচ্চ আয়ের দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠা পাবে বলেও তিনি আশা প্রকাশ করেন।

প্রতিবেদক : মাহমুদুল হাসান রাজু, অনুবাদ : সৈয়দ এলতেফাত হোসেইন

## গুরুত্বপূর্ণ ও চাঞ্চল্যকর মামলার তদন্ত করছে সাইবার কেন্দ্র

অপরাধ তদন্তে গতিশীলতা ও গুরুত্বপূর্ণ অপরাধ মামলাগুলোর তদন্ত কাজের দীর্ঘসূত্রতা কমিয়ে আনতে দেশের প্রথম সাইবার তদন্ত কেন্দ্র বর্তমানে বিভিন্ন চাঞ্চল্যকর ও গুরুত্বপূর্ণ মামলাগুলোর তদন্ত করছে।

সরকারি সূত্রমতে, হলি আর্টিজান রেস্টুরেন্টে সন্ত্রাসী হামলা, বনানী হোটেলে দুই তরুণী ধর্ষণ এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ চুরির ঘটনার মামলাসহ তদন্ত কেন্দ্রটি প্রায় হাজারখানেক গুরুত্বপূর্ণ মামলার ফরেনসিক পরীক্ষা ও তদন্ত কাজ শেষ করেছে।

অপরাধ তদন্ত বিভাগের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ও ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাব এবং সাইবার পুলিশ ব্যুরো প্রধান মো. জালাল উদ্দিন ফাহিম বলেন, ‘২০১৩ সালে সাইবার তদন্ত কেন্দ্রটি চালুর পর থেকে এখন পর্যন্ত আমরা ১ হাজার ১২০টি মামলার মধ্যে ৯৫০টি মামলার ফরেনসিক পরীক্ষা ও তদন্ত কাজ শেষ করেছি।’

তিনি আরো বলেন, ‘ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করে সংঘটিত ২৫ টি জঙ্গি সংক্রান্ত অপরাধের মামলাসহ সব গুরুত্বপূর্ণ মামলার তদন্ত ও ফরেনসিক পরীক্ষা করার জন্য মামলাগুলো আমাদের কাছে পাঠানো হয়েছে।’

জালাল উদ্দিন বলেন, তদন্ত কেন্দ্রটি ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করে সংঘটিত অপরাধের মতো প্রায় ১ লাখেরও বেশি মামলার কাজ পরিচালনা করেছে। এর মধ্যে দ্রুত ব্যবস্থা নেয়ার জন্য অনেক মামলা বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন রেগুলেটরি কমিশনে (বিটিআরসি) স্থানান্তরিত করা হয়েছে।

প্রকল্প পরিচালক ও অপরাধ তদন্ত বিভাগের ঢাকা মহানগরী উত্তরের পুলিশ সুপার রেজাউল হাওলাদার বাসসকে বলেন, আওয়ামী লীগ সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার নির্বাচনী অঙ্গীকারের অংশ হিসেবে রাজধানীতে দেশের প্রথম ’সাইবার অপরাধ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র’ ও ’সাইবার অপরাধ তদন্ত কেন্দ্র’ স্থাপন করা হয়।

তিনি আরো বলেন, ‘বাংলাদেশ পুলিশের সাইবার তদন্ত সক্ষমতা বৃদ্ধি’ প্রকল্পের অধীনে দুটি কেন্দ্র স্থাপনে খরচ হয়েছে মোট ৩ দশমিক ৫ মিলিয়ন

মার্কিন ডলার বা প্রায় ২৮ কোটি টাকা। এর মধ্যে বাংলাদেশ সরকার দিয়েছে সাড়ে ৪ কোটি টাকা এবং খরচের বাকি অংশ দিয়েছে 'কয়োকা'।

তদন্ত কেন্দ্রটি রাজধানীর অপরাধ তদন্ত বিভাগের সদর দপ্তরে স্থাপন করা হয়েছে। আর সাইবার প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটি স্থাপন করা হয়েছে পুরান ঢাকার মিল ব্যারাকের ট্রাফিক ও ড্রাইভিং স্কুলে। কেন্দ্রগুলোর অধিকাংশ যন্ত্রপাতিই ক্রয় করা হয়েছে কোরিয়া ও যুক্তরাষ্ট্র থেকে। তবে কিছু যন্ত্রপাতি জার্মানি থেকেও ক্রয় করা হয়েছে।

ইতোমধ্যে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার পদমর্যাদা সম্পন্ন একজন কম্পিউটার প্রোগ্রামার, দুজন সহকারি পুলিশ সুপার ও তিনজন উপ-পরিদর্শকসহ মোট ছয়জন তদন্ত কর্মকর্তা কোরিয়ার একটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ছয় মাসের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে।

প্রশিক্ষিত তদন্ত কর্মকর্তাবৃন্দ এবং কোরিয়ার দু'জন কম্পিউটার বিশেষজ্ঞ বাকিদের প্রশিক্ষণ দেবেন। বর্তমানে তারা বাংলাদেশের উপযোগী একটি সিলেবাস তৈরির জন্য কাজ করছেন।

তদন্ত কেন্দ্রটিতে মোবাইল ফোন থেকে তথ্য উদ্ধার ও যাচাই করতে 'মোবাইল ফরেনসিক', কম্পিউটার-ল্যাপটপ থেকে তথ্য উদ্ধার ও যাচাই করতে 'কম্পিউটার ফরেনসিক' এবং হার্ডওয়্যার, সিসিটিভি (গোপন ক্যামেরা), পেন ড্রাইভ এবং অন্যান্য ডিভাইস থেকে তথ্য উদ্ধার ও যাচাই করতে 'সিস্টেম ফরেনসিক' নামে তিনটি বিভাগ রয়েছে।

প্রতিবেদন : আশরাফুল হক জুয়েল, অনুবাদ : সৈয়দ এলতেফাত হোসেইন

## প্রায় আড়াই লাখ অপরাধীর ডিজিটাল ডাটাবেজ তৈরি করেছে র‍্যাব

দেশে প্রথমবারের মতো উল্লেখযোগ্য সংখ্যক জঙ্গির তথ্য-উপাত্তসহ প্রায় ২ লাখ ৫৩ হাজার চিহ্নিত অপরাধীর সর্ববৃহৎ ডিজিটাল ডাটাবেজ তৈরি করেছে র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব)।

সরকারি তথ্য অনুযায়ী, অপরাধীদের ছবি, আঙ্গুলের বায়োমেট্রিক ছাপ, চোখের মণির স্ক্যান, পূর্ববর্তী অপরাধের রেকর্ড এবং ফৌজদারি অপরাধে শাস্তির তথ্যের মতো অপরাধীদের ১৫০ ধরনের তথ্য-উপাত্ত রয়েছে এই ডাটাবেজে।

র‍্যাবের মহাপরিচালক বেনজীর আহমেদ বাসসকে বলেন, ‘ডাটাবেজে খুব সহজেই অপরাধীদের বিবরণ পাওয়া যায়, যা আমাদের অপরাধ প্রতিরোধে বিশেষ করে জঙ্গি তৎপরতা দমনে সহায়তা করে।’

র‍্যাব গ্রেফতারকৃত জঙ্গি এবং ফৌজদারি কার্যবিধি (সিআরপিসি) অনুযায়ী বিভিন্ন মেয়াদে সাজাপ্রাপ্ত বন্দিদের তথ্য নিয়ে ২০১১ সালে এই ডাটাবেজ তৈরির কাজ শুরু করে। ডাটাবেজ তৈরি করার লক্ষ্যে অপরাধীদের মৌলিক তথ্য সংগ্রহ করতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত র‍্যাব কর্মকর্তারা সারাদেশের ৬৭টি জেলখানার মধ্যে পার্বত্য অঞ্চলের ৩টি ছাড়া বাকি ৬৪টি জেলখানা পরিদর্শন করেন। অপরাধীদের তালিকা তৈরি করার কাজে সহযোগিতার জন্য তারা কিছু জেল কর্মকর্তাকেও প্রশিক্ষণ দেন।

বর্তমানে র‍্যাবের হাতে কোনো অপরাধী বা জঙ্গি গ্রেফতার হলে, এক মিনিটের মধ্যেই সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা গেফতারকৃতদের তথ্য ডাটাবেজের মূল সার্ভারে যোগ করতে সক্ষম হচ্ছেন। অপরাধীদের প্রত্যেকের জন্য একটি করে কোড নম্বর দেয়া আছে। এই কোড নম্বর চাপার কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই অপরাধীর সব তথ্য বেরিয়ে আসে।

বাহিনীটির সব ব্যাটালিয়ন ও অপরাধ প্রতিরোধকারী টিমে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের র‍্যাবের সদর দপ্তরে ডাটাবেজের মূল সার্ভারে তথ্য আপলোড করার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন পরিচয়ে যারা অপরাধ সংঘটিত করে, ডাটাবেজটি তাদেরও শনাক্ত করতে সক্ষম।

ডাটাবেজের তথ্যের সঙ্গে ব্যক্তির তথ্য মিলিয়ে র‍্যাব ১ হাজার ১০০ জন ব্যক্তিকে শনাক্ত করেছে, যারা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন নামে অপরাধ সংঘটিত

করেছে। কোনো ব্যক্তি অপরাধের সঙ্গে সম্পৃক্ত কিনা, তা যাচাই করার জন্য জাতীয় পরিচয়পত্রের ডাটাবেজে র‌্যাবের প্রবেশাধিকার রয়েছে। এ লক্ষ্যে মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট ও বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট অথোরিটি'র (বিআরটিএ) ড্রাইভিং লাইসেন্স ডাটাবেজে প্রবেশাধিকার পেতেও কাজ চলছে।

২০১৬ সালের ৭ ফেব্রুয়ারি থেকে যারা এক দিনের জন্যও কারাগারে ছিল, এমন ৫৮ হাজার বন্দির ২০০ রকমের তথ্য সংবলিত একটি কারাবন্দি ডাটাবেজ চালু করেছে র‌্যাব। ডাটাবেজে অপরাধীদের উভয় হাতের দশ আঙ্গুলের বায়োমেট্রিক ছাপ ও চোখের মণির স্ক্যান সংরক্ষিত রয়েছে। ডাটাবেজে অপরাধীদের পূর্বের অপরাধের রেকর্ড, অপরাধের ধরন, শাস্তির বিবরণ, তাদের নাম, ঠিকানা এবং পেশা উল্লেখ রয়েছে।

কারা কর্তৃপক্ষের সহযোগিতায় অপরাধবিরোধী বাহিনী, র‌্যাবের কমিউনিকেশন অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম (এমআইএস) শাখা এই ডাটাবেজটি তৈরি করেছে।

সারাদেশের ৬৭টি কারাগারকে অপটিক্যাল ফাইবারের মাধ্যমে শক্তিশালী নেটওয়ার্কের আওতায় আনা হয়েছে। যেখানে র‌্যাবের সদর দপ্তরে একটি প্রধান ডাটাবেজ ও একটি পুনরুদ্ধারকারী (রিকভারি) সার্ভার স্থাপন করা হয়েছে।

এই ডাটাবেজটিও জাতীয় পরিচয়পত্রের তথ্য সংগ্রহ করতে নির্বাচন কমিশনের জাতীয় পরিচয়পত্র শাখার ডাটাবেজে প্রবেশাধিকার পেয়েছে এবং মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট (এমআরপি) এর ডাটাবেজে প্রবেশাধিকার পাওয়ার কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

এই ডাটাবেজটি এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে যে, ডাটাবেজের অধীন যে কোনো কারাগারের বন্দির তথ্য মোবাইলে ক্ষুদে বার্তার মাধ্যমে র‌্যাবের মহাপরিচালক ও জেলের মহাপরিদর্শকের কাছে চলে যাবে।

এই ডাটাবেজের মাধ্যমে কর্তৃপক্ষ এক ক্লিকেই অপরাধীদের অবস্থা ও ৬৭টি কারাগারের বন্দিদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে পারবে।

ডাটাবেজ সিস্টেমটিকে যথাযথভাবে পরিচালনা করতে বর্তমানে র‌্যাব কারা কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ দিচ্ছে।

প্রতিবেদন : আশরাফুল হক জুয়েল, অনুবাদ : সৈয়দ এলতেফাত হোসেইন

## দুর্নীতি প্রতিরোধে ডিজিটাল মনিটরিং সফটওয়্যার তৈরি করছে দুদক

প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতি প্রতিরোধে ডিজিটাল মনিটরিং সফটওয়্যার তৈরি করছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনের অন্যতম সূচক দুর্নীতিমুক্ত বাংলাদেশ নির্মাণের লক্ষ্য অর্জনেই দুদকের এই উদ্যোগ।

দুদকের সচিব আবু মো. মোস্তফা কামাল বলেন, আমরা দুর্নীতি দমন কমিশনকে পুরোপুরি দুর্নীতিমুক্ত করার বিষয়ে উদ্যোগ নিচ্ছি। কমিশনের পক্ষ থেকে সব কার্যক্রম মনিটরিং করার জন্য ডিজিটাল সিস্টেম চালু করা হচ্ছে। এজন্য আমরা একটি সফটওয়্যার তৈরি করার পরিকল্পনা করেছি।

তিনি জানান, একটি কারিগরি সহায়তা প্রকল্পের আওতায় এই সফটওয়্যার তৈরি করা হচ্ছে। এর জন্য এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (এডিবি) ও দুদকের মধ্যে একটি চুক্তি হয়েছে। এ খাতে মোট ৭ কোটি ৬০ লাখ টাকা খরচ হবে। যার ১ কোটি ২০ লাখ টাকা দুদক এবং ৬ কোটি ৪০ লাখ টাকা দেবে এডিবি।

তিনি বলেন, সফটওয়্যার বানানো হয়ে গেলে আমরা আমাদের দুদকের পুরো কার্যক্রম ইলেকট্রনিক্যালি মনিটর করব। দুদকের অনুসন্ধান, তদন্ত, মামলা, প্রসিকিউশন সব কার্যক্রম তখন অনলাইনে হবে। এর ফলে দুদকের যে কর্মকর্তা যে ফাইলটি নিয়ে কাজ করছেন তিনিসহ তার চেইনের সিনিয়র ও জুনিয়র সব কর্মকর্তা তা দেখার সুযোগ পাবেন। প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতি বন্ধের জন্যই এই উদ্যোগটি গ্রহণ করা হয়েছে। আশা করি, এতে দুদকের কর্মক্ষমতা ও দুর্নীতি দমনে সাফল্য আরো বাড়বে।

দুর্নীতি প্রতিরোধে ডিজিটাল পদ্ধতি প্রসঙ্গে দুদকের উপ-পরিচালক প্রণব কুমার ভট্টাচার্য্য বলেন, আমরা দুদকের বিভিন্ন কার্যক্রম জিডিটাল পদ্ধতির আওতায় এনেছি। এর মধ্যে বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন রেগুলেটরি কমিশন (বিটিআরসি)-এর মাধ্যমে মানুষকে দুর্নীতি প্রতিরোধে সচেতন করতে চালু করা হয়েছে ক্ষুদে বার্তা। বিভিন্ন দিবসে এসব বার্তা পৌঁছে যাচ্ছে মানুষের কাছে। যেখানে দুর্নীতিবিরোধী বিভিন্ন স্লোগান থাকে। টেলিভিশন ও রেডিওতে ডকুমেন্টারি ফিল্ম প্রচারিত হচ্ছে। দুদকের একটি নিজস্ব ওয়েবসাইট আছে। এতে বার্ষিক প্রতিবেদনসহ সব তথ্য দেয়া থাকে। যে কেউ দুদকের ওয়েবসাইটে গিয়ে দুদক সম্পর্কে তথ্য জানতে পারেন। ডিজিটাল সফটওয়্যার চালু হলে আমাদের মনিটরিং কার্যক্রম আরো জোরদার হবে।

প্রতিবেদন : তাসকিনা ইয়াসমিন

## Govt outlines strategy for steady progress in ICT sector

The government has outlined a strategy for maintaining unremitting progress in the country's Information Communication and Technology (ICT) sector toward attaining the goal of Digital Bangladesh.

The outline has been reflected in the national budget as ICT sector got a substantial increase in funding for implementing the strategy.

"The proposed budget is an outline for continuous progress in the ICT sector", said Zunaid Ahmed Palak as he was commenting on the fiscal allocation and policy statement for 2017-18 financial year (FY18) placed in the Jatiya Sangsad (JS) by Finance Minister Abul Maal Abdul Muhith on June 1, 2017.

Referring to the increase in the fiscal allocation for the country's ICT sector, the state minister said it clearly reflects the present government's earnest efforts in attaining the vision for the "Digital Bangladesh."

For the 2017-2018 fiscal year (FY18), Muhith proposed an allocation of Taka 3974 crore for the Information and Communication Technology Division, which is Taka 2,155 crore more than the revised budget for 2016-17 financial year (FY17).

Muhith in his budget speech said with the expansion of ICT in private sector, the government is encouraging automation and e-GP processes in different areas of public sector as well.

"Innovative ideas are being implemented in government offices in delivering various services through ICT," he said.

He also noted that the government has undertaken initiatives to establish ICT related institutional framework and implement policy reforms.

With this end, ICT Parks are being set up in different parts of the country to attract domestic and foreign investments, the finance minister said.

In the budget speech, Muhith also listed some of the major initiatives that the government has so far taken to expediting the digitisation process.

The government has established "Sheikh Russel Digital Lab and Multimedia Classroom" in 23,331 secondary schools and 15,000 primary schools across the country.

The e-Filing system has already been introduced in 20 ministries or divisions including the Prime Minister's Office, 64 deputy commissioner offices and seven divisional commissioner offices.

Apart from this, around 18,500 government offices have been brought under a single network. The existing capacity of the submarine cable has been increased to 200 gbps (gigabits per second) from 44 gbps.

As of April 2017, the number of mobile telephone and internet subscribers has increased to around 13.31 crore and 7 crore respectively.

In the secondary level, Upazila ICT Training and Resource Centres have been established and 295 non-government schools have been transformed into model schools in 315 upazilas having no government schools.

Computer labs in 3,550 educational institutions and multimedia classrooms in 23,331 educational institutions have also been set-up.

"In order to encourage investment in ICT sector, the government has brought down the rate of existing VAT on raw materials and parts need to manufacture and assemble goods used in this sector like mobile phone, desktop computer, laptop and tab," Palak told BSS.

The government has removed all the obstacles for development of the country's hardware industry by bringing down the rate of VAT on 94 types of raw materials and parts from maximum 25 per cent to flat rate of one per cent. For only three types of raw materials the VAT rate has been brought down to 10 per cent, ICT Division sources said.

Apart from these, VAT exemption has been given in manufacture level till June 30, 2019, on locally produced products in order to help the local heavy technical industry to flourish and get competitive edge on the global market.

The state minister for ICT hoped that this budget will help to meet the local demand of technological products in the country.

Report: Mahmudul Hasan Raju

## Bangladesh leads major SAARC nations in internet access

Bangladesh has advanced significantly in internet connectivity and effectively led major SAARC nations, with nearly 42.0 per cent of total population using internet for various purposes, according to official sources.

The latest data from the Bangladesh Telecommunication Regulatory Commission (BTRC) shows that the total number of internet users has reached 67.245 million at the end of February, 2017. The staggering number is around 41.52 per cent of the total population of the country, leaving many Asian powerhouses behind with huge margin.

According to available data from some internet users' monitoring sites, neighbouring India has over 46 crore internet users, which is 34.83 per cent of its total population. Sri Lanka has 60.87 lakh internet users, which is 29.30 per cent of its total population. In Pakistan, only 17.81 per cent of its total population use internet.

The number of internet users surged in the past nine years from 2.67 per cent in 2008 to 41.52 this year due to some breakthrough decisions and steps taken by the current government, led by Prime Minister Sheikh Hasina.

This year too, the government has given special priority to ICT, as Finance Minister Abul Maal Abdul Muhith has proposed an allocation of Taka 3,974 crore for the Information and Communication Technology Division, an amount which is Taka 2,155 crore more than the revised budget of 2016-17 year.

The government has also plans to take the rate of internet penetration in the country to 100 percent, ensuring high

speed broadband internet at cheap rate to all the government offices, educational institutions, healthcare centres and union parishads, expanding 3G network across the country and launching 4G by 2020.

"We have already brought all the upazilas in the country under fiber optic cable network. Work under project titled Info Sarker-3 is going on to bring all the unions in the country under the network," said State Minister for ICT Division Zunaid Ahmed Palak.

"We have set a target of ensuring employment of 2 million people in ICT sector and achieve the export income of USD five billion by 2021 by utilising the continuous policy support of the government of Prime Minister Sheikh Hasina and the digital dividends," he added.

"Bangladesh will surely become a high middle income country by 2021 and high income country by 2041 with the continuous expansion of ICT sector," Palak hoped.

Report: Mahmudul Hasan Raju

## Cyber centre probing sensational cases

The country's first-ever Cyber Investigation Centre is now probing sensational cases to expedite the investigation process and clear the backlog of the cases related to serious offences.

The centre has already completed investigation and forensic examination into around 1000 sensational cases, including the Holey Artisan Cafe attack, rape of two girls at a Banani hotel and Bangladesh Bank reserve scam, said official sources.

"We have so far completed investigation and forensic examination of around 950 cases out of 1120 since inception of the cyber investigation centre in 2013," said Additional Superintendent of Police Md Jalal Uddin Fahim, also the chief of Digital Forensic Lab and Cyber Police Bureau, Criminal Investigation Department (CID).

"All the major cases, including 25 militant related cases, in which crimes were committed involving digital devices, have been sent to us for conducting investigation and forensic examinations," he said. Besides, Fahim said the centre dealt with over one lakh allegations of crimes involving digital devices like the Bangladesh Bank scam and stealing money from ATMs. Many of the cases were eventually referred to Bangladesh Telecommunication Regulator Commission (BTRC) for taking quicker action.

As part of the Awami League government's pledge to make Bangladesh a digital nation, the country's first-ever Cybercrime Training Centre and Cybercrime Investigation Centre were set up at Criminal Investigation Department

(CID) at Malibagh in the capital city, Project Director and CID's Police Super of Dhaka Metro (North) Rezaul Hawlader told BSS.

Both the centres were constructed at a cost of US dollars 3.5 million (around Tk 28 crore) under the project of Enhancing Cyber Investigation Capacity of Bangladesh Police, he added.

The government contributed around Tk 4.5 crore while KOICA gave the rest of the money. The investigation centre has been built at the Criminal Investigation Department (CID) headquarters in the capital while the cyber training centre is housed in the Traffic and Driving School in Mill Barack of the old part of the city.

Most of the equipment have been purchased from Korea and the United States, and some from Germany. Six CID officers, including a computer programmer, with posts equivalent to additional police supers, two assistant police supers, and three sub-inspectors have already been trained in a Korean university for six months.

The trained CID officers and two computer experts from Korea will train others, following a syllabus suitable for Bangladesh.

The centre has three departments - mobile forensic to retrieve and assess data collected from the mobile phones; computer forensic to assess data retrieved from computers and laptops, while system forensic to assess data collected from hardware, CCTVs (Closed Circuit Camera Televisions), pen drives and other devices.

Report: Ashraful Haque

## RAB prepares digital database of 2.53 lakh criminals

Rapid Action Battalion (RAB) has prepared the largest ever digital database of over 2 lakh 53 thousand identified criminals, including a large number of militants. The database contains 150 types of information such as photographs, biometric finger prints, irises and previous criminal records and punishments in criminal offences, according to official sources.

“The particulars of the criminals, readily available in the database, are helping us a lot to prevent and combat crimes, particularly militant activities,” Director General of RAB Benazir Ahmed told BSS.

RAB started preparing the database in 2011, with inclusion of the information of the arrested militants by the force and the prisoners who were sentenced to various jail term under Criminal Procedure Code (CrPC).

Trained operators of RAB visited 64 jails out of 67 prisons across the country to collect basic information of the criminals for preparing the database. The officials also trained a number of jail officials to help them preparing the list of the criminals.

Currently, the RAB officials concerned are adding related information to the main server of the database in one minute immidiately after arrest of any criminal or militant by the anti-crime elite force.

A code number is allocated for each of the criminals. All the information about a criminal comes out in few seconds by inserting the particular code number.

RAB has assigned trained personnel at all its battalions and crime prevention teams to upload data to its main server at the headquarters in Dhaka. The database is able to detect the persons who commit crimes with using different identities. The force has also detected 1100 such people who committed crimes in different names.

It has obtained access to the database of the NID (national identity card) to know involvement of a person's in criminal activities.

Work is going on to get access to MRP (Machine Readable Passport) database and drivers' licence database of Bangladesh Road Transport Authority (BRTA) to get the similar information.

RAB also introduced Jail Inmate Database on February 7 in 2016, incorporating 200 types of data of 58,000 criminals, who were in jail even for a single day. The database preserved biometric finger prints of 10 fingers of both hands and iris scan of the criminals.

Previous crime records, types of crimes, punishments, name of criminals, their addresses and professions are also included in this database.

Communication and Management Information System (MIS) wing of the anti-crime elite force prepared the database with the help of the prison authorities.

A main database server and a recovery server have been installed at the RAB headquarters, with having connectivity through optical fiber to 67 prisons across the country. The database also obtained access to the NID wing of the Election Commission (EC) while the process to collect

information from the MRP wing is also underway. It has been built in such a way that the RAB director general and the inspector general of prisons will receive text messages

once the information of an inmate in any jail in the country is included in the database.The database also enables authorities to monitor the status of criminals and condition of the prisoners in 67 jails at a single click.

RAB is giving training to prison officials to make them efficient to operate the system effectively.

Report: Ashraful Haque

## ACC developing software to check institutional graft

The Anti-Corruption Commission (ACC) is developing a digital monitoring software to check institutional graft.

“The anti-graft watchdog has taken the initiative to build a corruption-free Bangladesh, which is one of the indices for achieving sustainable development,” an ACC official said.

ACC Secretary Abu Md. Mostafa Kamal told this correspondent that the commission is now developing software to install a digital system, which would monitor all its activities.

He said the software is being developed under a technical assistance project, and the ACC has signed an agreement with the Asian Development Bank(ADB) in this regard.

A total of Taka 7.60 crore would be spent for this purpose, Kamal said, adding that of the amount, the ADB would provide Taka 6.40 crore, while the rest of the money would be given by the ACC.

“With the development of the software, we will monitor the entire activities of the commission electronically. Then all activities of the ACC, including searching, investigation, case and prosecution will also be done through online,” the ACC secretary said.

“This initiative has been undertaken to stop institutional corruption ... we hope that the ACC will witness more success,” he said.

About the digital system to prevent corruption, ACC Deputy Director Pranab Kumar Bhattacharya said the commission would bring its various activities under the digital system.

“The digital software will strengthen the ACC’s monitoring activities,” he said.

He said short message has been introduced through the Bangladesh Telecommunication Regulatory Commission (BTRC) to make people aware of preventing corruption.

"The messages containing various anti-graft slogans are being reached the people on various important days and occasions," he said.

The ACC deputy director said documentaries are being broad casted on radio and televisions.

Besides, the ACC has its own website where all information is available.

He said anybody can know about the ACC and its services if he/she visits the website.

Report: Taskina Yeasmin, Translation: Ashequn Nabi Chowdhury

বিশেষ উদ্যোগ ৪

# শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচি

**“শিক্ষিত জাতি সমৃদ্ধ দেশ, শেখ হাসিনার বাংলাদেশ”**

## শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচি


দেশের শিক্ষা খাতে গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি হয়েছে ৮৪
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ডিজিটাইজেশন সুফল দিতে শুরু করেছে ৮৭
উপবৃত্তির মাধ্যমে সব প্রতিকূলতা পেরিয়ে স্বপ্ন পূরণ করছে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীরা ৯০
শিক্ষার আলোয় আলোকিত উপকূলের শিশুরা ৯৩
ডিজিটাল উপস্থিতি রংপুর পিএলএসসিকে শ্রেষ্ঠত্বের আসন দিয়েছে ৯৬
Education sector sees significant development in major areas 98
Digitised education system starts bringing in great fruit 102
Physically challenged students fulfilling dreams on stipends 106
Education enlightens coastal children 110
Digital attendance helps school to achieve academic excellence in Rangpur 113

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শিক্ষাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন। তাঁর উদ্যোগে যুদ্ধবিধ্বস্ত স্বাধীন বাংলাদেশে ৩৬ হাজার ১৬৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণ করা হয়। সে সময় সরকারি শিক্ষকের পদমর্যাদা লাভ করেন দেশের ১ লাখ ৫৭ হাজার ৭২৪ জন শিক্ষক। এই ধারাবাহিকতায় বঙ্গবন্ধুর কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচি বাস্তবায়নের বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেন।

## শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

বর্তমান সরকারের শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যগুলো নিম্নরূপ: স্কুলবয়সী শতভাগ শিশুকে বিদ্যালয়ে আনা, প্রাথমিক, মাধ্যমিক, এবতেদায়ী, দাখিল ও এসএসসি পর্যায়ে বিনামূল্যে পাঠ্যবই সরবরাহ, মেয়েদের বিনা বেতনে অধ্যয়নের সুযোগ এবং শিক্ষা সহায়তা উপবৃত্তি প্রদান, সব শ্রেণির মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা সহায়তা উপবৃত্তি প্রদান, পর্যায়ক্রমে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো জাতীয়করণ করা এবং আইটি নির্ভর

শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনসহ শ্রেণিকক্ষগুলোতে মাল্টিমিডিয়া ও ইন্টারনেট সংযোগ নিশ্চিতকরণ।

## অর্জন

- দেশে শিক্ষার হার গত ৮ বছরে ৪৪ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৭২.৩০ শতাংশে উন্নীত হয়েছে।
- গত ৮ বছরে প্রাথমিক, মাধ্যমিক, এবতেদায়ী, দাখিল ও এসএসসি পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের বিনামূল্যে মোট ১৯০ কোটি বই বিতরণ করা হয়।
- ১ জানুয়ারি ২০১৭ সালে ৪.২৭ কোটি শিক্ষার্থীর মাঝে বিনামূল্যে ৩৬ কোটি ২২ লাখ বই বিতরণ করা হয়েছে।
- ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে প্রাথমিক স্তরের ১ কোটি ৭ লাখ শিক্ষার্থীর মাঝে প্রথম কিস্তিতে ২৮৭ কোটি টাকার উপবৃত্তি প্রদান করা হয়েছে।
- ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে পঞ্চম শ্রেণিতে সাধারণ ও টেলেন্টপুলে মোট ৮২ হাজার ৪৫৪ জনকে বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে।
- ২৬ হাজার ১৯৩টি প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণ করা হয়েছে।
- এ পর্যন্ত ১ লাখ ২০ হাজার শিক্ষকের চাকরি জাতীয়করণ করা হয়েছে।
- সারাদেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৩ হাজার ১৭২টি কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে।
- অবকাঠামোগত সুবিধা বৃদ্ধির জন্য এ পর্যন্ত ৫ হাজার ৫৪৯টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের একাডেমিক ও প্রশাসনিক ভবন নির্মাণ করা হয়েছে।
- পাঠ্যপুস্তকের অনলাইন ভার্সন তৈরি করা হয়েছে।
- ২০১৫ সাল থেকে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুদের ব্রেইল পদ্ধতির বই বিতরণ করা হচ্ছে।
- ১৭ লাখ শিক্ষককে কম্পিউটার, ইংরেজি, গণিতসহ বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

- উচ্চ শিক্ষার প্রসারের লক্ষ্যে ২০০৯ সাল থেকে এ পর্যন্ত নতুন ৮টি সরকারি এবং ৪২টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের অনুমতি দেয়া হয়েছে।
- ২০০৯ সাল থেকে এ পর্যন্ত বেসরকারি মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক ও মাদ্রাসার মোট ১ লাখ ১৬ হাজার ৮৩৬ জন শিক্ষক ও কর্মচারীকে এমপিও ভুক্ত করা হয়েছে।
- বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষক-কর্মচারীদের অবসর সুবিধা হিসেবে ২০০৯-১৬ পর্যন্ত ৫১ হাজার ৮৭৪টি আবেদনের বিপরীতে ২ হাজার ৬৪ কোটি টাকা দেয়া হয়েছে।

## ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

- প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার হার শতভাগে উন্নীতকরণ ও গুণগত শিক্ষা নিশ্চিতকরণ।
- প্রাথমিক বিদ্যালয় ও এবতেদায়ী মাদ্রাসার শিক্ষার্থীদের মাঝে স্কুল ফিডিং কার্যক্রমে সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে ঝরে পড়া রোধ, পুষ্টি সহায়তা ও শিক্ষার প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি করা।
- যে সব উপজেলায় সরকারি স্কুল ও কলেজ নেই সে সব উপজেলায় একটি স্কুল ও একটি কলেজ জাতীয়করণ করা।
- অটিস্টিক ও স্নায়ু বিকাশজনিত শিশুদের বিভিন্ন প্রশিক্ষণের জন্য আন্তর্জাতিক মানের ন্যাশনাল একাডেমি ফর অটিজম অ্যান্ড নিউরো ডেভেলপমেন্টাল ডিজঅ্যাবিলিটিজ প্রতিষ্ঠা করা হবে।

ছবি ও তথ্য : চলচিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর

## দেশের শিক্ষা খাতে গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি হয়েছে

দেশের শিক্ষা খাতে গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি হয়েছে। সরকার প্রণীত 'শিক্ষা নীতি ২০০০'-এর আলোকে ২০০৯ সাল থেকে শিক্ষার বিভিন্ন শাখায় এসব কার্যক্রম বাস্তবায়ন শুরু হয়।

এর মধ্যে রয়েছে শিক্ষার মৌলিক উপকরণ নিশ্চিতকরণ, শ্রেণিকক্ষ ও পাঠ্যবইয়ের ডিজিটাইজেশন, পাঠ্যসূচির সংস্কার, সৃজনশীল প্রশ্নপত্র প্রবর্তন, অবকাঠামোগত উন্নয়ন এবং মাদ্রাসা শিক্ষার আধুনিকায়ন।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাম্প্রতিক এক প্রতিবেদন অনুযায়ী, শিক্ষা নীতি ২০০০ বাস্তবায়নের ফলেই শিক্ষার বিভিন্ন শাখায় এ অগ্রগতি সম্ভব হয়েছে। আওয়ামী লীগ সরকার ২০০০ সালে এই শিক্ষা নীতি প্রণয়ন করে।

পরবর্তীতে বিএনপি ক্ষমতায় এসে এ নীতিকে বাতিল করে দেয়। কিন্তু আওয়ামী লীগ পুনরায় সরকার গঠন করলে ২০০৯ সালে এ নীতির পুনঃপ্রবর্তন এবং বাস্তবায়ন শুরু হয়।

প্রতিবেদনে বলা হয়, 'এ নীতির মূল লক্ষ্য হলো নতুন প্রজন্ম তৈরিতে সহায়তা করা, শিক্ষাকে সমৃদ্ধ করা, নৈতিক মানসম্পন্ন জ্ঞান ও মেধার বিকাশ, জনগণের প্রতি ভালোবাসা এবং দেশপ্রেম শিক্ষা দেয়া।'

প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়, একটি শিশুও যাতে শিক্ষার মৌলিক সুযোগ থেকে বঞ্চিত না হয় সে লক্ষ্যে সরকার ২০১০ সাল থেকে বছরের প্রথম দিন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের হাতে বিনামূল্যে পাঠ্যবই তুলে দেয়।

এর আগে মাত্র ৪০ শতাংশ শিক্ষার্থীর মাঝে বিনামূল্যে পাঠ্যবই বিতরণ করা হতো। আর ৬০ শতাংশ শিক্ষার্থীই পুরনো বই পেত অথবা বাজার থেকে নতুন বই কেনার অপেক্ষায় থাকত। কিন্তু মার্চ এপ্রিলের আগে বাজারে নতুন বই পাওয়া যেত না।

দেশের সব জায়গায় একই সময়ে পাঠ্যবই প্রাপ্তি নিশ্চিত করার জন্য সরকার ২০১০ সালে প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার্থীদের জন্য ই-বুক চালু করে এবং সেগুলো ওয়েবসাইটে আপলোড করে।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) শিক্ষা প্রসারের অংশ হিসেবে দেশের ২৩ হাজার ৩৩১টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং ১৫ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব এবং মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম চালু করা হয়েছে।

২০১৩ সাল পর্যন্ত প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শ্রেণিতে ১৯৯৫ সালে রচিত পাঠ্যবই পড়ানো হতো। শিক্ষা মন্ত্রণালয় ১ হাজার ৪০০ জন শিক্ষাবিদ, গবেষক ও শিক্ষকদের সমন্বিত প্রচেষ্টায় একটি আধুনিক ও সময়োপযোগী পাঠ্যসূচি প্রণয়ন করে।

শিক্ষার্থীরা যাতে প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর খোঁজার জন্য বিষয়ের গভীরে প্রবেশ করতে বাধ্য হয়, সেজন্য সরকার মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় সৃজনশীল প্রশ্নপত্র চালু করে।

শিক্ষার প্রসার ও সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকার ১ হাজার ৫০০টি বেসরকারি কলেজ, ৩ হাজার বেসরকারি বিদ্যালয় এবং ১ হাজার মাদ্রাসা নির্মাণের কাজ শুরু করেছে। শিক্ষার মানোন্নয়নে গৃহীত প্রকল্পের অধীনে ২০১১ সাল থেকে প্রত্যেক জেলায় কমপক্ষে একটি স্নাতকোত্তর কলেজে একটি কম্পিউটার ল্যাব, একটি উপযুক্ত পরীক্ষা কেন্দ্র, একটি ডরমেটরি ও একটি সায়েন্স ল্যাব স্থাপনের কাজ শুরু করে।

মাধ্যমিক পর্যায়ে উপজেলা আইসিটি ট্রেনিং ও রিসোর্স সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে এবং ২৯৫টি বেসরকারি বিদ্যালয়কে মডেল বিদ্যালয়ে রূপান্তর করা হয়। গত কয়েক বছরে অতিরিক্ত ২৬ হাজার ১৯৩ টি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে জাতীয়করণ করায় এখন দেশের প্রায় প্রত্যেক গ্রামে কমপক্ষে একটি করে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে।

প্রতিবছর ষষ্ঠ থেকে স্নাতক এবং এর সমমানের ৩৮ লাখ শিক্ষার্থীকে বৃত্তি এবং ৬৭৫ কোটি টাকা মূল্যের অন্যান্য শিক্ষা সহায়তা দেয়া হয়। এছাড়াও প্রান্তিক শিক্ষার্থীদের মৌলিক শিক্ষার সুযোগ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ২৯ লাখ অসহায় শিক্ষার্থীকে বৃত্তি দেয়া হয়।

গত মে মাসে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেছিলেন, সরকার এ বছর ৬ লাখ শিক্ষার্থী বিশেষ করে যেসব মেয়ে দারিদ্র্যের কারণে লেখাপড়া চালিয়ে যেতে পারে না তাদের বৃত্তি দেবে।

মাদ্রাসা শিক্ষার আধুনিকায়নের জন্য সরকার দেশে ৭৮৩ কোটি টাকা ব্যয়ে ১ হাজার মাদ্রাসা নির্মাণের কাজ শুরু করেছে। ১০০ মাদ্রাসায় কম্পিউটার ল্যাব এবং ডিজিটাল ক্লাসরুম চালুর পাশাপাশি কারিগরি শিক্ষা কোর্সও চালু করেছে।

শিক্ষার বিভিন্ন শাখায় অগ্রগতির ফলে বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষার্থী নিবন্ধনের হার বেড়েছে, মেয়েদের এবং প্রাপ্ত বয়স্কদের  ঝরে পড়ার হার কমেছে।

বাংলাদেশ ব্যুরো অব এডুকেশনাল ইনফরমেশন অ্যান্ড স্ট্যাটিসটিকস (ব্যানবেইস)-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০১৬ সালে মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষার্থী নিবন্ধনের হার ৬৭.৮৪ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। যার মধ্যে ৭৩.১০ শতাংশ মেয়ে এবং ৬৩.৮৫ শতাংশ ছেলে।

প্রাথমিক শিক্ষায় ঝরে পড়ার হার ২০১৫ সালের ২০.৪ শতাংশ থেকে ২০১৬ সালে কমে ১৯.২ শতাংশ হয়েছে। একইভাবে মাধ্যমিক পর্যায়ে ঝরে পড়ার হার ২০১৫ সালের ৪০.২৯ শতাংশ থেকে ২০১৬ সালে ৩৮.৩ শতাংশে নেমেছে। উচ্চ মাধ্যমিকে ঝরে পড়ার হারও ২০.০৮ শতাংশে নেমে এসেছে।

প্রতিবেদন অনুযায়ী মাধ্যমিক পর্যায়ে দেশের শিক্ষার্থীর ৫১.৯ শতাংশ মেয়ে। যা  ই-৯ভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে সর্বোচ্চ। ই-৯ভুক্ত অন্য দেশগুলো হলো ব্রাজিল, চীন, মিসর, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, মেক্সিকো, নাইজেরিয়া ও পাকিস্তান।

বিশ্বব্যাংকের এক প্রতিবেদনে বলা হয়, 'সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য ২০১৫-এর অনেক আগেই বাংলাদেশ প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষায় লিঙ্গ সমতা অর্জন করেছে।'

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্যমতে, প্রাপ্তবয়স্ক শিক্ষার হার ১২ বছরের মধ্যে গতবছর সর্বোচ্চ ৭২.৩ শতাংশে উন্নীত হয়েছে।

প্রতিবেদন :  আশেকুন নবী চৌধুরী, অনুবাদ : মাহফুজা জেসমিন

## শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ডিজিটাইজেশন সুফল দিতে শুরু করেছে

মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম স্থাপন, ডিজিটাল কন্টেন্ট তৈরির জন্য শিক্ষক প্রশিক্ষণ, সব পাঠ্যবই ই-বুকে রূপান্তর এবং অনলাইনে পাবলিক পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ সবই সরকারের ডিজিটাল শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০১২ সালের ২০ মে সারাদেশের ১ হাজার স্কুলে মাল্টিমিডিয়া শ্রেণিকক্ষ উদ্বোধন করার পর থেকেই মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করার এই উদ্যোগটি বিস্তৃতি লাভ করে।

অ্যাক্সেস টু ইনফরমেশন (এটুআই)-এর ই-লার্নিং বিশেষজ্ঞ ফারুক আহমেদ জানান, বর্তমানে প্রায় ২৩ হাজার ৩৩১টি মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং ১০ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম রয়েছে। যেখানে প্রায় ১ লাখ ৬৭ হাজার প্রশিক্ষিত শিক্ষক ১০ মিলিয়নেরও বেশি শিক্ষার্থীকে উচ্চমানের পাঠদান করা হয়।

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এটুআই শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের জন্য শিক্ষণ এবং শেখার পদ্ধতিকে ইন্টারেক্টিভ এবং উপভোগ্য করতে এই কর্মসূচি প্রণয়ন করে। এটি শিক্ষা ক্ষেত্রে তিন স্তরে বাস্তবায়ন করা হয়। মাধ্যমিক স্কুলে মাল্টিমিডিয়া শ্রেণিকক্ষ স্থাপন, ডিজিটাল কন্টেন্ট তৈরির জন্য শিক্ষক প্রশিক্ষণ এবং কারিগরি, বৃত্তিমূলক ও মাদ্রাসাসহ প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তকের ইলেকট্রনিক সংস্করণ তৈরি।

এছাড়াও এটুআই ইন্টারনেট সংযোগসহ ল্যাপটপ ব্যবহার করে প্রজেক্টরের মাধ্যমে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম চালু করেছে যা একটি পূর্ণাঙ্গ কম্পিউটার ল্যাব তৈরির তুলনায় অনেক সস্তা।

এটুআই'র শিক্ষা বিভাগের প্রধান ফারুক বলেন, একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে প্রায় সাড়ে ৫ হাজার মাদ্রাসা শিক্ষার্থী এখন মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুমের সুবিধা পাচ্ছে।

তিনি বলেন, 'আমরা আরো স্কুল ও মাদ্রাসায় তাদের নিজেদের উদ্যোগে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম গড়ে তোলা দেখতে চাই। যদি একটি স্কুল তাদের

নিজস্ব উদ্যোগে একটি মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম গড়ে তোলে তবে সরকার স্কুলটি গ্রামীণ এলাকায় হলে সেখানে আরো দুটি এবং শহর এলাকায় হলে আরো একটি মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম গড়ে তুলতে সহায়তা প্রদান করবে।

তিনি শিক্ষার ক্ষেত্রে বৈষম্য দূর করার লক্ষ্যে ডিজিটালাইজেশন প্রক্রিয়া দ্রুততর করার উদ্যোগের সঙ্গে যোগদানের জন্য সংশ্লিষ্ট স্কুলের প্রাক্তন শিক্ষার্থী বিশেষ করে সমাজের বিত্তবানদের প্রতি আহ্বান জানান।

স্থানীয় উন্নয়ন বিশেষজ্ঞ এবং এটুআই যোগাযোগ এবং পার্টনারশিপ শাখার প্রধান নাইমুজ্জামান ভূঁইয়া বলেন, 'ভালো শিক্ষকরা প্রত্যন্ত এলাকায় যেতে চান না। ফলে এসব এলাকায় মানসম্মত শিক্ষার অভাব দেখা দেয়। তবে বর্তমানে পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটতে শুরু করেছে।'

তিনি বলেন, এখন পঞ্চগড়ের প্রত্যন্ত এলাকার একজন শিক্ষার্থী রাজধানীর একটি নামকরা স্কুলের শিক্ষার্থীর মতোই একই ধরনের শিক্ষা লাভের সুযোগ পাচ্ছে। তারা শিক্ষক পোর্টালের মাধ্যমে প্রাথমিক, মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিকের জন্য প্রয়োজনীয় ডিজিটাল উপকরণের শিক্ষালাভ করছে।

শিক্ষার গুণগত মান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সাধারণ, বৃত্তিমূলক ও মাদ্রাসার শিক্ষকরা এই পোর্টালের সদস্য হতে পারেন। ডিজিটাল সামগ্রী তৈরি, বিকাশ এবং আপলোড করার অনুমতি ও তাদের রয়েছে।

জাতীয় পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) এটুআইয়ে অংশগ্রহণ করে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের সমস্তপাঠ্য বইয়ের ই-সংস্করণ তৈরি করেছে এবং সেগুলো (http://www.ebook.gov.bd) ওয়েবসাইটে আপলোড করেছে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০১১ সালের ২৪ এপ্রিল এই ই-বুকের বর্তমান সংস্করণ চালু করেন। শিক্ষার্থী, অভিভাবক, শিক্ষক, গবেষক এবং যে কেউ যে কোনো জায়গা থেকে ই-বই পড়তে পারেন। প্রয়োজনে তারা ব্যবহারের জন্য ডাউনলোড করতে পারেন। যে কেউই তাদের ডেস্কটপ, ল্যাপটপ বা ট্যাবলেট কম্পিউটার, ই-বুক রিডার বা মোবাইল ফোন ব্যবহার করে এসব ই-বই পড়তে পারেন।

মাহমুদুল হাসানের মেয়ে নাফিসা সৌদি আরবের জেদ্দাতে বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল স্কুলে অষ্টম শ্রেণির ছাত্রী এবং তিনি কন্যাকে তার হোম টাস্কে সহায়তা করার জন্য ই-বুক খুব সহজেই পেয়ে যান।

হাসান বলেন, 'এটি একটি অনেক বড় সিদ্ধান্ত যা থেকে আমাদের মতো সকল প্রবাসী শিক্ষার্থী ও তাদের পিতা-মাতা অত্যন্ত উপকৃত হচ্ছে।'

ভিন্নভাবে সক্ষম শিশুদের সমাজের মূলধারায় নিয়ে আসার লক্ষ্যে সরকার বিভিন্ন প্রকল্প হাতে নিয়েছে। এই ধরনের একটি প্রকল্পের আওতায় স্কুলের দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ছাত্রদের জন্য ডিজিটাল টকিং বুকসহ মাল্টিমিডিয়া প্লেয়ার বিতরণ করা হয়।

এটির আবিষ্কারক দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ভাস্কর ভট্টাচার্য, তিনি বর্তমানে ওয়েব অ্যাক্সেসিবিলিটি জাতীয় প্রকল্পের পরামর্শদাতা হিসেবে কাজ করছেন। কম্পিউটার, ট্যাবলেট বা অ্যানড্রয়েড ফোনে অ্যাক্সেসের সঙ্গে যে কোনো শিক্ষার্থী এই সফ্টওয়্যারটি বিনামূল্যে চালাতে, শুনতে বা পড়তে পারে।

এটুআই'র হিসাব অনুযায়ী, দেশে বর্তমানে আড়াই লাখ দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তি রয়েছে, যাদের মধ্যে অনেকেই বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত।

এটুআই'র পলিসি অ্যাডভাইজার আনির চৌধুরী বলেন, 'আমরা ইতিমধ্যেই দশম শ্রেণি পর্যন্ত সব পাঠ্যপুস্তক টকিং বুক মাল্টিমিডিয়ায় রূপান্তরিত করেছি।'

সোশ্যাল সার্ভিসেস ডিপার্টমেন্টের (ডিএসএস) মহাপরিচালক গাজী মো. নুরুল কবির বলেন, মাল্টিমিডিয়া টকিং বুক দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ছাত্রদের সমাজের মূলধারায় সম্পৃক্ত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

দেশে ২০০৯ সাল থেকে এসএমএসের মাধ্যমে এসএসসি, এইচএসসি, জেএসসি এবং পিএসসি পরীক্ষার ফলাফল পাওয়া যাচ্ছে। ২০১০ সাল থেকে অনলাইনে এসব ফলাফল পাওয়া যাচ্ছে। ২০০৯ সাল থেকেই ২৩টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় ও ৪০০ কলেজে ভর্তির জন্যও আবেদন করা যায়।

প্রতিবেদন : মাহমুদুল হাসান রাজু, অনুবাদ : রুহুল গণি জ্যোতি

## উপবৃত্তির মাধ্যমে সব প্রতিকূলতা পেরিয়ে স্বপ্ন পূরণ করছে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীরা

দারিদ্র্য কিংবা শারীরিক প্রতিবন্ধিতা কোনোটাই আর শিক্ষার ক্ষেত্রে বাঁধা নয়। সরকারের শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচির মাধ্যমে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীরা পাচ্ছে শিক্ষার সুযোগ। প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর শিক্ষার অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ২০০৮ সালে প্রতিবন্ধী ছাত্রছাত্রীদের উপবৃত্তি কর্মসূচি শুরু হয়।

সমাজসেবা অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট সুত্র জানায়, ২০০৮-০৯ অর্থবছরে এ কর্মসূচির উপকারভোগীর সংখ্যা ছিল ১৩ হাজার ৪১ জন এবং বার্ষিক বরাদ্দ ছিল ৬ কোটি টাকা। চলতি ২০১৬-১৭ অর্থবছরে উপকারভোগীর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৭০ হাজার এবং বার্ষিক বরাদ্দের পরিমাণ বেড়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় ৪৮ কোটি টাকা। অর্থাৎ গত নয় বছরে প্রতিবন্ধী উপকারভোগী শিক্ষার্থীর সংখ্যা বেড়েছে ৫ গুণেরও বেশি। একই সময়ে বরাদ্দের পরিমাণ বেড়েছে প্রায় ৮ গুণ।

কিশোরগঞ্জের পাকুন্দিয়া উপজেলার সুখিয়া ইউনিয়নের ছয়ছির গ্রামের রায়হান মিয়া (২২) ছয় ভাই-বোনের মধ্যে চতুর্থ। যথাসময়ে পোলিও টিকা না দেয়ায় দেড় বছর বয়সে শারীরিক প্রতিবন্ধিতার শিকার হন। দারিদ্র্যের কারণে অল্প বয়সেই তিন বোনের বিয়ে হয়ে যায়। মাধ্যমিকের গণ্ডি পেরুতে পারেননি অন্য দু'ভাইও। মাধ্যমিক শেষ করার আগেই বাবা আবদুস সালাম মারা যান। অনেক কষ্টে স্থানীয় জাঙ্গালিয়া হাইস্কুল অ্যান্ড কলেজ থেকে ২০০৯ সালে মানবিক শাখায় এসএসসি পাস করেন রায়হান।

এরপর ভর্তি হন একই প্রতিষ্ঠানের কলেজ শাখায়। কিন্তু কেবল টিউশনি করে সংসার এবং পড়াশোনার খরচ সামলাতে হিমশিম খাচ্ছিলেন। প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য উপবৃত্তি কর্মসূচির আওতায় ২০১০ সাল থেকে অর্থ সহায়তা পাচ্ছেন রায়হান। বর্তমানে পাকুন্দিয়া ডিগ্রি কলেজে বিএ (পাস) শেষ বর্ষে পড়ছেন। টিউশনির পাশাপাশি স্থানীয় ফুলকলি কিন্ডার গার্টেন স্কুলে খণ্ডকালীন শিক্ষকতা করে মা-ছেলের সংসার চলে। রায়হান বলেন, কলেজ পর্যায়ে সরকারি উপবৃত্তির টাকা না পেলে এতদূর আসা সম্ভব হতো না।

পাকুন্দিয়া ডিগ্রি কলেজের প্রিন্সিপাল কফিল উদ্দিন বলেন, সহযোগিতা পেলে প্রতিবন্ধীরাও নিজেদের যোগ্যতা প্রমাণ করতে পারে। রায়হান তা করে

দেখিয়েছে। তিনি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের সহযোগিতায় সরকারের পাশাপাশি সমাজের সচ্ছল ব্যক্তিদেরও এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

'প্রীতম চন্দ্র পাল, পঞ্চম শ্রেণি, সরকারি বিজ্ঞান কলেজ সংযুক্ত হাইস্কুল'। সাদা মলাটের ওপর প্রীতম নিজেই লিখেছে শব্দগুলো। গোটা গোটা হাতের অক্ষর দেখে বোঝার উপায় নেই কলম ধরার জন্য পর্যাপ্ত আঙুল প্রীতমের নেই! দুই পা এবং হাতের অপরিণত আঙুল নিয়ে জন্ম প্রীতমের। নিজের অদম্য চেষ্টায় ডান হাতের অস্বাভাবিক আঙুলের ফাঁকে কলম ধরা শিখে নেয় প্রীতম। প্রীতমের বাবা সমীর চন্দ্র পাল ওষুধের দোকানে কাজ করেন। একমাত্র ছেলেকে বিশেষায়িত কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি করানোর সামর্থ্য নেই তার। কিন্তু প্রীতমের মেধা আর পড়াশোনার প্রতি আগ্রহের কাছে হার মানে এই অক্ষমতা। সমাজসেবা অধিদফতরে যোগাযোগ করে সরকারের উপবৃত্তির আওতাভুক্ত হয় প্রীতম। চতুর্থ শ্রেণি থেকে প্রতি মাসে ৫০০ টাকা পায়। নিয়মিত উপবৃত্তির টাকা পাওয়ায় পড়াশোনার খরচ নিয়ে এখন আর ভাবতে হয় না পরিবারের।

দরিদ্র বাবার ক্রোধের শিকার বৃষ্টি আক্তার (১৪) দা-এর কোপে খুব অল্প বয়সেই ডান হাত হারিয়ে স্থায়ী শারীরিক প্রতিবন্ধিতার শিকার হয়। বৃষ্টির মাকে তালাক দিয়ে বাবা আরেকটা বিয়ে করেন। ছোটবেলা থেকেই বৃষ্টির স্বপ্ন; অনেক লেখাপড়া করবে, বড় হয়ে মায়ের কষ্ট দূর করবে। মেয়েকে পড়ানোর সামর্থ্য ছিল না দরিদ্র মায়ের। সে এখন স্থানীয় হোসেনপুর পাইলট বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণির (ভোকেশনাল শাখা) ছাত্রী। সরকারের উপবৃত্তির আওতায় পড়াশোনার খরচ বাবদ প্রতি মাসে ৬০০ টাকা পায়।

হোসেনপুর পাইলট বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বেগম জিন্নাত আক্তার বলেন, বৃষ্টির ডান হাতের কব্জি নেই। বাম হাতে লেখালেখি করে। পড়াশোনার প্রতি বৃষ্টির দারুণ আগ্রহ। অন্য সাধারণ শিক্ষার্থীর মতোই স্কুলের প্রতিটি পরীক্ষায় সে ভালো ফলাফল অর্জন করে আসছে। বৃষ্টিকে নিয়ে আমরা খুবই আশাবাদী।

বৃষ্টি আক্তার, রায়হান মিয়া এবং প্রীতম চন্দ্র পালের মতো এমন দরিদ্র, অসহায়, সুবিধাবঞ্চিত প্রতিবন্ধী শিশু-কিশোরদের শিক্ষার অধিকার ও স্বপ্ন পূরণে কাজ করছে এই শিক্ষা উপবৃত্তি কর্মসূচি। বদলে গেছে তাদের জীবন চলার গতি।

সমাজসেবা অধিদপ্তরের অতিরিক্ত পরিচালক ও শিক্ষা উপবৃত্তি কর্মসূচির পরিচালক সৈয়দা ফেরদাউস আক্তার বলেন, দরিদ্র, অবহেলিত ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে আর্থিক সহায়তার জন্য সরকারের বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্যে একটি হলো- প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি। রাষ্ট্রের সামগ্রিক উন্নয়ন নিশ্চিত করতে সরকার প্রতিবন্ধীদের সমাজের মূল ধারায় সম্পৃক্ত করতে চায়। তিনি জানান, দেশব্যাপী প্রতিবন্ধী শনাক্তকরণে জরিপ কাজ চলছে। ভবিষ্যতে উপকারভোগীর সংখ্যা ও বরাদ্দের পরিমাণ আরো বাড়বে।

প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের শিক্ষা উপবৃত্তি বাস্তবায়ন নীতিমালা ২০১৩ অনুযায়ী উপজেলা/শহর সমাজসেবা অফিস দেশজুড়ে উপবৃত্তি প্রদানের কাজে নিয়োজিত। সমাজসেবা অধিদপ্তরের জরিপভুক্ত, শনাক্তকৃত ও নিবন্ধিত এবং সরকার স্বীকৃত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী; যাদের পারিবারিক বার্ষিক গড় আয় সর্বোচ্চ ৩৬ হাজার টাকা তারাই প্রাথমিকভাবে উপবৃত্তির জন্য বিবেচিত হন। প্রতিবন্ধী বলতে জন্মগতভাবে/রোগাক্রান্ত হয়ে/দুর্ঘটনায় আহত হয়ে/অপচিকিৎসায়/অন্য কোনো কারণে দৃষ্টি, শারীরিক, শ্রবণ, বাক, বুদ্ধিসহ বহুমাত্রিক প্রতিবন্ধিতাকে বুঝানো হয়। উপবৃত্তির জন্য প্রার্থীকে নির্ধারিত ফরমে উপজেলা/শহর সমাজসেবা অফিসার বরাবরে আবেদন করতে হয়। নীতিমালা অনুসারে যাচাই বাছাই করার পর প্রতিবন্ধী শিক্ষা উপবৃত্তিভোগী নির্বাচন করা হয়। নির্বাচিত প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান বা অভিভাবককে অবহিত করে বৈধ অভিভাবকের নামে মাত্র ১০ টাকা দিয়ে ব্যাংক হিসাব খোলা হয় উপবৃত্তির টাকা তোলার জন্য। নতুন বরাদ্দ প্রাপ্তির তিন মাসের মধ্যে ভাতাভোগী নির্বাচন করে সাত দিনের মধ্যে নিয়মিত ভাতাভোগীর হিসাবে ভাতা স্থানান্তর করা হয় ।

সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন, আর্থিক সহায়তা প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের শিক্ষা কার্যক্রম নির্বিঘ্ন করতে সহায়তা করছে। তবে গ্রাম ও শহরের শিক্ষা ব্যয় বিবেচনায় নিয়ে আর্থিক সহায়তার পরিমাণ পুন:নির্ধারণ করলে শহরের প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীরা আরো বেশি উপকৃত হতেন। বর্তমানে সারাদেশে স্তরভিত্তিক উপবৃত্তির পরিমাণ সবার জন্য একই।

প্রতিবেদন : আনোয়ার রোজেন

## শিক্ষার আলোয় আলোকিত উপকূলের শিশুরা

জাতীয় পতাকার আকার রুমার মুখস্ত। শুধু রুমা নয়, আসমা, সালমাসহ নোয়াখালীর হাতিয়া উপজেলার নলের চরের এই শিক্ষা সহায়ক কেন্দ্রের ৩০জন শিক্ষার্থীর সবাই এখন এসব প্রশ্নের উত্তর জানে। পড়ালেখার পাশাপাশি নাচ, গান, ছড়া, কবিতাতেও সমান পারদর্শী। তারা সবাই প্রথম শ্রেণিতে পড়ে। উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ার স্বপ্ন দেখে এই শিশুরা।

রুমা আক্তার স্বপ্ন দেখে বড় হয়ে সে একজন শিক্ষক হবে। এই এলাকায় শিক্ষকের বড় অভাব। এই অভাবের জন্য তার অনেক বন্ধু, ভাইবোন পড়তে পারে না। তারা পড়া তৈরি করার মতো পর্যাপ্ত শিক্ষক পায় না। রুমা জানায়, এই স্কুলের পড়া শেষ করে সে হাতিয়া কলেজে পড়বে। তারপর গ্রামে ফিরে শিক্ষকতা করবে। ঢাকা মেডিকেল কলেজে পড়ে ডাক্তার হতে চায় রুবেল। রুবেল জানায়, এলাকায় কারো অসুখ হলে ডাক্তার পাওয়া যায় না। স্থানীয় শিশুরা অনেক রোগে ভোগে কিন্তু চিকিৎসা পায় সামান্য। তাই তার জীবনের লক্ষ্য ডাক্তার হওয়া। সালমা সুলতানা স্বপ্ন দেখে, একজন বড় সাংবাদিক হওয়ার। কারণ উপকূলীয় এই এলাকায় ঘূর্ণিঝড় সাইক্লোন হলে কমিউনিটি রেডিওর মাধ্যমে সাধারণ জনগণকে সচেতন করেন সাংবাদিকরা। ফলে অনেক মানুষের জীবন বাঁচে।

এই কেন্দ্রের শিক্ষক শাহীনা বেগম জানান, শিশু, প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির শিক্ষার্থীদের নিয়ে এই শিক্ষা সহায়ক কেন্দ্র চলছে।

পল্লীকর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) সূত্রে জানা যায়, শিশুদের ঝরে পড়া রোধ ও শিক্ষার আলোয় আলোকিত করতে উপকূল ও হাওরসহ দেশের প্রত্যন্ত এলাকায় ১৭টি জেলার ৮৫ হাজার পরিবার উন্নয়নে কাজ করছে পিকেএসএফ। বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার মাধ্যমে অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নে কাজ করছে তারা। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের সহায়ক কর্মসূচি হিসেবেই পরিচালনা করা হচ্ছে এ কার্যক্রম।

পিকেএসএফের উপব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মো. জসিম উদ্দিন বলেন, ২০১২ সালে এই শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হওয়ার সময় প্রত্যন্ত অঞ্চলে শিক্ষার্থী ঝরে পড়ার হার ছিল ১০০ জনে ১২ জন। আজ পাঁচ বছর পরে তা দাঁড়িয়েছে

দশমিক ৫ শতাংশ। অর্থাৎ ২০০ জন শিক্ষার্থীদের মধ্যে ১ জন ঝরে পরে। উপকূলের ৪টি ইউনিয়নে বর্তমানে ১৫০টি শিক্ষা সহায়ক কেন্দ্রের মাধ্যমে সাড়ে চার হাজার শিশু শিক্ষা পাচ্ছে। তিনি বলেন, সবাইকে এই কার্যক্রমের আওতায় আনতে আরো সহায়ক স্কুলের প্রয়োজন।

নলের চরের শিক্ষক শাহীনা জানান, স্কুল শেষ হলেই তারা এই সহায়ক স্কুলে আসেন। ৩টা থেকে ৫টা পর্যন্ত এখানে তারা জাতীয় সঙ্গীত, ব্যায়াম, নীতি-নৈতিকতা ও স্কুলের বাংলা, ইংরেজি ও গণিতের পাঠ নেন। এই স্কুলগুলোর প্রতি এলাকার মানুষের আগ্রহ অনেক বেশি। এলাকার অশিক্ষিত ও হতদরিদ্র বাবা-মা শিশুদের উপার্জনে না পাঠিয়ে স্কুলে পাঠাতে সচেতন হচ্ছেন। তিনি আরো জানান, এই স্কুলে পড়ানোর জন্য তাদের সব শিক্ষককে দুই দিনের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। যাতে তারা শিক্ষাকে শিশুদের কাছে আনন্দময় করে তুলতে পারেন এবং ঝরে পড়া কমে যায়।

নিঝুম দ্বীপের ১নং ওয়ার্ডে গিয়ে দেখা যায়, এই কেন্দ্রে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত শিশুরা পড়ছে। শাহনাজ, আঁখি, রাকিব সবাই উচ্চশিক্ষার স্বপ্নের কথা জানায়। রকিব বলে, বই পড়া আগে এত ভালো লাগত না। এখন ভাল লাগে। তাই প্রতিদিনই স্কুলে যাই।

বেসরকারি প্রতিষ্ঠান দ্বীপ উন্নয়ন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক মো. রফিকুল আলম জানান, তারা ৯০টি শিক্ষা সহায়ক কেন্দ্র পরিচালনা করেন। পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত পড়তে একজন শিশুর ১২ বছর পর্যন্ত সময় লাগে। হতদরিদ্র দ্বীপবাসীর কাছে ১২ বছরের শিশু উপার্জনক্ষম। তাই তারা শিশুদের আয়ের সঙ্গে যুক্ত করে।

চিংড়ির ঘেরে কাজ নিঝুম দ্বীপের শিশুদের প্রধান পেশা। চিংড়ির পোনা ধরে এই শিশুরা ৩০ থেকে ১০০ টাকা পর্যন্ত আয় করে। অনেক শিশু জেলে নৌকায় চলে যায়। এমন প্রতিবন্ধকতা ঠেলে চরের শিশুরা স্কুলে পড়া শুরু করেছে।

পিকেএসএফ-এর উপব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মো. জসিম উদ্দিন বলেন, সমন্বিত উন্নয়নকে কেন্দ্র করে পিকেএসএফ 'সমৃদ্ধি' কার্যক্রম পরিচালনা করছে। সারাদেশে তাদের ৫ হাজার ২০০টি শিক্ষা সহায়ক স্কুল আছে। উপকূলে আছে ১৫০টি। প্রতিটি কেন্দ্রে ৩০ জনকে ভর্তি করনো হয়। তারা মনে করেন, এর চেয়ে বেশি হলে শিক্ষার মান হ্রাস পাবে। তারা এলাকার ঝরে পড়া শিক্ষার্থীর হার ১২ শতাংশ থেকে দশমিক ৫ শতাংশে নামিয়ে আনতে পেরেছেন।

পল্লীকর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন-এর চেয়ারম্যান বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ড. কাজী খলীকুজ্জামান আহমদ প্রতিবেদককে বলেন, আমরা শিক্ষা থেকে শিশুদের ঝরে পড়তে দেই না। এই শিশুদের বাড়িতে পড়ার অনুকূল পরিবেশ নেই। তাই তারা স্কুলে গিয়ে পড়া পারে না। প্রতিদিন বাড়ির কাজ দিতে না পেরে একসময় ওরা লজ্জায় স্কুল ছাড়ে। তাই সহায়ক স্কুলগুলো স্কুলের পড়া তৈরি করে দেয়। এখন স্কুল ছাড়া তো দূরের কথা তারাই ক্লাসে প্রথম থেকে দশম স্থান দখল করে।

তিনি বলেন, ২১টি ইউনিয়নে এই কার্যক্রম পরীক্ষামূলকভাবে শুরু করা হয়েছিল। বর্তমানে এই কার্যক্রম ১৫০টি ইউনিয়নে চলছে। পর্যায়ক্রমে সবাইকে এর আওতায় নিয়ে আসা হবে।

প্রতিবেদন : রাবেয়া বেবী

## ডিজিটাল উপস্থিতি রংপুর পিএলএসসিকে শ্রেষ্ঠত্বের আসন দিয়েছে

রংপুর পুলিশ লাইন স্কুল অ্যান্ড কলেজে (পিএলএসসি) ছাত্র, শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য ডিজিটাল উপস্থিতির ব্যবস্থা ইতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি করেছে।

প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ প্রফেসর ড. কে এম জালাল উদ্দিন আকবর বলেন, '২০১১ সালে দেশে প্রথমবারের মতো আমরা ডিজিটাল উপস্থিতি রেকর্ড ব্যবস্থা চালু করে ডিজিটাল তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) গ্রহণ করি।'

নগরীর স্বনামধন্য এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জুনিয়র ওয়ান থেকে ক্লাস ফাইভ পর্যন্ত প্রাথমিক শাখায় ১ হাজার ৫০০ এবং ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত ৩ হাজার ৫০০ জন শিক্ষার্থীসহ মোট ৫ হাজার শিক্ষার্থী অধ্যয়ন করছে।

ডিজিটাল উপস্থিতি রেকর্ড ব্যবস্থার কল্যাণে অভিভাবকরা আরএফ আইডি কার্ড ব্যবহার করে। তাদের সন্তান শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে এসএমএস-এর মাধ্যমে তা জানতে পারেন। আবার অনুপস্থিত থাকলেও সঙ্গে সঙ্গে এসএমএস-এর মাধ্যমে তা জানিয়ে দেয়া হয়। এর ফলে স্কুলে ড্রপ আউটের হারও শূন্যের কোঠায় নেমে এসেছে উল্লেখ করে জালাল বলেন, 'এই সিস্টেম ব্যবহারের ফলে শতভাগ উপস্থিতি নিশ্চিত হয়েছে। কারণ, শিক্ষার্থীদের অনুপস্থিতির জন্য বা তাদের ক্লাসে বিলম্বে উপস্থিতির জন্য জরিমানা দিতে হয়।

এই পদ্ধতি ব্যবহারের বহু-মাত্রিক ইতিবাচক প্রভাবের ফলে প্রতিষ্ঠানটি প্রশংসনীয় একাডেমিক সাফল্য অর্জন করেছে। ২০১২ সালে এইচএসসি পরীক্ষায় দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ডে প্রথম স্থান অর্জন এবং সর্বশেষ এসএসসি পরীক্ষায়ও গৌরবজনক রেজাল্ট করেছে।

২০১১ সালের শুরুতে রং সফট আইসিটি সার্ভিসেস এই সিস্টেম চালানোর জন্য স্কুল কর্তৃপক্ষকে সহায়তা করে। তখন শিক্ষার্থী, শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা তাদের উপস্থিতি স্বয়ংক্রিয়ভাবে রেজিস্টার করতে পাঞ্চিং মেশিনে তাদের পরিচয়পত্র পাঞ্চ করত।

ড. জালাল বলেন, 'উপস্থিতি রেজিস্টার ব্যবস্থাটি উন্নয়নের জন্য ক্রমাগত প্রচেষ্টার অংশ। পরবর্তীতে আমরা শিশুসহ সব বয়সের শিক্ষার্থীদের জন্য

ব্যবস্থাটি সহজতর করতে আরো একটি বেসরকারি সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট কোম্পানিকে নিয়োগ দেই।'

প্রিন্সিপাল বলেন, পরবর্তীতে শিক্ষার্থী, শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ঢাকা সফটের মাধ্যমে রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি (আরএফ) আইডেন্টিটি কার্ড (আইডি) প্রদানের পর এখন উপস্থিতি রেজিস্টার ব্যবস্থা খুবই সহজ হয়ে গেছে। এখন প্রতিষ্ঠানের ভেতরে অনেক পয়েন্টে রক্ষিত ছোট আকারের টাইম অ্যাটেনডেন্ট ডিভাইসের সামনে যে কেউ আরএফ আইডি কার্ড দেখালেই স্বয়ংক্রিয়ভাবে উপস্থিতি রেজিস্ট্রেশন হয়ে যায়।

প্রতিষ্ঠানের ভাইস-প্রিন্সিপাল (অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ) কাজীউল ইসলামের নেতৃত্বে চার সদস্যের অটোমেটিক স্কুল অ্যাটেনডেন্স সিস্টেম (এএসএএস) কমিটির অভিভাবকদের সঙ্গে যোগাযোগ করাসহ এই সিস্টেম মনিটরিং করছেন।

রংপুর পিএলসিসি'র গভর্নিং বডির সভাপতি এবং পুলিশ সুপার মিজানুর রহমান বলেন, এই ব্যবস্থাটির ফলে কিশোর শিক্ষার্থীদের ক্লাসে অনুপস্থিত থাকার অভ্যাস, এখানে-সেখানে যাওয়া, মাদকাসক্ত বা জঙ্গিসহ খারাপ সঙ্গে মেশার সম্ভবনা বন্ধ হয়েছে।

শিক্ষার মান নিশ্চিত করা এবং একাডেমিক ফলাফলের উন্নতির পাশাপাশি নারীদের নিরাপত্তার ব্যবস্থাও করা হয়েছে। কারণ এখন অভিভাবকরা সবসময় তাদের ছেলেমেয়েদের অবস্থান সম্পর্কে অবগত রয়েছেন।

তিনি দেশের সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ডিজিটাল উপস্থিতি ব্যবস্থা চালু করার পরামর্শ দেন। তিনি বলেন, কেবল একাডেমিক উৎকর্ষতা উন্নয়নের জন্য নয়, ছাত্রজীবন থেকেই শিক্ষার্থীদের জীবন ব্যবস্থাপনার পাশাপাশি ভালো নৈতিক চরিত্র এবং অভ্যাস গড়ে তোলার জন্যও এটি প্রয়োজন।

বাসসের সঙ্গে আলাপকালে নবম শ্রেণির শিক্ষার্থী মায়শা আলম দিয়া, অষ্টম শ্রেণির মুসফিক আহমেদ অনিক, সপ্তম শ্রেণির ফারিয়া জামান উপমা এবং ষষ্ঠ শ্রেণির আফরিন নাহার জিতু বলে, ডিজিটাল উপস্থিতি ব্যবস্থার ফলে তাদের জীবনধারা আরো সুবিন্যস্ত ও জবাবদিহিমূলক হয়েছে।

প্রতিবেদন : মামুন ইসলাম, অনুবাদ : রুহুল গণি জ্যোতি

## Education sector sees significant development in major areas

The country's education sector witnessed significant development in major areas driven by a modern and time-befitting education policy that the government started implementating in 2009.

The areas include basic resources for education, digitisation of classrooms and textbooks, curriculum reform, introduction of creative question paper, infrastructure development and modernisation of madrasa education

According to a publication of the education ministry, the development in major areas of the education sector was a result of the execution of the "Education Policy 2000" that the Awami League government framed in 2000.

The BNP-led government scrapped the policy when it came to power in 2001, but Awami League-led government revived the policy and started its implementation in 2009 when the party was voted to power again.

"The major objective of the policy is to help create a new generation, enriched in education, knowledge and skills besides having high ethical standard, respect to the people and strong commitment to the nation," the education ministry paper said. The paper noted that the government has started distributing free textbooks to primary school students on the first day of January since 2010, ensuring that none of the eligible children is missed out of basic resources.

Earlier, only 40 per cent of the students were given free textbooks when the rest 60 per cent had to get old books or buy new ones those were not available until March or April.

For ensuring availability of textbooks for all students, the government in 2010 introduced e-books for pre-primary, primary and secondary education and uploaded those on website.

In order to expand ICT education, Sheikh Russel Digital Lab and Multimedia Classroom have been established in 23,331 secondary schools and 15,000 primary schools across the country.

Until 2013, the school education was based on textbooks those were written in 1995. The education ministry with engaging over 1400 educationists, researchers and teachers developed a modern and time-befitting curriculum.

The government introduced creative question papers in secondary and higher secondary education, which compel students to go deep into a subject to answer the questions.

For expanding and ensuring education for all, the government has started construction of new buildings for 1,500 non-government colleges, 3,000 non-government schools and 1,000 non-government madrasas.

Under the project for improving quality of education, the government in 2011 began setting up of a computer lab, a well-equipped examination hall, a dormitory and a science lab at one post-graduate college in every district.

In the secondary level, Upazila ICT Training and Resource Centres have been established, and 295 non-government schools have been transformed into model schools in 315 upazilas having no government schools.

Almost every village of the country now has a government primary school after nationalisation of 26,193 more primary schools in recent years.

Every year, around 38 lakh students from 6th grade to bachelor degree (pass) and equivalent level have been provided with stipends and other assistances amounting over Taka 675 crore while stipend provided to 29 lakh vulnerable students so far so they could afford basic education.

Education Minister Nurul Islam Nahid in May 2017 said that the government this year would provide stipends to six lakh students, especially to the girls who cannot continue the study due to poverty.

For modernising madrasah education, the education ministry started construction of new building for around 1000 madrasas at a cost of Taka 738 crore.

Vocational courses have been introduced in 100 madrasas alongside setting up of computer labs and digital classrooms.

The development in major areas of education resulted in increase in school enrolment, girl education, adult literacy and decrease in dropout rate.

According to a report of Bangladesh Bureau of Educational Information and Statistics (Banbeis), the enrollment of students in secondary level in 2016 raised to 67.84 per cent, of which girls were 73.10 per cent and boys were 63.85 per cent.

The dropout rate in primary level lowered to 19.2 percent in 2016 from 20.4 per cent in 2015. Similarly, the rate in secondary level fell to 38.3 per cent in 2016 from 40.29 in 2015 and in higher secondary level it dropped to 20.08 per cent in 2016.

According to the report, girls comprise 51.9 per cent of the total number of students at secondary level, which is the highest among the E-9 countries. The other E-9 countries are Brazil, China, Egypt, India, Indonesia, Mexico, Nigeria and Pakistan.

"Bangladesh achieved gender equity in primary and secondary education well ahead of the 2015 Millennium Development Goal", said a World Bank report.

The adult literacy rate in the country also hit a 12-year high of 72.3 per cent last year, according to a report of the Bangladesh Bureau of Statistics.

Report: Ashequn Nabi Chowdhury

## Digitised education system starts bringing in great fruit

Setting up multimedia classrooms, providing training to teachers to create digital content, converting all available textbooks into e-books and publishing public exam results online are some of the significant steps of the government in making the education system digital.

From its beginning in May 20, 2012, with Prime Minister Sheikh Hasina launching the multimedia classrooms at 1,000 schools, the initiative has started bringing in phenomenal improvement towards ensuring quality education.

"A total of 23,331 secondary and higher secondary schools and 10,000 primary schools now have multimedia classrooms where nearly 1 lakh 67 thousand trained teachers provide high quality education to around 10 million students," said Faruque Ahmed, e-Learning Specialist of Access to Information (a2i).

The a2i of the Prime Minister's Office designed the programme to make teaching and learning more effective, interactive and enjoyable for both students and teachers.

It has followed a 3-pronged approach to remodel education through establishing multimedia classrooms in secondary schools, training teachers on creating digital content and making electronic versions of textbooks available in primary and secondary levels, including technical, vocational, madrasas and other institutions.

The a2i has also introduced multimedia classrooms using one laptop with internet connection and a multimedia projector, making the initiative much cheaper than a full-fledged computer lab.

Faruque, also the acting team head of the education wing at a2i, said that students of around 5,500 madrasas are now enjoying multimedia classroom facilities.

“We hope more schools and madrasas would develop multimedia classrooms by themselves. If a school develops one multimedia classroom at their own initiative, the government will help setup two multimedia classrooms in rural area and one in urban area,” Ahmed said.

He urged well-off people particularly the former students of the schools concerned to join the initiatives for expediting the digitalising process for ending disparity in education.

“Good teachers hardly want to go to the remote areas, resulting in a lack of quality education in those areas, but things have started to change,” said Naimuzzaman Bhuiyan, local development specialist and team head of communications and partnership wing of a2i.

He said that now a student in Panchagarh is getting the same education as the ones sitting in a famous school in the capital city as the teachers are getting the similar digital content from the Teachers’ Portal_ a platform for necessary digital contents for primary, secondary and higher secondary teachers.

Teachers of schools, vocational institutions and madrasas can be the members of this portal. They are also allowed to develop and upload digital contents as it is a collaboration and co-creation platform for ensuring quality digital education.

The National Curriculum and Textbook Board (NCTB) partnered with a2i, has made e-version of all the text books of primary and secondary levels and uploaded those to on a website (http://www.ebook.gov.bd).

Prime Minister Sheikh Hasina on April 24, 2011, launched e-book site. Students, guardians, teachers, researchers and anyone can read the e-books on the site from anywhere and can even download for later use. Anyone can read those e-books on their desktop, laptop or tablet computers, e-book readers or mobile phones.

Mahmudul Hasan's daughter Nafisa is a student of class-eight in Bangladesh International School in Jeddah, Saudi Arabia, and found the e-book very handy in helping his daughter preparing her home work.

"It is a great decision of introducing the site and all the expatriate students and their parents like us are immensely benefitting from the facility," Hasan said.

The government has also taken different projects to bring the differently able children to the mainstream of the society. One such project is to distribute multimedia players containing multimedia digital talking books to schools for the visually impaired students. Vashkar Bhattacharjee, a visually impired person, invented the software for the talking books. Any students with access to computers, tablets or android operated phones can play this software, listen or read for free.

According to a2i, there are 2.5 lakh visually challenged people in this country, many of whom are studying at different educational institutes.

“We have already converted all textbooks up to grade 10 to multimedia talking books,” said a2i policy adviser Anir Chowdhury.

Director General of Department of Social Services (DSS) Gazi Md Nurul Kabir said, multimedia talking books will play a vital role in our efforts to help settle visually impaired students in the mainstream of the society.

From 2009, people are getting results of exams like SSC, HSC, JSC and PSC in their mobile phones through SMS. From 2010, they are getting it online, leaving the days far behind when people used to stand in long queues, only to have a glimpse at the result of their loved ones.

Since 2009, students are also being able to apply for admission in 32 public universities and 400 colleges.

Report: Mahmudul Hassan

## Physically challenged students fulfilling dreams on stipends

Physical disabilities, poverty and various social impediments could not stop Raihan, Pritom and Bristi to achieve their goals, thanks to the stipend introduced by the government for the physically challenged students.

The three energetic, hard working and visionary students have become inspirations for the young people by continuing their studies, leaving behind the legacy of abject poverty and their physical disabilities, with support of the stipend, introduced nine years ago.

Raihan Mia (22), a final year student of Pakundia Degree College in Kishoreganj district, became physically disabled at the age of one year and six months after suffering from polio.

He lost his father prior to his secondary school cretificate examination. Fourth among his six brothers and sisters, Raihan passed SSC in 2009 and later was admitted Jangalia High School and College.

He had to continue his studies and run his family as well with his little earnings which came from his private tuition. His fate started changing when the government introduced stipend programme for the physically challenged students in 2010.

“It would be impossible for me to continue my studies and run my family if I could not get the stipend,” said Raihan.

Physically challenged Pritom Chandra Pal, a class five student of Government Science College and High School, has been grown up in a poverty-stricken family with immature fingers in both of his hands and legs.

His father, a medicine store staff, admitted Pritom into a local school since he has no financial ability to get his kid

admit into specialised educational institutions set up for the physically challenged children.

However Pritom's father Samir Chandra Pal contacted the social welfare department and included his son in the education stipend progartmme. Pritom is now getting Taka 500 monthly as education stipend from the government to continue his studies. Now, he is not worried about his studies.

Brishti Aktar, an ill-fated teenager, lost her right hand as her father at one stage of anger hacked her by a machete when she was 14 years old.

Her ill-tempered father later divorced Brishti's mother and tied knot with another woman. Then, the courageous Brishti took a vow to continue her study for minimising sufferings of her mother. But, her mother did not have the ability to admit her daughter into school due to financial crisis. When the government introduced the stipend for the disabled children, Brishti got admitted into the school to materialise her dream of establishing herself in society.

Now, she is a class 10 student of Hosenpur Pilot Girls' High School. Under the government's education stipend programme, she is now getting Taka 600 per month to meet her educational expenses.

"We are happy with the results of Brishti since she is doing well in her examinations like other physically-sound students despite her physical disabilities," said Zinnat Aktar, headmistress of Hosenpur Pilot Girls High School.

Like Brishti, Raihan and Pritom, the government's education stipend programme is playing an important role in establishing rights and materialising dreams of hundreds of physically challenged, poor, distressed children and youths across the country.

The programme was launched to establish constitutional rights of the poor and physically challenged children and youths. Initially, 12,209 physically disabled students have been brought under the programme through the government's Social Welfare Department.

According to Social Welfare Department, a total of 13,000 students were benefitted by the programme in 2008-2009 financial year when annual allocation for the project was Taka six crore.

In 2016-17 financial year, the number of beneficiaries rose to 70,000 when an allocation of Taka nearly 48 crore was made available for the project. Statistic shows that the number of beneficiaries of the project was increased five times in the last nine months when allocation rose to eight times.

Syeda Ferdous Aktar, director of the Education Stipend Programme, said the programmme has been introduced to include the physically challenged youths in the mainstream of society.

"We are conducting a countrywide survey aimed at bringing all physically challenged poor students under the programme," she said adding the number of beneficiaries and allocation in the project would be raised in future to fulfil the objective of the programme.

According to Education Stipend Implementation Policy-2013, the physically challenged students, who are, studying in government recognised educational institutions and whose average family income is no more than Taka 36,000 annually, would be primarily selected for the stipend.

According to the policy, a disabled student has to apply to the upazila or district social welfare officer in a prescribed form.

Following scrutiny of the applications, the beneficiaries are selected. Later, the beneficiaries have to open a bank account

depositing Taka 10 only in the name of their legitimate guardians to receive the stipend money.

Talking to this correspondent, many guardians of the disabled students said that the education stipend for physically challenged students has been playing a pivotal role to provide hassle-free education to the disabled students.

They however, urged the government to set the stipend amount considering education expenses in rural and urban areas. The amount in urban areas should be more than that of rural area considering higher cost of education in urban areas. The amount of stipend is same for urban and rural areas.

Report: Anwar Rosen, Translation: Aminul Islam Mirja

## Education enlightens coastal children

The size of the national flag is well-memorised by Ruma. Not only Ruma, all of students of the Education Support Centre of Naler Char under Hatia upazila in Noakhali now know answers to these questions. The children, who are also good in dance, song, rhyme and poetry, are students of class One.

Ruma's dream is becoming a teacher. She said after completing education in this school, she will study at Hatia College. Then she will take teaching as profession after returning to her own village.

Rubel wants to be a doctor after studying at Dhaka Medical College as doctors are not available in his area. Many local children suffer from diseases, but they receive a little treatment. So Rubel's aim is to become a physician.

Salma dreams of becoming a journalist because journalists save life by alerting the people about ensuing cyclones through community radio.

Shahina Begum, a teacher of the Education Support Centre, said the centre is running for the students of play group to class two.

Palli Karma Sahayak Foundation (PKSF) has been working for the development of 85,000 families in 17 districts including in haor and coastal areas to check dropout of the children and enlighten them in education.

PKSF, with some other non-government organisations (NGOs), is running a "supportive programme" to achieve sustainable development goals (SDGs), set out for education.

PKSF Deputy Managing Director Dr Md. Jashim Uddin said the rate of dropout students in remote areas was 12 per cent

when the programme was launched in 2012. But, the rate declined to 0.5 per cent after five years meaning that now only one student drops out among 200 students. As many as 4500 children are getting education through 150 education support centres of four coastal unions.

Shahina Begum said the children come to the support centres after school. They get lesson on national anthem, physical exercise, moral education and on Bengali, English and mathematics. The interest of the local people in these centres is much more. Illiterate and ultra poor parents are becoming aware of sending their children to school instead of earning through them. She also said all teachers are imparted two-day training for teaching in these schools so that they make education joyful for the children and eventually can check dropout.

While visiting a support centre in Nijhum Dwip, many of the children there expressed their desire to pursue higher education.

A student, Raquib, said he didn't feel so good earlier in reading books. But now he goes to school every day as he enjoys study.

Md Rafiqul Alam, executive director of Dwip Unnayon Sangstha, a non-government organisation, said currently they are running 90 education support centres. A child needs 12 years to complete study up to class five. Ultra poor island people consider the children, aged 12 years, are capable of earning. So they engage such children in work. He said working in shrimp enclosures is the main profession of the children in the area.

These children earn Tk 30 to Tk 100 a day by catching shrimp fry. Many children go to fishing boats. However

many children of char areas have started going to schools, Alam said.

PKSF Deputy Managing Director Dr Jashim Uddin said the foundation has been running “Samriddhi” programme for coordinated development. There are 5,200 education support centres across the country. Of them, 150 are in coastal areas. Thirty students are enrolled in each centre.

He thinks that the quality of education would decline if more than 30 students are admitted to a centre.

“We don’t let any child to be dropped out. There is no favourable environment to study at home of these children,” PKSF Chairman Qazi Kholiquzzaman Ahmad said.

He said such children can’t get lesson properly in their class. They leave the school feeling shame after being failed to do homework every day. So support centres prepare school lessons for the children and that’s why they secure top 10 positions in their class.

Dr Ahmed said this programme was launched in 21 unions on experimental basis and later in 150 unions.

“All children will be brought under the programme in phases,” he said.

Report: Rabeya Baby , Translation: A Z M Sajjad Hossain Sabuj

## Digital attendance helps school to achieve academic excellence in Rangpur

The digital attendance system for students, teachers, officials and employees has brought significant impact on academic activities and management of a school in the Rangpur divisional city.

Rangpur Police Line School and College (PLSC), a school which piloted and subsequently implemented fully a digital attendance system, set a replicable example of digitisation of school activities for attaining academic excellence.

"We launched the digital attendance system for the first time in the country in 2011, adopting information and communication technologies (ICT) for managing day to day and other major activities of the school," said Principal of the school Professor Dr KM Jalal Uddin Akbar.

A total of 5,000 students, including 1,500 in the primary from Junior one to class five and 3,500 from class six to class twelve, are studying in the educational institution, which has already earned a good name for its standard of education. The digital attendance system automatically sends SMS to the guardians as soon as their children enter the school using their digital attendance cards. Similarly, the system sends SMS to the guardians concerned if their children do not come to school or remain absent.

"The system has ensured cent per cent attendance of the students in classes as they are fined for absence or delay in attaining classes without valid reasons," Dr Jalal said, adding that school dropout rate has also reduced to almost zero level.

Besides the students' attendance, the system has also helped the school to earn academic excellence, taking the school to the first position in Dinajpur Education Board in the HSC examinations in 2016.

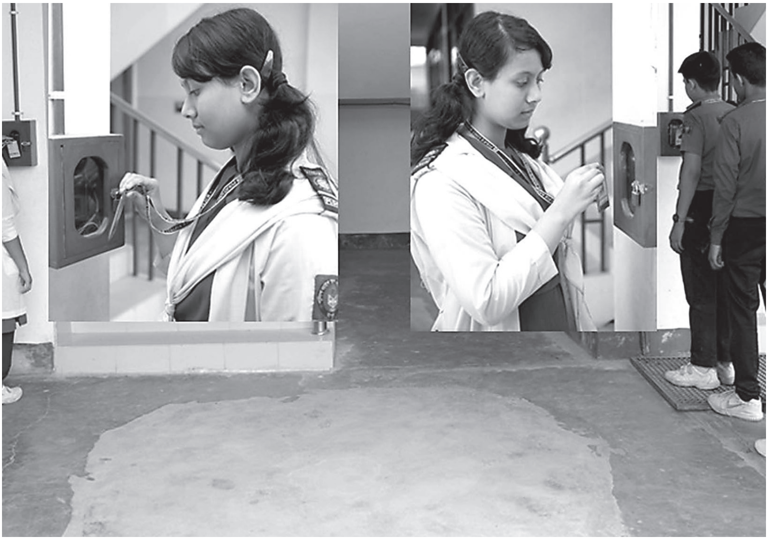

RangSoft ICT Services initially provided assistance to install and run the system when the students, teachers, officials and employees had to punch their identity cards in the punching machine to register their presence automatically.

"As a part of our continuous efforts to upgrade the attendance system, we later, appointed another private sector software development company, to make the system more user-friendly for the students of all ages, including minor ones," Dr Jalal added.

Report: Mamun Islam

বিশেষ উদ্যোগ ৫

# নারীর ক্ষমতায়ন

"শেখ হাসিনার প্রতিশ্রুতি, নারী জাগরণে অগ্রগতি"

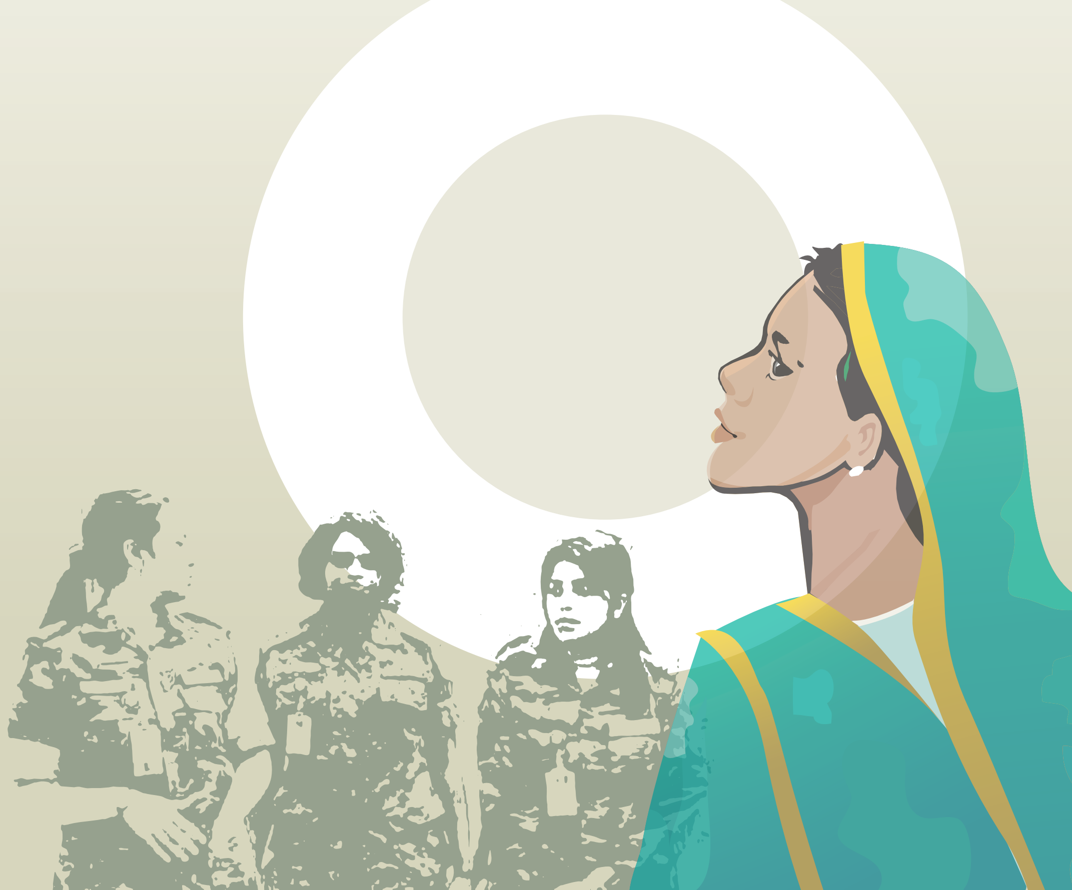

## নারীর ক্ষমতায়ন


| | |
|---|---|
| তথ্য আপার কাছ থেকে গ্রামীণ নারীরা নিচ্ছে ডিজিটাল সেবা | ১১৯ |
| নারী ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের স্বপ্ন পূরণের ঠিকানা জয়িতা | ১২১ |
| কম্পিউটার প্রশিক্ষণ নিয়ে নারীরা স্বাবলম্বী  হচ্ছে | ১২৪ |
| জয়িতা পুরস্কার ২০১৭ অর্জন করলেন রাজশাহীর সুবিধাবঞ্চিত পাঁচ নারী উদ্যোক্তা | ১২৫ |
| টেকসই উন্নয়নের জন্য চাই লিঙ্গ বৈষম্যহীন সমাজ | ১২৭ |
| `Tathya Apa' takes digital services to rural women | 130 |
| Joyeeta for fulfilling dreams of women small entrepreneurs | 133 |
| Computer training expediting women empowerment | 136 |
| Underprivileged women marching forward in Rajshahi | 138 |
| Women breaking glass ceiling on rise | 142 |

সর্বক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি এবং নারীর প্রতি বৈষম্য দূর করার জন্য নারীর ক্ষমতায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। নারীর সার্বিক উন্নয়ন নিশ্চিত করতে প্রণয়ন করা হয়েছে "জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালা ২০১১"। কৃষিকাজ থেকে শুরু করে এভারেস্ট পর্বতশৃঙ্গে নারীরা উড়িয়েছে বাংলাদেশের বিজয় পতাকা। নারী জনশক্তি নির্ভর তৈরি পোশাক রফতানিতে বাংলাদেশ এখন বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম দেশ। নারীর ক্ষমতায়নে প্রধানমন্ত্রীর গৃহীত কর্মসূচি দেশে নারীদের দৃঢ় সামাজিক অবস্থান তৈরি করেছে।

অর্জন

- নারীর ক্ষমতায়ন ও নারী শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টিতে নারী পুনর্বাসন বোর্ড এবং জাতীয় মহিলা সংস্থা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।
- নারী উদ্যোক্তা উন্নয়নে ২০১১ সালে জয়িতা ফাউন্ডেশন গড়ে তোলা হয়েছে।
- মহিলা হোস্টেল নির্মাণ, নারী উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণসহ আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে।
- নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ আইন ২০১৫ প্রণয়ন করা হয়েছে।
- পাসপোর্টে মায়ের নাম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
- দেশব্যাপী ১২ হাজার ৯৫৬টি পল্লী মাতৃস্বাস্থ্য কেন্দ্রের মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিত নারীদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য , পুষ্টি, মা ও শিশুর যত্নসহ যাবতীয় বিষয়ে উদ্ধুকরণ ও সুদমুক্ত ক্ষুদ্র ঋণ দেয়া হচ্ছে।
- বেতনসহ মাতৃত্বকালীন ছুটি ৪ মাস থেকে ৬ মাসে উন্নীত করা হয়েছে এবং দরিদ্র ও গর্ভবতী মায়েদের মাতৃত্বকালীন ভাতা দেয়া হচ্ছে।
- সরকারি কর্মকাণ্ডে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে ৪০টি মন্ত্রণালয়ে জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট তৈরি হচ্ছে।
- জেলাভিত্তিক মহিলা কম্পিউটার প্রশিক্ষণ প্রকল্পের আওতায় এ পর্যন্ত ১৩ হাজার ৪৩২ জন শিক্ষিত বেকার নারীকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।
- নারীর দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে এ পর্যন্ত প্রায় ১৯ লাখ নারীকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।
- আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হওয়া, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রায় ১১ হাজার কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।
- নারীর ক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রায় ১৫৪ কোটি টাকা বিনিয়োগের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে।
- নারীর ক্ষমতায়নে আত্মকর্মসংস্থান কার্যক্রমের (IGA) আওতায় বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণের জন্য ট্রেড ব্যাংক তৈরি করা হয়েছে।

- ভালনারেবল গ্রুপ ডেভেলপমেন্টের (VGD) আওতায় ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ১০ লাখ উপকারভোগীকে ২৪ মাসের জন্য ৩০ কেজি চাল প্রদান করা হয়েছে।
- শহরাঞ্চলে কর্মজীবী ল্যাকটেটিং ভাতা-এর আওতায় ২০১৬-১৭ অর্থবছর থেকে ১ লাখ ৮০ হাজার ৩০০ জন উপকারভোগীর মধ্য থেকে জেলা পর্যায়ে ৭১ হাজার ১৯০ জন উপকারভোগীকে মাসিক মাথাপিছু ৫০০ টাকা হারে প্রায় ২২ কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে।
- নারীদের আত্মকর্মসংস্থানের জন্য ক্ষুদ্রঋণ তহবিলের আওতায় দেশের ৬৪টি জেলার ৪৮৮টি উপজেলায় ঘূর্ণায়মান প্রক্রিয়ায় প্রায় ১০৯ কোটি টাকা অবহেলিত ও সুবিধাবঞ্চিত মহিলাদের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে।

## ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

- নারীর ক্ষমতায়নে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ১৮.২০ লাখ নারীর প্রশিক্ষণ প্রদান।
- সরকারি চাকরিতে নারী কর্মকর্তার হার ২০২০ সাল নাগাদ ২৫ শতাংশে উন্নীতকরণ।
- ২০ থেকে ২৪ বছরের নারীদের সাক্ষরতার হার শতভাগে উন্নীতকরণ।
- ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের আওতায় ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ২৫.৭৫ কোটি টাকা ঘূর্ণায়মান প্রক্রিয়ায় ৫৩ হাজার ৮০৩ জন অবহেলিত ও সুবিধাবঞ্চিত নারীর মাঝে ৬ হাজার ২৫৫ কোটি টাকা ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ।
- নগর ভিত্তিক প্রান্তিক মহিলা উন্নয়ন প্রকল্পের (২য় পর্যায়) আওতায় ২০২০ সালের মধ্যে ৪৫ হাজার শহরভিত্তিক দরিদ্র, অসহায় এবং স্বল্প আয়ের নারীকে দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ প্রদান।
- পরবর্তী ৫ বছরে ২৮ হাজার ৭০ জন শিক্ষিত বেকার নারীকে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে তাদের ক্ষমতায়নে আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।
- জুন-২০২০ সাল পর্যন্ত আরো ৫৬ হাজার ১০০ জন নারীকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে উন্নয়ন এবং ক্ষমতায়নের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

- গ্রামীণ নারীদের নেতৃত্ব সৃষ্টি করে স্থানীয় ও জাতীয় নির্বাচনে অংশগ্রহণের জন্য উদ্ধুদ্ধ করা হচ্ছে।
- ট্রেড ব্যাংকের প্রশিক্ষণ ট্রেডসমূহের ও ২০১৭-২০১৮ অর্থবছর থেকে ৬৪টি জেলার ৪২৬টি উপজেলায় নির্বাচিত নারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।

- ভিজিএফ-এর আওতায় ২০১৭-১৮ অর্থবছরে আরো ১০ লাখ উপকারভোগীকে সুবিধা প্রদান করা হবে।
- ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ৬ লাখ দরিদ্র ও গর্ভবতী মাকে মাতৃত্বকালীন ভাতা প্রদান করা হবে।
- শহরাঞ্চলে কর্মজীবী ল্যাকটেটিং ভাতার আওতায় ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ২ লাখ নতুন উপকারভোগীকে মাসিক ৫০০ টাকা হারে ভাতা প্রদান করা হবে।

ছবি ও তথ্য : চলচিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর

## তথ্য আপার কাছ থেকে গ্রামীণ নারীরা নিচ্ছে ডিজিটাল সেবা

মাত্র কয়েক বছর আগেও ইন্টারনেট, কম্পিউটার, ই-মেইল কিংবা ভিডিও কনফারেন্সের মতো সেবাগুলোর সঙ্গে যে সব নারীর পরিচয় ছিল না, তারাই এখন যোগাযোগের এই ডিজিটাল সেবাগুলো গ্রহণ করছেন।

এই উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনের কৃতিত্ব তথ্য আপার। গ্রামীণ নারীরা তথ্য কেন্দ্রে তথ্য আপার কাছ থেকে এসব সুযোগ-সুবিধা পেয়েছেন। ডিজিটাল তথ্য কেন্দ্র থেকে তথ্য আপারা গ্রামীণ নারীদের যে সেবাগুলো দিচ্ছেন চাকরির আবেদন, স্বাস্থ্য সমস্যা, উৎপাদিত পণ্যের বাজার, জমিতে উপযুক্ত সার ও কীটনাশকের ব্যবহার নিশ্চিতকরণ কিংবা নির্যাতিত হলে কোথায় গেলে পাওয়া যাবে সঠিক সহায়তা সে বিষয়ক তথ্যসমূহ।

প্রতিটি উপজেলায় একটি তথ্য কেন্দ্রে তিনজন তথ্য আপা সেবা প্রদান করছেন। এর মধ্যে একজন তথ্য আপা তথ্য কেন্দ্রে বসেন। সেখানে বসেই নারীদের বিভিন্ন তথ্য দেন। বাকি দু'জন ল্যাপটপ নিয়ে বাড়ি বাড়ি যান। তথ্য আপা প্রকল্পের অন্যতম প্রধান সুবিধা হলো আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার।

প্রকল্পের আওতায় জাতীয় মহিলা সংস্থার মূল ভবনে রয়েছে একটি কল সেন্টার। কল সেন্টারে ১০৯২২ নম্বরে ফোন দিয়ে দেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে যে কোনো নারী ছয়টি বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের তথ্য সেবা পাচ্ছেন। ১৩টি তথ্য কেন্দ্রে মোট ৩৯ জন তথ্য আপার কাছ থেকে ২০১৩-২০১৭ পর্যন্ত দুই লাখ ৭০ হাজার নারী সেবা নিয়েছেন।

যেমন, গোপালগঞ্জের কোটালিপাড়ার গৃহিণী নিলুফার বেগম (৪৫) স্তনের কিছু অস্বাভাবিকতা নিয়ে তার মনে ভয় ছিল। তিনি ভেবেছিলেন তার স্তন ক্যান্সার হয়েছে। লজ্জায় বিষয়টি প্রথমে কাউকে জানাতে চাননি। পরে বাড়িতে যেদিন তথ্য আপা এলেন সেদিন বিষয়টি তাকে জানালেন নিলুফার। তথ্য আপা তাৎক্ষণিকভাবে ল্যাপটপে ইন্টারনেট সচল করলেন। ওয়েবসাইট ঘেঁটে ছবিসহ তাকে স্তন পরীক্ষার বিষয়গুলো দেখালেন। স্তন ক্যান্সার হলে কী কী উপসর্গ দেখা দেবে সেই বিষয়গুলোও তুলে ধরলেন। তথ্য আপার সহায়তায় চিকিৎসকের পরামর্শও পেলেন নিলুফার। পরে তিনি আস্বস্ত হলেন যে তার ওই সমস্যা নেই।

অপরজন সাবিত্রী দাশ। তিনি তার মেয়ের চাকরির কোন খোঁজ খবর আছে কি না তা জানতে প্রায়ই তথ্য আপার শরণাপন্ন হন। মেয়ের চাকরির আবেদন ফরম পূরণের ক্ষেত্রেও তথ্য আপার সহযোগিতা নিয়ে থাকেন।

এছাড়া গোপালগঞ্জ সদরের মেয়ে সোনিয়া আক্তার। গোপালগঞ্জ বঙ্গবন্ধু কলেজ থেকে বাংলায় মাস্টার্স করেছেন। এক বছরের কম্পিউটার প্রশিক্ষণও নিয়েছেন। ২০১২ সালের নভেম্বর মাসে তথ্য সহকারী হিসেবে কোটালিপাড়ার তথ্য কেন্দ্রে কাজে যোগ দিয়েছেন।

তিনি বলেন, ইন্টারনেটভিত্তিক যে কোনো তথ্য সেবাই আমরা দিয়ে থাকি। কোটালিপাড়ার ১২টি ইউনিয়নে এখনও আমরা কাজ করছি। তিনি বলেন, জনগণের কাছে এই প্রকল্প খুবই গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে।

কুষ্টিয়ার ভেড়ামারার তথ্য আপা নাজনীন আক্তার। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমএসসি পাস করে তথ্য সহকারী হিসেবে কাজ করছেন। সোনিয়া ও নাজনীন বলেন, আমরা শুধু চাকরিই করছি এমনটা নয়। নারীদের ক্ষমতায়নেও কাজ করছি। এটা আমাদের আনন্দ দেয়।

দেশের গ্রামীণ দরিদ্র সুবিধাবঞ্চিত ও কম সুবিধাপ্রাপ্ত নারীদের সুবিধা দিতে ২০১১ সালের ৫ জুলাই সরকার এই তথ্য-বার্তা চালু করে।

প্রকল্প সূত্রে জানা যায়, ২০১৫ সালের ডিসেম্বরে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে পরিচালিত এই প্রকল্পের প্রথম পর্যায় শেষ হয়েছে।

তৃণমূলের নারীদের দোরগোড়ায় তথ্যসেবা পৌঁছে দেয়াই ছিল এই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য। ১৩ কোটি টাকারও বেশি বাজেট নিয়ে দেশের সাতটি বিভাগের নির্বাচিত ১৩টি উপজেলায় এই প্রকল্পের কাজ শুরু হয়।

তথ্য আপা প্রকল্পের পরিচালক মিনা পারভিন বলেন, প্রকল্পটি খুবই সফল একটি প্রকল্প। তাই সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ দেশের ৪৯০টি উপজেলায় শুরু করবে। আশা করছি খুব শীঘ্রই এই প্রকল্পের দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ শুরু করতে হবে।

প্রতিবেদন : সেবিকা দেবনাথ

## নারী ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের স্বপ্ন পূরণের ঠিকানা 'জয়িতা'

'স্বামী ও সংসার ছেড়েছি। উদ্যোক্তা হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পরিবারের সদস্যসহ আত্মীয়-পরিজনদের লাঞ্ছনা-গঞ্জনা সয়েছি। এই জয়িতাই আমার স্বপ্ন, ধ্যান-জ্ঞান। নিজেকে আত্মবিশ্বাসে ভরপুর আত্মনির্ভরশীল একজন সফল উদ্যোক্তা হিসেবে দেখতে চাই'। কথাগুলো বলছিলেন মুন্সীগঞ্জের নাজনীন আক্তার মুক্তা।

নাজনীন বলেন, এই পথচলা অনেক কঠিন ছিল। পদে পদে বাধা। শ্বশুরবাড়িতে ঠাঁই হয়নি। স্বামীও বিশ্বাস রাখতে পারে না। মুন্সীগঞ্জ থেকে ঢাকায় এসে দিনের পর দিন সেলস গার্লের কাজ করতাম। স্বপ্ন ছিল একদিন সবলম্বী হবো। পরিবারের আপনজন বলে যাদের মনে করতাম তারা বিষয়টিকে সহজভাবে নেয়নি। হয় ঘর-সংসার নইলে স্বপ্ন কোনটা বেছে নেব। একদিন নিজের ইচ্ছার কাছে হার মানলাম। স্বামী তালাক দিলেন। সেই থেকে 'জয়িতায়' আছি। তবে, সেলস গার্ল হিসেবে নয়। একজন উদ্যোক্তা হিসেবে। এখানে নিজের ব্যবসা দেখছি। 'উত্তরণ নারী উন্নয়ন নামে একটি সমিতি করেছি। প্রায় ৫০ জন নারীর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে এতে।'

শুধু নাজনীন নন, সালমা ডেইজী, ফাতেমা, নিলুফার, তাহমিনা, ববিতা দাশ, নাছিমা, জোহরার মতো প্রায় ১৪০ জন নারী দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে নিজেদের মেধা, প্রতিভা আর সৃজনশীলতার মাধ্যমে নিজেদের যোগ্যতার স্বাক্ষর রাখতে 'জয়িতা'তে যুক্ত হয়েছেন। তাদের এ পথচলা সহজ ছিল না। নিজ নিজ এলাকায় জীবন আর অস্তিত্ব রক্ষায় কাজ করে যাচ্ছিলেন। কিন্তু প্রেক্ষাপট বদলে যায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উদ্যোগে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর ও বেসরকারি সংগঠন নারী উন্নয়ন সংস্থার কার্যক্রমে।

'জয়িতা' এখন একটি সুপরিচিত নাম। যে জয় করতে জানে সে বিজয়ী। সেই 'জয়িতা'। দেশের বিভিন্ন এলাকার নারীদের আত্মনির্ভরশীল হতে উদ্বুদ্ধ করতে এর পদযাত্রা ২০১১ সালের ১৬ নভেম্বর । ১৮০ জনকে নিয়ে শুরু হয় এর পথচলা। বিভিন্ন অঞ্চলের ক্ষুদ্র উদ্যোক্তারা তাদের সমিতিতে তৈরি পণ্য বাজারজাতকরণের লক্ষ্যে এ 'জয়িতা'তে আসার সুযোগ পান।

ধানমণ্ডির রাপা প্লাজার দুটি ফ্লোরের ২৪ হাজার বর্গফুট জায়গায় এর অবস্থান। ধানমণ্ডিতেই তিনটি বেজমেন্ট, বিভিন্ন স্থান থেকে আগত উদ্যোক্তা ও কর্মচারীদের (নারী) জন্য হোস্টেল নির্মাণ, সুইমিংপুলসহ আরো নানা পরিকল্পনা নিয়ে ২ কোটি টাকা ব্যয়ে ১৬ তলার 'জয়িতা ফাউন্ডেশন' ভবন নির্মাণ করার উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। এখানে জয়িতাদের নিজস্ব ভুবন। ক্রেতা তার পুরোপুরি সুযোগ ও সুবিধা যাতে পেতে পারে সেজন্য কাঁচাবাজার, শিশুদের খেলার ব্যবস্থা রয়েছে। বর্তমানে 'জয়িতা'র ব্যয়ের ৮০ শতাংশ বহন করছে সরকার, ২০ শতাংশ সমিতি। তবে লাভের পুরো অংশই পান দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে আসা সমিতির সম্পৃক্ত নারী উদ্যোক্তারা।

অনেক উদ্যোক্তা যোগাযোগ ব্যবস্থা ও পরিবেশ প্রতিকূল না হওয়ায় এর বলয় থেকে যেমন বেরিয়ে গেছেন, তেমনি যুক্ত হয়েছেন অনেকেই। মাসিক পাঁচ হাজার টাকা ভাড়ায় তারা নিজেদের উৎপাদিত পণ্য বিক্রি করছেন এখানে। বিলুপ্ত প্রায় বিন্নি চালের নানা খাদ্য, চিড়া, মুড়ি, ঢেঁকিছাঁটা চাল, ঘি, দই, আচার, কাসুন্দি, বাঁশ, পাট ও বেতের তৈরি নান্দনিক গৃহস্থালি পণ্য থেকে শুরু করে বেডকভার, কুশন, পর্দা, পিলো কাভার, কার্টেন কভার, রুটি রাখার ঝুড়ি, ফল রাখার ঝুড়িসহ বিভিন্ন ডিজাইন ও মানের পোশাক বিক্রি করা হচ্ছে। এখানেই শেষ নয়, ক্রেতাদের আকর্ষণ করতে রয়েছে ফুড কোর্ট। হাঁস-মুরগির মাংস ও মাছ রয়েছে। পাওয়া যাচ্ছে দেশীয় ঐতিহ্যবাহী পিঠাপুলি ও ফাস্টফুড। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জেলা-উপজেলা ও বিভাগীয় শহরে জয়িতার শাখা হওয়ার কথা ঘোষণা করেছিলেন উদ্বোধনকালে। এরই ধারাবাহিকতায় ময়মনসিংহের ভালুকায় একটি ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের ঠিকানা হয়েছে। রাজধানীর ইস্কাটনে এবং বেইলি রোডের মহিলা অধিদপ্তরের নিচে একটি খাবারের দোকান রয়েছে। নারী উদ্যোক্তাদের একটি অংশ সংসদ ভবন এলাকায়ও ফুড কোর্ট করেছে।

পাবনা জেলার বেড়া উপজেলার সংগ্রামী নারী সালমা ডেইজী। তিনি পোশাকসহ নানা সামগ্রী বিক্রি করেন। দেশীয় ঐতিহ্য ফুটিয়ে তোলেন তার পরিকল্পনায়। বাস্তব রূপ দেন নিজের গড়া রূপালী মহিলা উন্নয়ন সমিতিতে কর্মরত নারীদের মাধ্যমে। সালমা বলেন, নিজের এলাকায় তৈরি পণ্য বিক্রি করতাম। এখন জয়িতার উদ্যোগের কারণে রাজধানীতে এসে এসব

পণ্য বিক্রি করছি। এখন সরকারের 'জয়িতা ফাউন্ডেশনে' নিজেকে সম্পৃক্ত রাখতে চাই।

মহিলা বিষয়ক অধিপ্তর সূত্র জানায়, অধিদপ্তরের অধীনে থাকা দেশের বিভিন্ন জেলার নিবন্ধিত ১৮০টি সমিতির নারীদের উৎপাদিত পণ্য 'জয়িতা'য় আনা হয়।

বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত নারীদের আবাসন সংকট দূর করতে রাজধানীর লালমাটিয়া এলাকায় 'জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয় ভবনের উপর তলায় জয়িতা নারীদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এ ছাড়া অনেকে পৃথক জায়গায় মেস বা বাসা ভাড়া করে থাকেন। লালমাটিয়ায় অবস্থিত এ হোস্টেলে দৈনিক ২০ টাকা দিয়ে একজন বিক্রয় সহকারি থাকতে পারেন। সমিতির সভানেত্রীরা দৈনিক ৫০ টাকা দিয়ে এ হোস্টেলে থাকতে পারেন।

মহিলা অধিদপ্তর সূত্রে জানা যায়, জয়িতার কর্মপরিধি সারাদেশে বিস্তৃত করার লক্ষ্যে সরকার ইতিমধ্যেই ব্যাপক পরিকল্পনা নিয়েছে। ময়মনসিংহের হালুয়াঘাটে জয়িতার একটি আউটলেট চালু করা হয়েছে। গাজীপুরের কালীগঞ্জে এবং বান্দরবানে শীঘ্রই নতুন আউটলেট খোলার প্রস্তুতি চলছে। পর্যায়ক্রমে সারাদেশে এ ধরনের আউটলেট সম্প্রসারিত হবে।

প্রতি বছর বাণিজ্যমেলায় 'জয়িতা'র নারী উদ্যোক্তা অংশ নেন। এছাড়া বছরব্যাপী বিভিন্ন মেলায় তারা নিজেদের উৎপাদিত পণ্য প্রদর্শন ও বিক্রি করেন।

প্রতিবদেন : সেলিনা শিউলি

## কম্পিউটার প্রশিক্ষণ নিয়ে নারীরা স্বাবলম্বী হচ্ছে

দেশের ৬৪টি জেলার শত শত গ্রামের বিপুল সংখ্যক নারী রাষ্ট্র পরিচালিত একটি প্রকল্পের অধীন কম্পিউটার প্রশিক্ষণ নিয়ে স্বাবলম্বী হয়েছেন।

প্রকল্পের অধীনে সহস্রাধিক নারী কম্পিউটার ও আইসিটিতে প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। তাদের অনেকেই এখন সাইবার ক্যাফে এবং দেশের বিভিন্ন শহর ও পল্লীর বাণিজ্য কেন্দ্রে চাকরি করছেন। তাদের কেউ কেউ নিজস্ব উদ্যোগে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন। নারী ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে। মন্ত্রণালয় ২০১৮ সালের মধ্যে ৬৪টি জেলায় ২৮ হাজার ৭০ জন নারীকে স্বাবলম্বী করতে তাদের কম্পিউটারে প্রশিক্ষণ দেয়ার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে।

২০০২ সালের জুলাই মাসে জেলাভিত্তিক 'নারী কম্পিউটার প্রশিক্ষণ প্রকল্প' চালু করা হয় এবং ২০০৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত এই প্রকল্প চালু ছিল। প্রাথমিক পর্যায়ে এই প্রকল্প দশটি জেলায় চালু ছিল। তবে পরবর্তীতে এই প্রকল্পের কার্যক্রম ৩০টি জেলায় সম্প্রসারিত করা হয় এবং ২০১৩ সাল পর্যন্ত এটি অব্যাহত ছিল। নারীদের জন্য কম্পিউটার প্রশিক্ষণ প্রদানের চাহিদা বৃদ্ধির প্রেক্ষিতে নারী ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন জাতীয় মহিলা সংস্থা (জেএমএস) জেলাভিত্তিক নারী কম্পিউটার প্রশিক্ষণ প্রকল্প নামে তৃতীয় পর্যায়ে একটি প্রকল্প চালু করার উদ্যোগ গ্রহণ করে। তৃতীয় পর্যায়ে এখন দুটি প্রকল্প চালু রয়েছে। এর একটি হলো ৬৪টি জেলায় জেলাভিত্তিক নারী কম্পিউটার প্রশিক্ষণ প্রকল্প (দ্বিতীয় পর্যায়) এবং নারীদের জন্য আইটি কর্মসূচি। ২০১৩ সালে এ প্রকল্পটি চালু হয় এবং এটি ২০১৮ সালের জুন পর্যন্ত কার্যকর থাকবে।

স্থানীয় পর্যায়ে জেএমএস জেলা পর্যায়ে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পরিচালনা করছে। প্রকল্পের অধীন কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের সিলেবাস অনুযায়ী কম্পিউটারে ছয় মাসব্যাপী প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর ব্যবসা শুরু করতে কর্মসংস্থান ব্যাংকসহ বিভিন্ন ব্যাংক প্রশিক্ষিত নারীদের ব্যাংক লোন দিচ্ছে।

জেএমএসের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মমতাজ বেগম বাসসকে বলেন, আমরা প্রকল্পের লক্ষ্য অর্জনে পুরোপুরি সফলতা অর্জন করেছি।

তিনি বলেন, প্রকল্পের অধীনে নারীরা প্রশিক্ষণ নিয়ে ইতিমধ্যেই স্বাবলম্বী হয়েছেন। তাদের জীবন যাত্রায় পরিবর্তন এসেছে। তারা সফল উদ্যোক্তা হয়েছেন। প্রকল্পের পাশাপাশি জেএমএস তথ্য আপা নামে একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে এই প্রকল্প নারীর ক্ষমতায়নের জন্য সহায়ক ভূমিকা রাখছে।

প্রতিবেদন : আশরাফুল হক, অনুবাদ : অহিদুজ্জামান মিয়া

## জয়িতা পুরস্কার-২০১৭ অর্জন করেছেন রাজশাহীর সুবিধাবঞ্চিত পাঁচ নারী উদ্যোক্তা

রাজশাহী থেকে ২০১৭ সালে জয়িতা পুরস্কার পেয়েছেন সুবিধাবঞ্চিত পাঁচজন নারী উদ্যোক্তা। সরকারি প্রশিক্ষণ ও সহায়তা তাদের এ সাফল্য এনে দিয়েছে।

সফল উদ্যোক্তা উরোশি মাহফিলা ফাতিহা। অনেক বাধা অতিক্রম করে তিনি এই সাফল্য অর্জন করেছেন। তার এই সাফল্যের স্বীকৃতি হিসেবে ২০১৭ সালে তিনি রাজশাহী থেকে জয়িতা পুরস্কার পান।

মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর 'জয়িতা অন্বেষণ' কর্মসূচির মাধ্যমে প্রতিবছর সারাদেশ থেকে নারী উদ্যোক্তাদের বাছাই করে সফল নারী উদ্যোক্তাদের এ পুরস্কার দেয়।

একজন উদ্যোক্তা হিসেবে ফাতিহার উঠে আসার পথটা মসৃণ ছিল না। মাহফিলা ফাতিহা বলেন, ২০০৬ সালে এইচএসসি পাস করার পর আমি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে চারুকলা বিভাগে ভর্তি হই এবং আমার নিয়মিত পড়াশোনার পাশাপাশি ঘরে শাড়ির ওপর ড্রয়িংয়ের কাজ শুরু করি। আমি জনগণের ব্যাপক সাড়া পাই এবং আমার কাজের চাহিদা বেড়ে যায়।

তিনি বলেন, ২০০০ টাকা ব্যয়ে প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম কেনার পর ব্যবসা শুরু করি। এখন আমার পণ্য বিদেশেও রফতানি হচ্ছে।

নিজের প্রবল মানসিক শক্তি ও সদিচ্ছার ওপর ভর করে নিজেকে ও অন্যদের এগিয়ে নিয়েছেন। দৈনিক বেতন ভিত্তিতে তার প্রতিষ্ঠানে এখন প্রায় ১ হাজার মহিলা কাজ করছেন।

উরোশির মতোই ২০১৭ সালে রাজশাহীর আরো ৪ জন নারী উদ্যোক্তা জয়িতা পুরস্কার পেয়েছেন। তার মতো আরো অনেক নারী উদ্যোক্তা রাজশাহী এবং আশপাশের এলাকায় আর্থিক উন্নয়নে অবদান রাখছেন।

নিলয় ওসমান মোটর ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের প্রশাসনিক কর্মকর্তা মাহমুদুন নবী বলেন, ১৭২ জন পুরুষ শ্রমিকের পাশাপাশি ৩০ জন নারী দক্ষতার সঙ্গে কাজ করছেন।

জেলা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর কার্যালয় সূত্রে জানা যায়, জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে আধুনিক টেইলারিং, এমব্রয়ডারি, মোবাইল ফোন সার্ভিসিং, বিউটিফিকেশন, খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও প্যাকেজিং ও শপিং ব্যাগ ইত্যাদি বিষয়ে ৯৪০ জন বেকার নারীকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।

জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা শাহনাজ বেগম বলেন, ৩,৪১২ নারীকে আত্মকর্মসংস্থানের জন্য ২.৪৬ কোটি টাকা ঋণ দেয়া হয়েছে।

তিনি বলেন, ১৮৮ স্বেচ্ছাসেবী মহিলা সংগঠনকে ৩৩.০৫ লাখ টাকা অনুদান দেয়া হয়েছে।

নারীরা যাতে স্বাবলম্বী হতে পারে সেজন্য প্রশিক্ষণ পরবর্তী বিভিন্ন আয়বর্ধক কাজে নিয়মিত যুক্ত থাকতে প্রতিটি সংগঠন সচেতনতা সৃষ্টি ও নিজ প্রশিক্ষণ সেন্টারে দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ দিচ্ছে।

প্রতিবেদন : আয়নাল হক, অনুবাদ : আজম সারোয়ার চৌধুরী

## টেকসই উন্নয়নের জন্য চাই লিঙ্গ বৈষম্যহীন সমাজ

‘রূপকল্প-২০২১’ ও ‘রূপকল্প-২০৪১’ বাস্তবায়নসহ জাতীয় ও টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জনে প্রয়োজন লিঙ্গ বৈষম্যহীন সমাজ। আর সেজন্যেই কৃষি থেকে রাজনীতি, সব ক্ষেত্রে নারীদের সক্রিয় অংশগ্রহণও নিশ্চিত করতে হবে।

উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের মূলধারায় নারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য তাদের ক্ষমতায়নের মাধ্যমে সমান অধিকার অপরিহার্য। কেননা, নারীর ক্ষমতায়ন হলো লিঙ্গ সমতার প্রতিফলন, যা দেশের অগ্রগতি, মধ্য আয়ের অবস্থা এবং সামগ্রিক উন্নয়নের দিকে অগ্রসর হওয়ার অগ্রদূত।

বাংলাদেশে এখন নারীরা সব ধরনের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করছেন। কেউ ব্যাংকার, কেউ তৈরি পোশাক শ্রমিক, কেউবা শিক্ষক, চিকিৎসক, আত্মনির্ভরশীল। কেউ আবার নিজেই উদ্যোক্তা। কিন্তু দেশকে আরো অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

সাউথ ইস্ট ব্যাংকের সিনিয়র সহকারী সহ-সভাপতি মাহমুদা বেগম নারীর ক্ষমতায়নের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তিনি ৮ জন মহিলা কর্মকর্তা-কর্মচারী পরিচালনা করেন। তারা ১ হাজার ২৮০ জন গ্রাহকের সঙ্গে দৈনন্দিন লেনদেনসহ অন্যান্য কাজ করছেন। নারীর ক্ষমতায়নের পথে এটি একটি উদাহরণ।

বাসসের সঙ্গে আলাপকালে ব্যাংকের ধানমণ্ডি মহিলা শাখার ব্যবস্থাপক মাহমুদা বেগম বলেন, ১৯৯৫ সালে যখন আমি সাউথ ইস্ট ব্যাংকের ট্রেইনি সহকারী অফিসার হিসেবে যোগদান করি, তখন দেখলাম দীর্ঘ সময় অফিস করার কারণে মাত্র কিছু সংখ্যক নারী ব্যাংকের চাকরিকে পেশা হিসেবে বেছে নেন।

তিনি বলেন, আমার পিতা বাংলাদেশ ব্যাংকের একজন কর্মকর্তা ছিলেন। তিনি আমাকে এই পেশাটি গ্রহণ করার জন্য উৎসাহিত করেন। এখন আমি একজন ব্যাংকার হিসেবে গর্ববোধ করি।

মাহমুদা বেগম বলেন, নয়ন সেলিনা একজন সফল উদ্যোক্তা। একজন উদ্যোক্তা হিসেবে তিনি ব্যাপক সাফল্য লাভ করেন ও মূল্য সংযোজন কর

(ভ্যাট) এবং আয়কর যথোপযুক্তভাবে প্রদান করে  উন্নয়নে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

দু'সন্তানের জননী সেলিনা এখন কক্সবাজারে একটি হোটেল এবং পোলট্রির ব্যবসা চালাচ্ছেন। তিনি বলেন, 'আমি আমার অলংকার ১৭ হাজার টাকায় বিক্রি করে ১৯৯৫ সালে একটি ছোট পোল্ট্রি খামারের ব্যবসা শুরু করি এবং আমার জীবন-যুদ্ধের শুরু এখানেই।' তিনি জানান, তার স্বামী তাকে ও দু'সন্তানকে রেখে ২১ বছর আগে পালিয়ে গিয়েছিল।

তিনি বলেন, আমি শুরুতে অনেক সমস্যার মুখোমুখি হয়েছিলাম। এরমধ্যে প্রধান সমস্যা ছিল অর্থ সংকট। পোল্ট্রি ফার্মের জন্য ব্যাংকগুলো আমাকে টাকা ধার দিতে সম্মত ছিল না। শেষমেষ, আমার ব্যবসা সম্প্রসারণে কর্মসংস্থান ব্যাংক থেকে ৪৫ হাজার টাকা ঋণ নেই। যা ছিল আমার ব্যবসার সম্বল।

অন্যান্য অনেক মেয়েদের মতো সুলতানা পপিকেও সামাজিক সমালোচনা ও পিতৃতান্ত্রিক সমাজের মুখোমুখি হতে হয়েছিল। কিন্তু তিনি বর্তমানে রংধনু একাডেমি নামে একটি ব্লক এবং বুটিক ট্রেনিং সেন্টার চালু করেছেন। সেখানে মহিলাদের আত্মনির্ভরশীল হওয়ার জন্য প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।

বিশ্ব ব্যাংকের অর্থনীতিবিদ ড. জাহিদ হোসেন দেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে নারী শ্রমিকদের অংশগ্রহণের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে বলেন, ২০৩০ সালের মধ্যে এসডিজি অর্জনে শুধুমাত্র ৩৪ শতাংশ নারী শ্রমশক্তি অবদান রাখছে। তিনি বলেন, যদি আগামী পাঁচ বছরে বাংলাদেশের শ্রমশক্তিতে নারীর অংশগ্রহণ ১০ শতাংশ বৃদ্ধি পায়, তবে জিডিপি প্রবৃদ্ধি এক শতাংশ বৃদ্ধি হবে।

অ্যাসোসিয়েশন অব ব্যাংকারস, বাংলাদেশ (এবিবি)-এর চেয়ারম্যান আনিস এ খান বলেন, দেশের টেকসই উন্নয়নের জন্য শ্রমশক্তিতে নারীর অংশগ্রহণ অত্যন্ত জরুরি।

আনিস এ খান বলেন, ব্যাংকিং সেক্টরে নারী ব্যাংকারদের ভূমিকা প্রশংসনীয়। কারণ তারা তাদের চাকরির প্রতি অত্যন্ত আন্তরিক এবং তারা অফিসের সময়সূচি সঠিকভাবে মেনে চলেন।

যুব উন্নয়ন অধিপ্তরের (ডিওয়াইডি) মহাপরিচালক আনোয়ারুল করিম বলেন, তার বিভাগ যুবদের বিশেষ করে নারীদের স্বনির্ভরশীল করে গড়ে তুলতে নিরলসভাবে কাজ করছে। তিনি বলেন, 'ডিওয়াইডি' ইতিমধ্যে জুলাই ২০১৬ পর্যন্ত ৪৮ লাখ যুবকের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছে এবং তাদের মধ্যে ২০ লাখ যুব আত্মনির্ভরশীল হয়েছে।'

বাংলাদেশ উইমেন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (বিডব্লিউসিসিআই) সভাপতি সেলিমা আহম্মদ বলেন, নারীর ক্ষমতায়ন ছাড়া বাংলাদেশ এসডিজি অর্জন করতে পারে না। কারণ লিঙ্গ সমতা ১৭টি লক্ষ্যের প্রধান লক্ষ্যগুলোর মধ্যে একটি। তিনি বলেন, দেশের উন্নয়নে নারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে নারীবান্ধব পরিবেশ অবশ্যই প্রয়োজন।

তিনি বলেন, বিডব্লিসিসিআই নারী উদোক্তাদের সক্ষমতা বাড়াতে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

ইতিমধ্যে এই চেম্বার সারাদেশের ১২০টি উপজেলায় ৩৫ হাজার নারীকে প্রশিক্ষণ দিয়েছে এবং আরো ৯ হাজার নারীকে প্রশিক্ষণ দেবে। এদের অনেকেই নিজ নিজ পেশায় সাফল্য অর্জন করেছেন।

প্রতিবেদন : এ কে এম কামালউদ্দিন চৌধুরী, অনুবাদ : আজম সারোয়ার চৌধুরী

## ‘Tathya Apa’ takes digital services to rural women

The women, who did not have access to digital gadgets like internet, computer, email or videoconferencing only a few years ago, are now getting benefit of these modern tools of communication.

The credit for the significant changes to the women goes to the “Tathya Apa” of Information Centres (Digital Centres) who nowadays are providing necessary information especially to the rural women either from the digital centres or going to the doorsteps of the women requiring digital services.

The services include information related to health problem, commodity market, use of balanced fertilisers and pesticides and filing of online job applications. One can also get necessary assistance for legal aid in case of being tortured.

Three Tathya Apas give services in one Digital Centre in every upazila. A Tathya Apa sits in a Digital Centre, while the remaining two visit homes with laptops.

Under the scheme, a call centre has been set up at the main building of Jatiya Mohila Sangstha in the capital city. Women from across the country can get information on the six issues from the experts by dialing 10922 to the call centre.

Some 2.70 lakh women took services from 39 Tathya Apas of 13 Digital Centres during 2013 to 2017. Most of the women go to the “Tathya Apa” for health related problem and jobs. Like Nilufar Begum, a housewife of Kotalipara in Gopalganj, who was scared about some abnormality in her breasts.

Initially, Nilufar thought she got breast cancer. So she didn't want to disclose the matter to anyone fearing social trauma. Nilufar, however, informed it to Tathya Apa on the day when the information lady visited her house. Tathya Apa instantly launched internet in her laptop and showed Nilufar the matters of breast examination with photos from websites.

She also demonstrated the symptoms of the breast cancer that could be seen when it develops in one's body. With the help of Tathya Apa, Nilufar got advice from physicians and eventually was cured.

Sabitri Das often visited Tathya Apa to know whether there was any news about the job of her daughter. She used to take the help from Tathya Apa in filling up the job application of her daughter.

Besides the service receivers, many rural women are also choosing the profession of Tathya Apa. Like Sonia Aktar of Gopalganj Sadar upazila, who has become a Tathya Apa after completing post graduation degree from Gopalganj Bangabandhu College. She took one-year training on computer and joined Kotalipara Digital Centre as an information assistant in November, 2012.

"We provide internet-based information in 12 unions of Kotalipara," said Sonia adding that the services are highly appreciated by the people.

Nazneen Aktar, another Tathya Apa of Bheramara, Kushtia, is now working as an information assistant after obtaining post graduation degree from Jagannath University.

Both Sonia and Nazneen said they are not doing only job, but are also working for women empowerment. It gives us pleasure, they said.

The government launched the Tathya Apa Project on July 5 in 2011 to provide digital services to rural poor and underprivileged women. The first phase of the project run by the Ministry of Women and Children Affairs ended in December 2015.

The main aim of the project was to take information services to the doorsteps of the grassroots women. The work of the scheme commenced in 13 selected upazilas of seven divisions with a budget of over Taka 13 crore.

Director of Tathya Apa Project Mina Parveen said as the first phase of the project was a success, the government has decided to go for the second phase in 490 upazilas.

“We hope that we could launch the second phase of the project soon,” she added.

Report : Sebika Debnath, Translation : A Z M Sajjad Hossain Sabuj

## Joyeeta for fulfilling dreams of women small entrepreneurs

Naznin Akhtar Mukta, a woman deserted by her husband, has become a successful small entrepreneur with support from Joyeeta, an initiative of the Ministry of Women and Children Affairs for empowering women.

Hailing from Munshiganj, the initial stage of Naznin to become an entrepreneur was not smooth as she had to face many obstacles from her husband and other family members .

“I have left my husband and my family. I was rebuked by my relatives and other members of my family when I wanted to establish myself as a successful entrepreneur. Now, Joyeeta is my dream as I want to see myself as a selfreliant and successful entrepreneur,” said Naznin.

Narrating the obstacles she had to face for starting with Joyeeta, she said, “The beginning stage was so tough for me...I had to face many obstacles at every step. I could not get shelter at my in-laws house. Husband could not believe me and eventually he deserted me”.

At one stage, Naznin said that she later came to Dhaka and started working as a sales girl in Joyeeta. “Since then I have been working with Joyeeta as my dream was to become a self-reliant woman entrepreneur. Now I am a successful-entrepreneur,” she added.

Naznin said that she is now supervising her own business after establishing an association named “Uttoron Nari Unnayan” where about 50 women are working.

Like Naznin, at least 140 women including Salma, Deizi, Nilufer, Tahmina, Babita Das, Nasima and Zohra from across

the country have been working with Joyeeta. But, their initial stage to become an entrepreneur was not so easy. They had overcome all obstacles through hard work and creativity.

Joyeeta, a symbol of women's triumph, is a very popular name in Bangladesh. The Bengali word Joyeeta connotes victory of women. It is a dedicated business platform to support and facilitate the grass root women entrepreneurs to showcase and market their own arts, crafts, products and services.

The journey of Joyeeta began on December 16, 2011 with 180 women entrepreneurs aimed at encouraging women throughout the country to become self-reliant.

The Joyeeta marketing centre is situated on 24,000 sqft area on the 3rd and 4th floors of Rapa Plaza in the city's Dhanmondi area. But, the government has taken a project to construct a 16-storied "Joyeeta Bhavan" involving Taka two crore in the same area with modern facilities.

At present, government is providing 80 per cent of the total runing cost of Joyeeta. But, total profit goes to the women entrepreneurs coming from different areas of the country. They are selling their own products in their stalls inside Joyeeta. The monthly rent of each stall is Taka 5,000 only.

Different varieties of rice, ghee, pickle, various types of handicrafts made by bamboo, jute products, bed sheet, pillow cover, curtain, male and female dresses are on display for sale in their stalls. Besides, there is a food court.

Salma Daisi, a woman entrepreneur hailed from Bera upazila of Pabna district, is used to sell various readymade garments in a "Joyeeta" stall. "I am happy as I have become a successful entrepreneur through Joyeeta. I want to remain involve with Joyeeta Foundation in the rest of my life," she said.

According to the Women Affairs Department, products of 180 registered associations across the country are being sold in the Joyeeta's stalls.

The government has already taken various measurers to expand the work of Joyeeta across the country.

Under this programme, an outlet of Joyeeta was opened at Haluaghat in Mymensingh recently. Besides, two separate outlets would be opened in Kaliganj, Gazipur and Bandarban soon. There is a plan to open its outlets in each upazila and district headquarters across the country in phases.

The foundation also arranges temporary residential facility for the women who come to Dhaka with their products. To this end, it has set up a hostel on the sixth floor of the office of district women affairs officer in the city's Lalmatia area. A sales assistant can stay in the hostel by paying Taka 20 per day. But, the chairperson of any association has to pay Taka 50 per day to stay in the hostel.

Report : Selina Sheuly, Translation : Aminul Islam Mirja

## Computer training expediting women empowerment

Many women in 64 district towns and hundreds of villages across the country have become self-reliant after obtaining basic computer training, thanks to a state-funded project.

Under the project, thousands of women have completed training on computer and ICT while many of them got jobs in cyber cafes and broadband internet service providing centres in different towns and rural business centres.

The Ministry of Women and Children Affairs, the implementing authority of the project, has targeted providing computer training to 28,070 educated women at the 64 districts by 2018 to help them get a decent lifestyle.

The "District Based Women Computer Training Project" was introduced in July 2002 and continued till February 2007, covering limited areas in 10 districts. Later, the project, in the second phase, was extended to 30 districts and continued till June 2013.

Considering the growing demand for computer training for women, Jatiyo Mohila Sangstha (JMS) under the Ministry of Women and Children Affairs, has initiated the 3rd phase of the project under the name "District Based Women Computer Training Project".

The 3rd phase, a merger of two ongoing projects "District-Based Women Computer Training Project (2nd phase)" and "IT Programme for Women" in 64 districts began in July-2013 and will continue till June 2018.

Under the project, a six-month training course is being provided on computer applications following a syllabus of

the Technical Education Board. JMS district committees are running the training centres at the local level.

Different banks, particularly the state-run Karmasangsthan Bank (employment bank), are distributing loans to the trained women to help them start business.

“We have achieved significant success in attaining the goals of the project,” JMS Chairman Professor Momtaz Begum told BSS.

She said many women have already become self-reliant after getting computer training under the project, noting that the training empowered the women for changing their livelihood and lifestyle, with making them successful entrepreneurs or IT professionals.

Besides the projects, JMS is implementing a project named “Tathya Apa” (a woman who provides necessary information to rural women) for empowering women through information technology.

“We hope, these projects would take the benefit of the initiative of “Digital Bangladesh” to the grassroots level,” JMS chairman said.

Report : Ashraful Haque

## Underprivileged women marching forward in Rajshahi

Uroshi Mahfila Fateha is now a successful entrepreneur in Rajshahi city. But the success didn't come overnight as she had to cross many hurdles to attain it. For her achievement, she got Joyeeta Award in Rajshahi this year. Uroshi, a resident of Upashahar area in the divisional city, says her journey towards becoming an entrepreneur was not smooth.

"After passing HSC in 2006, I got admitted to the Department of Fine Arts at Rajshahi University. Besides my regular study, I started designing sharees in house. I got a huge response from the people that increased demand of my works," she said.

Uroshi embarked on her venture after purchasing necessary inputs at a cost of Taka 2,000. Now, she owns a big commercial organisation. Her products are also being exported to some countries.

Uroshi is taking herself and others forward on her strong mental strength and willpower. As many as 1000 other women are now working in her organisation.

Like Uroshi, four other women received the Joyeeta Award from Rajshahi this year in recognition to their significant contribution to this sector.

Not only the five including Uroshi, many other women entrepreneurs are contributing a lot towards strengthening the business in Rajshahi and its adjacent areas.

Thirty skilled women are working in Niloy-Osman Motor Industries Limited alongside 172 male workers here, said Mahmudun Nabi, administrative officer of the factory. Many underprivileged and distressed women have become self-reliant through working in boutique houses in the metropolis, contributing a lot to the society.

This way, women participation in economic activities is gradually increasing. Participation of rural women in economic activities is also rising.

District Women Affairs Office imparted training to 940 unemployed women on various trades like modern tailoring and embroidery, mobile phone servicing, beautification, food processing and packaging and shopping bag making in order to improve their living and livelihood.

Besides, 3,412 other women were given microcredit of Taka 2.46 crore for their self-employment, said Shahnaj Begum, the district women affairs officer.

"We provided grants of Taka 33.05 lakh to 188 Volunteer Women Organisations (VWOs)," she said.

Each of the organisations arranges awareness and life-skill development training at their own training centre for women involving them in various post-training income-generation activities for their self-reliance.

More than 2100 VWOs members were imparted training on leadership and managerial skill development so that they can make their organisations more effective and dynamic.

Another project titled "Women Skill-based Training for Livelihood" is also being implemented with the main

thrust of making the underprivileged and neglected women especially divorcee, widow and financially backward self-reliant.

Under the project, the targeted women are provided three-month training. They are also given financial and some other requisite support after training. “We have founded ‘Angona Boutique and Fashion’ and it is being operated by our Angona Mohila Samity successfully,

making more than 100 women income-generators,” said Iffat Ara, director of the samity.

Similarly, Daudpur Mohila Kalyan Samity's Shefali Boutique and Mohona Mohila Kalyan Samity's Mohona Boutiques transformed at least 175 women self-reliant.

"We have engaged around 50 women in skill development training for their livelihood," said Anwara Begum, president of Dashmari Distressed Women Welfare Association.

After completing their training, the beneficiary women are doing block, boutique and embroidery works in their respective areas, and many of them attained their long-cherished economic emancipation.

Anwara Begum told BSS that the boutique houses are established and are being operated with the assistance of the District Women Affairs Office.

"Raziya Sultana, 25, of Dharampur Bazekazla earns around Tk 400-500 per day after making and selling cloth bags for shopping. Now, she is on the afoot to say goodbye to her long-lasting poverty and hunger," said a local community leader.

Shahnaj Begum told BSS that her department is very much positive to involve the socially backward women in the country's overall development process.

Sharing views on the issue, Kalpona Roy, the local unit president of Bangladesh Mohila Parishad, said supporting skill development of the poor women in the society for better economic condition is very important.

Report : Aynal Haque

## Women breaking glass ceiling on rise

The number of women taking their strong footing in administration, corporate and enterprises is increasing steadily, thanks to the various initiatives for women empowerment by both public and private sectors.

Senior assistant vice president of Southeast Bank Mahmuda Begum is one of the women who sets a bright example of empowering themselves in a sector used to be man dominated for years.

"Only a few women were in banking profession due mainly to long office timing when I joined Southeast Bank as a trainee assistant officer in 1995", Mahmuda, also manager of the Dhanmondi Ladies Branch of the bank, told BSS.

She credited to her father, a former official of Bangladesh Bank, for the support to be a banker.

"I like to see more women taking banking as a profession and contributing to the sustainable development of the country," said Mahmuda, who also leads eight female staff at her branch for dealing with over 1280 clients.

Anis A Khan, Chairman of Association of Bankers, Bangladesh (ABB), lauded the role of women bankers saying that they are highly sincere and committed to their duties.

Khan, also Managing Director at the Mutual Trust Bank Limited, said about 21.0 per cent of the total employees in his bank is women and their performances are equal to their male colleagues.

Besides the formal sector, many women in the informal

sectors are showing their strength and excellence to get the strong footing in the society.

For example, Nayan Selina is one of the women who broke the glass ceiling to become an entrepreneur by running a hotel and poultry business in the beach town of Cox's Bazar.

"I sold my ornaments for Taka 17000 to start a small poultry farm in 1995 after my husband abandoned me with two minors," Selina said, but without expressing any remorse for the appalling episode of her life.

She, however, admitted that the new journey of her life was not easy as many banks just showed cold shoulder to her loan applications. After a long struggle, things started to take a good shape with the state-owned Karmasangsthan Bank (Employment Bank) giving her Taka 45,000 to expand her business.

Selina has already become a successful entrepreneur and has been awarded by many organisations for her success.

Sultana Poppy has been empowering many women for years to make a decent life. Like Selina, her journey to success was also a challenge. After obtaining secondary school certificate in 1998, she had to take a job in a non-government organisation only for living. She worked as a saleswoman for few years before hitting the path of her dream to be her own boss.

Eventually, Poppy set up the Rangdhanu Academy, a block and boutique training centre for women aspiring to have their own business.

"I took training from Department of Youth Development (DYD) and started the academy with own savings and loan from my husband and DYD," said Poppy, who was awarded by the DYD as a successful self-employed woman.

As of July 2016, DYD provided necessary training to about 48 lakh youths, of them 20 lakh became self-reliant, said DYD Director General Anwarul Karim, noting that nearly 30.0 per cent of the trained youths are women while most of the training modules were especially designed for women empowerment.

World Bank lead economist Dr Zahid Hossain in Dhaka underscored the need for participating women in the country's labour force to attain higher GDP growth and achieve the Sustainable Development Goals (SDGs) by 2030, saying only 34.0 per cent women labour force are now contributing to the country's growth.

"If Bangladesh can raise the participation of women in labour force by 10.0 per cent in the next five years, it would drive the GDP growth by 1.0 per cent", he said.

Bangladesh Women Chamber of Commerce and Industry (BWCCI) President Selima Ahmed said without empowering women, Bangladesh cannot achieve one of the key goals of the SDGs.

"BWCCI has already provided training to over 35,000 women and is now working on giving training to 9,000 more in 120 upazilas across the country,"' she said.

Selima, also the vice-chairperson of the Nitol-Niloy Group, urged all to give women proper support, including finance and training to help achieve the country's development goals.

Report : A K M Kamaluddin Chowdhury

বিশেষ উদ্যোগ ৬

# ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ

"শেখ হাসিনার উদ্যোগ, ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ"

## ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ

দেশের ৮০ শতাংশ মানুষ বিদ্যুৎ সুবিধা পাচ্ছে ১৪৭
গ্রামীণ অর্থনীতিকে এগিয়ে নিচ্ছে বিদ্যুৎ সংযোগ ১৪৯
বিদ্যুৎ সংযোগ বদলে দিয়েছে গ্রামীণ জীবনচিত্র ১৫২
১ হাজার মেগাওয়াট সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিকল্পনা করছে বেজা ১৫৪
রংপুরে বিদ্যুৎ চালিত সেচপাম্প কৃষিকে লাভজনক করেছে ১৫৬
80pc people now get electricity 159
Power supply gives new life to rural people 161
Electricity changes lifestyle of Khulna people 164
BEZA to set up solar zone for 1000 MW electricity 166
Electricity-run irrigation making farm activities profitable 168

জাতীয় প্রবৃদ্ধি অর্জন, দারিদ্র্য বিমোচন এবং দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নের অন্যতম চালিকা শক্তি বিদ্যুৎ। আর্থসামাজিক ও মানব উন্নয়নে ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছানো এ কর্মসূচির লক্ষ্য। ২০০৯ সালে দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় এসেই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশের বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণ ব্যবস্থায় বৈপ্লবিক অগ্রগতি সাধন করেন। তাঁর দূরদর্শী ও বলিষ্ঠ নেতৃত্বের ফলে দেশের সর্বত্রই এখন বিদ্যুতের আলো পৌঁছে গেছে। প্রচলিত পদ্ধতিতে বিদ্যুৎ উৎপাদনের পাশাপাশি সৌরবিদ্যুৎ, উইন্ডমিল ও বায়োগ্যাস থেকেও বিদ্যুৎ উৎপাদিত হচ্ছে। এছাড়াও দেশে প্রথমবারের মতো শুরু হতে যাচ্ছে পরমাণু বিদ্যুতের উৎপাদন।

## অর্জন

- ২০০৯ সালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দায়িত্ব গ্রহণকালে বিদ্যুতের প্রকৃত উৎপাদন ছিল ৩ হাজার ২৬৮ মেগাওয়াট। বর্তমানে উৎপাদন ক্ষমতা ১৫ হাজার ৭৫৫ মেগাওয়াটে উন্নীত হয়েছে।
- বিগত ৮ বছরে ৪৭% থেকে ৮০% লোক বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় এসেছে।

- ৮১টি নতুন বিদ্যুৎ প্লান্ট স্থাপিত হয়েছে। নির্মাণাধীন রয়েছে ১৫টি এবং আরো ৪১টি নির্মাণের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।
- বিগত ৭ বছরে ১ কোটিরও বেশি গ্রাহককে বিদ্যুৎ সংযোগ দেয়া হয়েছে।
- ২০০9 সালের পর সৌর বিদ্যুতের সুবিধাপ্রাপ্ত লোকের সংখ্যা ২০ লাখ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে জুন ২০১7 পর্যন্ত মোট ২ কোটিতে এসে দাঁড়িয়েছে।
- দেশের বিদ্যুৎ খাতের অভূতপূর্ব উন্নয়নের ফলে অবকাঠামো, কৃষি ও শিল্প খাতে ইতিবাচক প্রভাব পড়েছে এবং নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে।

## ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

- ৭ম পঞ্চমবার্ষিকী (২০১৬-২০২০) পরিকল্পনায় ২০২০ সাল নাগাদ ২৩ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং দেশের ৯৬ শতাংশ এলাকাকে বিদ্যুৎ সরবরাহের আওতায় নিয়ে আসার পরিকল্পনা রয়েছে।
- রূপপুর পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে ২০২৪ সালের মধ্যে ২ হাজার ৪০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।
- বিদ্যুৎবিহীন এলাকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সোলার প্যানেল স্থাপন করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

ছবি ও তথ্য : চলচিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর

## দেশের ৮০ শতাংশ মানুষ বিদ্যুৎ সুবিধা পাচ্ছে

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে দেশের বিদ্যুৎ খাতে দ্রুত ও ব্যাপক উন্নতি হওয়ায় বর্তমানে মোট জনসংখ্যার প্রায় ৮০ শতাংশ মানুষ বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় এসেছে।

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের বিদ্যুৎ বিভাগের সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, ২০১৭ সালে দেশে বিদ্যুৎ গ্রাহকের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ২.৪৯ কোটিতে দাঁড়িয়েছে। যা ২০০৯ সালে ছিল ১.০৮ কোটি।

এদিকে গত কয়েক বছরে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলোতে প্রায় ৪৫ লাখ পরিবার সৌর বিদ্যুৎ সুবিধা পাচ্ছে বলেও জানা গেছে।

২.৪৯ কোটি বিদ্যুৎ গ্রাহক এবং ৪৫ লাখ সৌরবিদ্যুৎ গ্রাহক একত্রে দেশের মোট জনসংখ্যার ৮০ শতাংশ মানুষকে বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় নিয়ে এসেছে বলে জানিয়েছেন পাওয়ার সেলের এক কর্মকর্তা।

তিনি বলেন, আরো অধিক মানুষকে বিদ্যুৎ সুবিধা দিতে, বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সরবরাহ কর্তৃপক্ষ বিদ্যুতের উৎপাদন বাড়িয়েছে, বিদ্যুৎ সরবরাহের লাইন সম্প্রসারণ করেছে এবং সিস্টেম লস কমিয়ে এনেছে।

এ বছর বিদ্যুৎ উৎপাদন সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়ে ১৫ হাজার ৩৭৯ মেগাওয়াটে দাঁড়িয়েছে। যা ২০০৯ সালে ছিল ৪ হাজার ৯৪২ মেগাওয়াট। মাথাপিছু বিদ্যুৎ উৎপাদন ২২০ কিলোওয়াট-ঘণ্টা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৪০৭ কিলোওয়াট-ঘণ্টা হয়েছে। বিদ্যুৎ সরবরাহ লাইন ১.৪১ লাখ কিলোমিটার পর্যন্ত সম্প্রসারণ করা হয়েছে বলেও তিনি জানান।

পাওয়ার সেলের মহাপরিচালক প্রকৌশলী মোহাম্মদ হোসাইন বলেন, ২০১৭ সালের ২৭ মে দৈনিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের সর্বোচ্চ রেকর্ড ছিলো ৯৪৭১ মেগাওয়াট।

তিনি বলেন, এ সময়টাতে কার্যকর পর্যবেক্ষণের ফলে সিস্টেম লস ১৬.৮৫ শতাংশ থেকে কমে ১৩.১০ শতাংশে এসেছে।

মোহাম্মদ হোসাইন আরো বলেন ২০২১ সালের মধ্যে ২৪ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে সরকার। এ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে

১১ হাজার ৩৬৩ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রিডে যোগ করতে ২০১৭ সাল থেকে ২০২১ সালের মধ্যে আরো ৩৪টি বিদ্যুৎ কেন্দ্র চালু করা হবে।
৪ হাজার ৯১৭ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন সক্ষমতা সম্পন্ন আরো ৩৪টি বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের জন্য ইতিমধ্যে দরপত্রের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। এ কেন্দ্রগুলো ২০১৮ থেকে ২০২৩ সালের মধ্যে কার্যক্রম শুরু করতে পারবে বলেও আশা প্রকাশ করা হচ্ছে।

৬ হাজার ৪১৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন সক্ষমতা সম্পন্ন আরো ১১টি বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনাও সরকারের রয়েছে।

পাওয়ার সেলের মহাপরিচালক হোসাইন আরো বলেন, দেশে বিদ্যুৎ উৎপাদন সক্ষমতা বৃদ্ধির পাশাপাশি প্রতিবেশী দেশগুলো থেকেও বিদ্যুৎ আমদানি করার পরিকল্পনা করছে সরকার। তিনি বলেন, ভারতের পাশাপাশি নেপাল ও ভূটান থেকে বিদ্যুৎ আমদানি করার বিষয়ে আলোচনা চলছে। বঙ্গোপসাগরে ৮০ কিলোমিটার সাবমেরিন কেবল স্থাপন করে সন্দীপ উপজেলাসহ আরো কয়েকটি দ্বীপ ও চরাঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হবে বলেও তিনি জানান।

প্রতিবেদন : একেএম কামালউদ্দিন চৌধুরী, অনুবাদ : সৈয়দ এলতেফাত হোসেইন

## গ্রামীণ অর্থনীতিকে এগিয়ে নিচ্ছে বিদ্যুৎ সংযোগ

আমিনুল ইসলামের আর্থিক কষ্টের দিন প্রায় দূর হয়েছে। নিয়মিত আয়ের পথ খুঁজে পেয়ে তার জীবনের অনিশ্চয়তাও কেটে গেছে। গত মার্চে বিদ্যুৎ সংযোগ পাওয়ার পর তিনি জাহানাবাদ বাজারে ওয়েল্ডিংয়ের কাজ শুরু করেন।

এর আগে মোহনগঞ্জ উপজেলার পূর্বপাড়া গ্রামের ৩০ বছরের আমিনুল অন্যের ওয়েল্ডিংয়ের দোকানে দিনমজুর হিসেবে কাজ করতেন। কিন্তু সীমিত আয়ে তিনি চার সদস্যের পরিবারকে ভালোভাবে চালাতে পারতেন না।

সমস্যা কাটিয়ে ওঠার পর এখন তিনি প্রতি মাসে ১২ থেকে ১৫ হাজার টাকা আয় করেন। সংসারের খরচ বাদ দেয়ার পরও প্রতিদিন কিছু সঞ্চয়ও করতে পারেন। একটি বিদ্যুৎ সংযোগ তার জীবনে পরিবর্তন এনে দিয়েছে।

আমিনুলের মতো চারঘাট উপজেলার সারদা ইউনিয়নের চক ঝিকরা গ্রামের সুফিয়া বেগম, রবিউল ইসলাম ও মারুফা বেগম এবং খারদাগোবিন্দপুর গ্রামের আসমা বেগম ও মকবুল হোসেন আরো অনেকেই বিদ্যুৎ সংযোগ পেয়েছেন। তারা প্রত্যেকেই পোল্ট্রি খামার, ক্ষুদ্র ব্যবসাসহ বিভিন্ন আয় উপার্জনের সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করেছেন।

আত্মনির্ভরশীল হওয়ার জন্য পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (আরইবি) এবং রাজশাহী পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি (আরপিবিএস) পবা, মোহনপুর, দুর্গাপুর, তানোর এবং গোদাগাড়ি উপজেলায় ১৯৯৬ সাল থেকে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান করে আসছে।

আরপিবিএস এই পর্যন্ত ৪ হাজার ২৮৫ কিলোমিটার বিদ্যুৎ লাইনের মাধ্যমে ১ লাখ ৯৯ হাজার ৮৭২টি গ্রাহক সংযোগ দিয়েছে। এর মধ্যে ১ লাখ ৮৩ হাজার ৭১৬টি গৃহ সংযোগ, ২ হাজার ৭৬৮টি সেচ পাম্প, ৮ হাজার ৮৪১টি বাণিজ্যিক সংযোগ, ১ হাজার ১১২টি শিল্প কারখানা এবং ৩ হাজার ২৮৯টি দাতব্য প্রতিষ্ঠানে সংযোগ দিয়েছে।

এ ছাড়া আগামী বছর জুনের মধ্যে প্রধানমন্ত্রীর অঙ্গীকার অনুযায়ী শতভাগ বিদ্যুতায়ন কর্মসূচির অংশ হিসেবে সব উপজেলাকে বিদ্যুৎ বিতরণের আওতায় আনার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির মহাব্যবস্থাপক প্রকৌশলী মোজাম্মেল হক বলেন, আগামী জুনের মধ্যে জেলার পাঁচটি উপজেলাকে বিদ্যুতায়িত করা হবে।

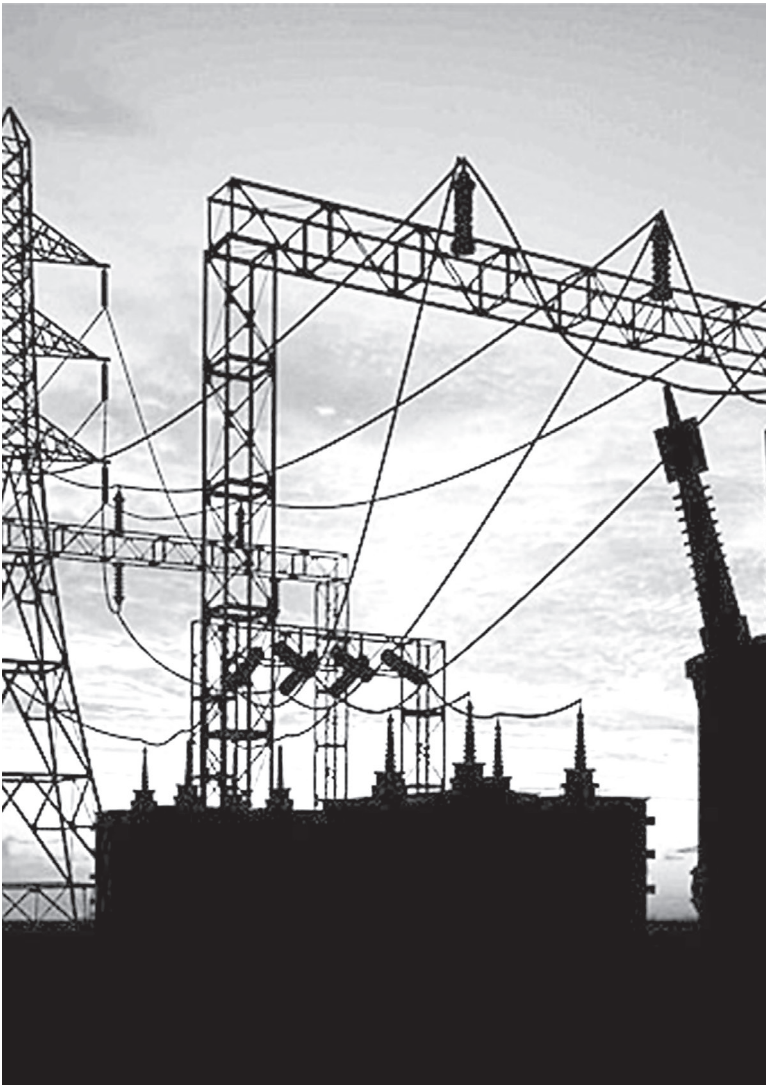

তিনি বলেন, ২০১৬-এর ডিসেম্বরের মধ্যেই পবা ও দুর্গাপুর উপজেলাকে শতভাগ বিদ্যুতের আওতায় আনা হয়েছে। আর মোহনপুরকে ২০১৭-এর জুনের মধ্যে ও তানোর উপজেলাকে ২০১৭-এর ডিসেম্বরের মধ্যে শতভাগ

বিদ্যুতের আওতায় এবং গোদাগাড়ি উপজেলাকে ২০১৮-এর জুনের মধ্যে শতভাগ বিদ্যুতের আওতায় আনা হবে।

আরপিবিসের এর মহাব্যবস্থাপক আরো বলেন, মানুষের জীবনমান উন্নয়নের পাশাপাশি দেশের উন্নয়নের গতি বৃদ্ধিতে বিদ্যুৎ সরবরাহ অপরিহার্য এবং এর কোনো বিকল্প নেই। এ জন্য বর্তমান সরকার এই খাতকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিচ্ছে এবং বিদ্যুতের উন্নয়নে ব্যাপক ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে।

১৯৯৬ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে বিদ্যুৎ সেবা প্রদানের মাধ্যমে জেলার কৃষি, শিল্প ও আর্থসামাজিক উন্নয়নে রাজশাহী পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি (আরপিবিএস) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। আরপিবিএস কর্তৃক পরিচালিত গ্রামীণ বিদ্যুতায়ন কর্মসূচি দেশের অন্যান্য অঞ্চলের মতো গ্রামীণ এলাকার আর্থসামাজিক কাঠামো উন্নয়নে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে।

এদিকে, যৌক্তিক মূল্যে জনসাধারণের মাঝে বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিতে বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের (পিডিবি) উল্লেখযোগ্য সাফল্য রয়েছে। নর্থ জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেডের সহকারী প্রধান প্রকৌশলী খালেদা ইয়াসরিবা লিমা বলেন, রাজশাহী বিভাগের আট জেলায় আমাদের ভোক্তা পর্যায়ে ৭ লাখ ৩০ হাজার সংযোগ এবং ১৯ হাজার ৫শ’ সেচ পাম্পের সংযোগ রয়েছে। যা ২০০৯ সালে ছিল ৩ লাখ ৯৮ হাজার এবং ১৭ হাজার ৫৫০টি। এ পর্যন্ত ৭ হাজার ৮১৪ কিলোমিটার লাইন ১ হাজার ১২ গ্রিডের সাব-স্টেশনের মাধ্যমে ভোক্তা পর্যায়ে বিতরণ করা হয়েছে।

সিস্টেম লস ১৪ দশমিক ৬৫ থেকে কমিয়ে ১০ দশমিক ৫০-এ আনা হয়েছে। নবায়নযোগ্য জ্বালানির উন্নয়নের অংশ হিসেবে জীবাশ্ম জ্বালানির ওপর ধীরে ধীরে ক্রমবর্ধমান চাপ কমানোর জন্য বসতবাড়িতে ৪০ হাজার সৌরবিদ্যুৎ সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে বলে প্রকৌশলী লিমা জানান।

প্রতিবেদন : আয়নাল হক, অনুবাদ : সুফি ইমরান

## বিদ্যুৎ সংযোগ বদলে দিয়েছে গ্রামীণ জীবনচিত্র

বাটিয়াঘাটা কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র বাসব নন্দী এখন প্রতিদিনের হোম ওয়ার্ক শেষ করেই কলেজে যেতে পারেন। তিন মাস আগে তার বাড়িতে বিদ্যুৎ সংযোগ পাওয়ায় তাদের জীবনযাত্রাই বদলে গেছে। এজন্য তিনি খুব খুশি।

খুলনা জেলার বটিয়াঘাটা উপজেলার প্রত্যন্ত এলাকা ঝড়ভাঙা গ্রামের বাসিন্দা বাসবের বাবা পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারী একজন ক্ষুদ্র চাষী।

বাসব বলেন, 'আমার এইচএসসি পরীক্ষার প্রস্তুতি নিয়ে আমি সত্যিই খুব চিন্তিত ছিলাম। কারণ, আমার বাবা যা আয় করেন তা দিয়ে আমার পড়ালেখার জন্য কেরোসিন কেনার সামর্থ্য তার নেই। কিন্তু তিন মাস আগে সরকারের ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেয়ার কর্মসূচির অংশ হিসেবে পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির মাধ্যমে বিদ্যুৎ সংযোগ পাওয়ায় শুধু আমার পরিবার নয়, পুরো গ্রামের চিত্রই বদলে গেছে।'

বাসবের মতো এই এলাকার ক্ষুদ্র চাষিরাও বিদ্যুৎ সংযোগ পেয়ে খুশী। বিদ্যুৎ সংযোগ থাকায় তারা এখন কম খরচে জমি সেচের পাশাপাশি টেলিভিশন দেখা এবং অন্যান্য বৈদ্যুতিক সুবিধা ব্যবহার করতে পারছেন।

হাটবাটিয়া গ্রামের কৃষক প্রহ্লাদ চন্দ্র জোয়ার্দার (৬৫) বলেন, 'আগে আমাদের ফসল বোনার জন্য বৃষ্টির পানির জন্য অনিশ্চিত অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় ছিল না। বৃষ্টির ভরসায় থেকে যথাসময়ে সেচ ও ফসল চাষ করা সম্ভব হতো না। আশানুরূপ ফসল ফলানোও ছিল কঠিন।'

কিন্তু এখন জোয়ার্দারের মতো শত শত কৃষক সেচের জন্য পানির পাম্প ব্যবহার করতে পারছেন। যথাসময়ে ফসল চাষ শুরু করায় একই পরিমাণ জমিতে উৎপাদনও বেড়েছে।

পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি সূত্রে জানা যায়, উপজেলার সাত ইউনিয়নের প্রায় ৩০ হাজার পরিবার পল্লী বিদ্যুতের আওতায় এসেছে। বাকি আট হাজার পরিবার ২০১৮ সালের জুন মাসের মধ্যেই পল্লী বিদ্যুৎ সংযোগ পাবে।

পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির সহকারি মহাব্যবস্থাপক সাঈদ হোসেন বলেন, 'বিদ্যুতের সরবরাহ ভালো থাকায় এই এলাকায় লোড শেডিং নেই।' তবে তিনি এও উল্লেখ করেন যে, ভর্তুকি দিয়ে বিদ্যুৎ সংযোগ চালু রাখায় সমিতি এখনও লোকসানে রয়েছে।

তিনি বলেন, পিডিবি'র কাছ থেকে প্রতি ইউনিট বিদ্যুৎ ৪.৫১ টাকা দরে কিনে ৩.৮১ টাকা দরে বিক্রি করা হয়। একারণে ১১.৫৪ শতাংশ সিস্টেমলস রয়েছে।

উপজেলার কিসমত ফুলতলা, গাগমারি এবং হাটবাটি এলাকা সরেজমিন পরিদর্শনে গিয়ে দেখা যায়, এলাকার জরাজীর্ণ অনেক ঘরেই চলছে টেলিভিশন। অনেক বাড়িতেই বৈদ্যুতিক পাখা, ফ্রিজ, রাইস কুকার ও অন্যান্য বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম ব্যবহার করছে।

বিদ্যুৎ সংযোগ তাদের জীবনে বিনোদনের ব্যবস্থাও করেছে। মোহাম্মদ আলী, লুৎফর রহমান, শংকর মন্ডলসহ অনেক গ্রামবাসী বিদ্যুৎ সংযোগে সন্তোষ প্রকাশ করে বলেন, 'বৈদ্যুতিক সংযোগ না থাকায় আগে আমরা টেলিভিশন দেখতে পেতাম না।'

বটিয়াঘাটা কলেজের সহকারি অধ্যাপক বাসুদেব মন্ডল বাসসকে বলেন, এলাকার ঘরে ঘরে বৈদ্যুতিক সংযোগ এলাকাবাসীর জীবনধারা বদলে দিয়েছে এবং তা গ্রামীণ অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে।

প্রতিবেদন: এস এম জাহিদ হোসেইন, অনুবাদ : মাহফুজা জেসমিন

## ১ হাজার মেগাওয়াট সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিকল্পনা করছে বেজা

বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেজা) চাঁদপুর জেলার বাহের চরে ১ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন একটি সৌর বিদ্যুৎ জোন স্থাপনের পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে। ক্রমবর্ধমান বিদ্যুতের চাহিদা মেটাতে ও 'ভিশন-২০২১' এবং 'ভিশন-২০৪১' বাস্তবায়ন করতে এ উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

বেজার নির্বাহী চেয়ারম্যান পবন চৌধুরী বাসসকে বলেন, 'প্রায় ৪ হাজার একর জমির ওপর আমরা সৌরবিদ্যুৎ জোন (সোলার পাওয়ার জোন) স্থাপন করতে যাচ্ছি। এই জোন স্থাপনের জন্য জমি অধিগ্রহণের কাজ চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।'

পবন চৌধুরী বলেন, প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের অনুমোদনের পর জোনের নাম নির্ধারণ করা হবে। তবে এ সৌরবিদ্যুৎ জোনের নাম 'বঙ্গবন্ধু সোলার পাওয়ার জোন' হওয়ার কথা আছে বলে তিনি জানান।

বেজা প্রধান আরো জানান, বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড এবং পাওয়ার চায়না দেশের সর্ববৃহৎ সোলার জোন বাস্তবায়নে আগ্রহ প্রকাশ করেছে। তিনি বলেন, সোলার জোনটি দ্রুত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আমরা বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডকে ১ হাজার একর ও পাওয়ার চায়নাকে ৩ হাজার একর জমি বরাদ্দ দেয়ার পরিকল্পনা করছি।

সোলার জোন বাস্তবায়নের কাজ শীঘ্রই শুরু হবে বলে আশা প্রকাশ করে বেজা প্রধান বলেন, আগামী বছরের মধ্যে জোনটির আংশিক কার্যক্রম শুরু হওয়ার কথা আছে। এ ধরনের উন্নয়নমূলক কাজ খুব একটা সময় নেয় না বলেও জানান তিনি।

চরাঞ্চলের বালুচর চাষাবাদের উপযুক্ত নয় বলে এই অঞ্চলগুলোতে বিদ্যুৎ জোন তৈরি হলে জমিগুলোর যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত হবে বলে মত দেন বেজা প্রধান।  তিনি বলেন, 'পাওয়ার জোনের জন্য নির্বাচিত জমি কোনো শস্য চাষের উপযোগী নয়। তাই এগুলো নবায়নযোগ্য বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য বেশ উপযোগী'।

এক প্রশ্নের জবাবে বেজা প্রধান বলেন, দ্রুত শিল্পায়নের জন্য বিদ্যুতের চাহিদা মেটাতে ও নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করতে পাওয়ার জোনকে জাতীয় গ্রিডের সাথে সংযুক্ত করা হবে। তিনি বলেন, ২০২১ সালে ২৪ হাজার মেগাওয়াট ও ২০৪১ সালে ৬০ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্য রয়েছে সরকারের।

বিদ্যুৎ বিভাগের সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, বিদ্যুৎ উৎপাদন সক্ষমতা ৪ হাজার ৯৪২ মেগাওয়াট (২০০৯) থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৫ হাজার ৩৭৯ মেগাওয়াটে উন্নীত হওয়ার মাধ্যমে দেশের বিদ্যুৎ খাত ব্যাপক সফলতা লাভ করেছে। বর্তমানে দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৮০ শতাংশ মানুষ বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় এসেছে।

এদিকে বহুমাত্রিক শিল্প, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি, উৎপাদন ও রফতানির মাধ্যমে দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ২০৩০ সালের মধ্যে সারা দেশে ১০০টি অর্থনৈতিক জোন প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনাও গ্রহণ করেছে বেজা।

অর্থনৈতিক অঞ্চলে বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে, আইনি প্রতিবন্ধকতা দূর করতে সরকার ইতিমধ্যে প্রয়োজনীয় আইন এবং নিয়ম-নীতি তৈরি করেছে। বিনিয়োগকারীদের জন্য হয়রানিমুক্ত পরিবেশ তৈরি করতে ওয়ান স্টপ সার্ভিস সেন্টারে'র অধীনে গ্যাস, পানি এবং বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিতসহ অর্থনৈতিক ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা প্রদানে সহযোগিতার জন্য সরকার প্রয়োজনীয় নিয়ম-নীতিও তৈরি করেছে। অর্থনৈতিক অঞ্চলে বিনিয়োগকারীদের বিদ্যুতের ওপর ভ্যাট ও আয়কর অব্যহতি দেয়ার পাশাপাশি সরকার বিভিন্ন ধরনের প্রণোদনাও ঘোষণা করেছে।

প্রতিবেদন : একেএম কামালউদ্দিন চৌধুরী, অনুবাদ : সৈয়দ এলতেফাত হোসেইন

## রংপুরে বিদ্যুৎচালিত সেচপাম্প কৃষিকে লাভজনক করেছে

বিদ্যুৎচালিত সেচ ব্যবস্থা চাষের খরচ কমিয়ে এবং উৎপাদন বাড়িয়ে রংপুর জেলার কৃষি খাতকে আরো লাভজনক করে তুলেছে।

কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগের উপ-পরিচালক (ডিএই) এসএম আশরাফ আলী সম্প্রতি জানান, বিদ্যুৎচালিত ৯২১টি গভীর নলকূপ ১৬ হাজার ৭৫১টি অগভীর নলকূপ এবং পাঁচটি লো-লিফট পাম্পের মাধ্যমে জেলার ৬৫ হাজার হেক্টর জমিতে সেচ দেয়া হচ্ছে।

তিনি আরো বলেন, এর পাশাপাশি ৬৮ হাজার হেক্টর জমিতে সেচ দেয়ার লক্ষ্যে কৃষকরা চারটি ডিজেলচালিত গভীর নলকূপ, একটি সৌর বিদ্যুৎচালিত গভীর নলকূপ, ৫৬ হাজার ১৩১টি ডিজেলচালিত অগভীর নলকূপ, ৬৫টি সৌরবিদ্যুৎ চালিত অগভীর নলকূপ এবং ২০টি ডিজেল চালিত লো লিফট পাম্প ব্যবহার করছে।

কৃষকরা বিদ্যুৎচালিত নিজস্ব সেচ পাম্প এবং বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) এবং বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিএমডিএ) পরিচালিত গভীর নলকূপ, অগভীর নলকূপ, লো লিফট পাম্প ব্যবহার করে সেচ সুবিধা পাচ্ছে।

পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (আরইবি) পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি (পিবিএস) এবং নর্দান জোন বিদ্যুৎ বিতরণ কোম্পানি লিমিটেডের মাধ্যমে সেচ পাম্পের জন্য বিদ্যুৎ সরবরাহ করছে।

বিদ্যুৎচালিত সেচ সুবিধা ব্যবহার করে কৃষকরা ২০১৬ সালের ১১.৫২ লাখ টন আলুর স্থলে ২০১৭ সালে ১৩ লাখ ৩৪ হাজার টন আলু উৎপাদন করে এবং ২০১৬ সালের ২ লাখ ৫২ হাজার টনের স্থলে ২০১৭ সালে তিন লাখ টন শাকসবজি রফতানি করে।

আশরাফ আলী আরো বলেন, এখানে বেশি পানি নির্ভর ফসল চাষ নিরুৎসাহিত করার পরও কৃষকরা ২০১৭ সালে ৫.৪৪ লাখ টন বোরো ধান উৎপাদন করে, ২০১৬ সালে এই উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৫.৪৬ লাখ টন এবং ২০১৫ সালে ৫.৬১ লাখ টন বোরো ধান উৎপাদিত হয়।

বাসসের সঙ্গে আলাপকালে সদর উপজেলার নাজিরঙ্গী গ্রামের কৃষক আরিফুল হক বাতুল বলেন, তিনি নিজের বিদ্যুৎচালিত সেচপাম্প ব্যবহার করে তার সাড়ে তিন একর জমিতে বোরো চাল ও অন্যান্য শস্য চাষ করেন।

আরিফুল মাত্র ৩ হাজার টাকা খরচ করে তার বিদ্যুৎচালিত সেচ পাম্প ব্যবহার করে এক একর বেলেমাটির জমিতে বোরো ধান চাষ করছেন। পক্ষান্তরে একই পরিমাণ জমি চাষে অন্য কৃষকরা নিজস্ব ডিজেলচালিত অগভীর নলকূপ ব্যবহার করে একরপ্রতি ১০ হাজার টাকা খরচ করছেন।

'আরইবি'র রংপুর পিবিএস-১ এর সরবরাহকৃত প্রতি ইউনিট ৩.৮২ টাকা দরের বিদ্যুৎ দিয়ে আমি আমার সেচপাম্প চালাচ্ছি। এতে মোট বিদ্যুৎ বিলের ওপর ২০ শতাংশ ভর্তুকি দেয়া হয়। তিনি তার জমিতে আলু, সবজি ও অন্যান্য ফসলও চাষ করেন।

মিঠাপুকুর উপজেলার তাহিরপুর গ্রামের আবুল হোসেন বলেন, তিনি এক একর বেলে-দোআঁশ মাটির জমিতে ডিজিটাইজড প্রিপেইড কার্ড ব্যবহার করে বিএমডিএর গভীর নলকূপ থেকে সরবরাহকৃত সেচের পানি ব্যবহার করে জমিতে বোরো ধান উৎপাদন করেন।

তিনি বলেন, 'আমি বিদ্যুচালিত গভীর নলকূপ থেকে সেচের পানি ব্যবহার করে বোরো ধান চাষের জন্য একর প্রতি ২১০০ টাকা খরচ করছি তবে আলু, সবজি, ভুট্টা, আউশ ধান এবং অন্যান্য শস্যের চাষের জন্য সেচ খরচ অনেক কম।'

বিএমডিএর নির্বাহী প্রকৌশলী রেজা মো. নুর আলম জানান, বিএমডিএ-র ৬৭৪টি বিদ্যুৎ চালিত গভীর নলকূপ থেকে ডিজিটাল প্রিপেইড কার্ড ব্যবহার করে ঘণ্টাপ্রতি ১০০ টাকা হারে সারচার্জ প্রদানের মাধ্যমে কৃষকরা সেচ সুবিধা পাচ্ছে।

তিনি বলেন, আমরা ১২ হাজার ৫৯৯ হেক্টর জমিতে বোরো ধান চাষ, ২০৮ হেক্টর গম, ৩ হাজার ৬৩৩ হেক্টর আলু, ৬৫২ হেক্টর ভুট্টা, ২৬৮ হেক্টর সরিষা, ১৯ হাজার ৬২ হেক্টর আউশ এবং ১ হাজার ৬০৬ হেক্টর জমিতে অন্যান্য ফসল চাষের জন্য সেচ দেই।'

কাওনিয়া উপজেলার রাজীব গ্রামের কৃষক মাহবুব হোসেন জানান, তিনি স্থানীয় একটি কৃষক গ্রুপের সদস্য। একটি স্কিমের অধীনে বিএডিসি থেকে ভাড়া করা গভীর নলকূপ থেকে দেয়া সেচের পানি ব্যবহার করে নিজের এক একর জমিতে বোরো ধান ও অন্যান্য ফসল চাষ করেছেন।

তিনি বলেন, 'এই প্রকল্পের অধীনে বোরো চাষের জন্য সেচের খরচ দাঁড়িয়েছে একর প্রতি ২ হাজার থেকে ২ হাজার ২০০ টাকা, সেখানে মোট ১২০ একর জমিতে অন্যান্য ফসল চাষ হচ্ছে।'

বিএডিসির সহকারী প্রকৌশলী শাহে আলম জানান, তার সংস্থা সারা জেলায় বিভিন্ন গ্রুপের সংগঠিত কৃষকদের সেচ প্রকল্পে ভাড়ার ভিত্তিতে ২৩০টি গভীর নলকূপ, ২২ টি অগভীর নলকূপ এবং ছয়টি লো লিফট পাম্পের মাধ্যমে সেচ সুবিধা প্রদান করছে।

আরইবি'র সুপারিন্টেন্ডিং ইঞ্জিনিয়ার বলেন, কৃষকরা কম খরচে খাদ্য উৎপাদন বাড়ানোর জন্য পিবিএস পাম্পের মাধ্যমে ব্যবহৃত বিদ্যুতের ওপর ২০ শতাংশ হারে সরকারি ভর্তুকি পেয়ে থাকেন।

নর্দান জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেডের নির্বাহী প্রকৌশলী গোলাম মুর্তজা বলেন, ইউনিট প্রতি প্রায় আট টাকা উৎপাদন খরচের বিপরীতে কোম্পানি কৃষকদের জন্য প্রতি ইউনিট ৩ টাকা ৮২ পয়সা দরে সেচপাম্পের বিদ্যুৎ সরবরাহ করে।

প্রতিবেদন : মামুন ইসলাম, অনুবাদ : রুহুল গণি জ্যোতি

## 80pc people now get electricity

The country's power sector showed a rapid growth in recent years, with currently providing 80 per cent of the country's total population effective access to electricity, according to official sources.

The latest data of Power Division of the Ministry of Power, Energy and Mineral Resources showed that the number of electricity customers rose to 2.49 crore in 2017 from 1.08 crore in 2009.

Nearly 45 lakh households in remote areas across the country also got solar power system in the past few years.

The 2.49 crore customers together with the 45 lakh home solar systems effectively made electricity available to 80.0 per cent of the country's total population, said a Power Cell official.

For providing more people with electricity, the power generation and supply authorities significantly increased the generation, expanded distribution lines and cut system loss, the official said.

The electricity generation capacity rose this year to 15,379 megawatts (MW) from 4,942 MW in 2009 when the per capita power generation surged to 407 kwh (Kilowatt-Hour) from 220 kwh. The distribution lines also expanded to 1.41 lakh kilometers. The daily power generation hit the record high at 9471 MW on May 27, 2017, Director General of Power Cell Engineer Mohammad Hossain said.

He said the system loss during this period also declined to 13.10 per cent from 16.85 per cent with effective monitoring.

He said the government set a target of generating 24,000 MW power by 2021.

To achieve this goal, 34 power plants would come into operation from 2017 to 2021, adding 11,363 MW to the national grid.

Tender process has been initiated for another 34 power plants having a total capacity of 4,917 MW. These plants are expected to start operation from 2018 to 2023 in phases.

The government has also a plan to construct 11 power plants with a total capacity of 6,415 MW.

Apart from increasing domestic generation capacity, the government would import more power from neighbouring countries, Hussain said.

"Talks are now going on for importing electricity from Nepal and Bhutan besides India," he said.

The official said Sandwip upazila and some other islands and chars would be supplied electricity by setting up about 80-kilometres submarine cable in the Bay.

Report : A K M Kamaluddin Chowdhury

## Power supply gives new life to rural people

Aminul Islam has almost eradicated his financial hardship and uncertainty as he got a way of regular earning.

After getting electricity connection, he started a welding business at Jahanabad Bazar.

Earlier, the 30-year-old Aminul, a resident of Purbapara village under Mohanpur upazila in the district, used to work as a day-labourer in other's welding shop.

But, he couldn't manage his four-member family properly as he faced a lot of troubles with his low earning.

At present, he earns Taka 12,000 to 15,000 per month. After overcoming the problems, he attained capability of saving some money every day. And it is the power connection which played the key role in changing his life.

Like Aminul, Sufiya Begum, Rabiul Islam and Marufa Begum of Chalk Jhikra village and Asma Begum and Mokbul Hossain of Khardagovindapur village under Sardaha Union Parishad in Charghat upazila also got electricity connection. They are now engaged in various income-generation activities like household poultry farming, small business and tailoring.

Local office of Rural Electrification Board (REB) along with its Rajshahi Pally Bidyut Samity (RPBS) is giving new power connections to the rural people facilitating them to become self-reliant.

RPBS has been distributing power supply to Paba, Mohanpur, Durgapur, Tanore and Godagari upazilas of the district since 1996, contributing a lot towards improving socio-economic condition of the people.

The RPBS has, so far, commissioned 4,285 kilometres of distribution line providing power connections to 1,99,872 clients including 1,83,716 houses, 2,768 irrigation pumps, 8,841 commercial establishments, 1,112 industrial units and 3,289 charitable organisations.

Meanwhile, a target has been set to bring all upazilas of the district under power supply network by June next year as part of the Prime Minister's 100 per cent electrification programme.

"We are pledge-bound to bring all areas of five upazilas in the district that fall in our jurisdiction under power supply network by June next year," said Engineer Mozammel Haque, general manager of RPBS.

He said 100 per cent households in Paba and Durgapur upazilas were already brought under power supply coverage in December last. Mohanpur and Tanore upazilas are scheduled to be brought under the network by this June and December respectively and the rest Godagari upazila by June next year.

The RPBS general manager said power supply is indispensable and there is no alternative to it for elevating the living condition of the people besides accelerating the country's development.

"That's why the present government has attached highest priority to the sector and has been implementing massive and effective projects," he said.

Engineer Haque said since its inception in 1996, RPBS is playing a vital role in agricultural, industrial and socio economic development of the district through providing power services.

The rural electrification programme being "carried out by RPBS has helped in the development of socio economic condition of rural areas in the district", he said.

Meanwhile, there is a significant success of Power Development Board (PDB) in ensuring quality power supply to all people at rational and tolerable price in the region.

"Now, we have 7.30 lakh consumers and 19,500 irrigation connections in eight districts under Rajshahi division," said Khaleda Easriba Lima, assistant chief engineer of Northern Zone Power Distribution Company Limited."The number was 3.98 lakh and 17,550 respectively in 2009," he added.

It has, so far, commissioned 7,814 kilometres of distribution line with 1012 grid substations supplying power to the clients. Load demand has now increased to 962 megawatts from 407 mw in 2009. System loss has been reduced to 10.50 per cent from 14.65 per cent.

As part of promoting renewable energy to lessen the rising pressure on fossil fuel, 40,000 solar home systems were installed in the district, Engineer Lima said.

Report : Aynal Haque

## Electricity changes lifestyle of Khulna people

Basab Nandi, 20, a second year student of Batiaghata College, are now happy as he can finish his homework every day, thanks to the power connection that his family home got about three months back.

Basob lives in Jharvanga, a remote village of Batiaghata upazila under the district with his family where his father is the only bread earner from small farming.

"My higher secondary exam is approaching and I was worried about it as I could not study at night due to lack of power supply to my house," said Basob, pointing out that his father's income was not enough to afford kerosene oil for his study lamp.

However, he said the scenario changed three months ago, with getting power connection from Pally Bidyut Samity under the government's policy of bringing all houses under power supply in phases.

Like Basob, residents of this area, mostly small farmers, were greatly happy with the power supply that made irrigation available for cropping and offering them the opportunities of watching television and using other electric gadgets.

"We had to pass days in uncertainties awaiting rain for cropping," Prahlad Chandra Zoarder, 65, a farmer of village Hatbatia said, noting that those days were difficult as yield was not assured and enough from rain-fed cropping.

Currently, Zoardar and hundreds other farmers are using water pumps for irrigation, which assured yield in time and more crops from the same amount of land because of timely irrigation.

According to Khulna Pally Bidyut Samity (PBS), a total of 33,000 families out of 38,000 of seven unions under Batiaghata upazila have been brought under power supply. Samity official said that the rest 5,000 families would get power connection by June 2018.

“There is no load shedding in this area”, Additional General Manager (AGM) of Pally Biddut Samity Sayeed Hossain said.

He, however, pointed out that the Samity was incurring loss as it supplies power to the rural people at subsidised rate.

“We sell per unit electricity at an average rate of Taka 3.81 while purchasing price from Bangladesh Power Development Board (BPDB) is Taka 4.51. There is also 11.54 per cent system loss”, he said.

While visiting village Kismot Phultala, Gagmari and Hatbati, this correspondent found that people were watching televisions at many thatched houses. Many of the residents are also using electric fans, refrigerators, rice cookers and other electrical equipments.

Several villagers including Mohammad Ali, Lutfar Rahman and Shankar Mondal said they could not enjoy television in their houses earlier due to lack of electricity.

Basudeb Mondal, an assistant professor of Batiaghata College said that electricity changes people’s lifestyle while rural economy is developing on power supply.

Report : S M Jahid Hossain

## BEZA to set up solar zone for 1000 MW electricity

Bangladesh Economic Zones Authority (BEZA) has planned setting up of a big solar power zone for generating at least 1000 megawatts (MW) of electricity, official sources said.

"The authority has started the process of acquiring around 4000 acres of land at Baher Char in Chandpur District to develop the solar power zone, which will be the country's biggest hub for alternative energy," BEZA Executive Chairman Paban Chowdhury told BSS.

The solar power zone could be named after father of the nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, provided that the approval is given from the Prime Minister Office (PMO), the BEZA chief said.

"Bangladesh Power Development Board (BPDB) and Power China have shown interest in developing the solar power zone," he said, noting that BPDB would get 1,000 acres land, keeping the rest 3,000 acres for Power China for setting up the solar power zone.

He hoped that the development of the solar power zone would begin soon so it could start generating electricity from late next year in phases.

"Unlike conventional power plant, setting up of solar power system does not take much time," Chowdhury said.

He said establishing of solar power zone would also ensure better use of sandy char land those are not suitable for cropping.

A big portion of the electricity would be supplied to the national grid to help meet the growing demand, Chowdhury said.

Besides developing the mega solar power zone, BEZA would give the Power Division nearly 2,000 acres of land at Mirersharai Economic Zone in Chittagong to develop another solar hub for producing 600MW electricity.

The government has a target of generating 24,000 MW of power in 2021 and 60,000 MW in 2041 for meeting the increasing demand for electricity. At least 10.0 per cent of the demand would be met from renewable sources including solar power system.

The country is now producing 15,379 MW of electricity to supply to 2.49 crore customers across the country. Nearly 45 lakh households in thousand of villages of the country also got solar power system in the past few years.

Report : A K M Kamaluddin Chowdhury

## Electricity-run irrigation making farm activities profitable

The electricity-run irrigation system are making farm activities more profitable by reducing crop cultivation cost and increasing food production in Rangpur district.

“Electricity-run 912 deep tubewells (DTWs), 16,751 shallow tubewells (STWs) and five low lift pumps (LLPs) are providing irrigation to some 65,000 hectares of land in Rangpur district,” said Deputy Director of the Department of Agricultural Extension (DAE) SM Ashraf Ali. Besides, he said the farmers are using four diesel-run DTWs, one solar powered DTW, 56,131 diesel-run STWs, 65 solar power-run STWs and 20 diesel-run LLPs for irrigation on over 68,000 hectares of land.

The farmers are getting electricity-run irrigation facilities using own irrigation pumps; and DTWs, STWs and LLPs being managed by Bangladesh Agriculture Development Corporation (BADC) and Barind Multipurpose Development Authority (BMDA).

The Rural Electrification Board (REB) through Palli Bidyut Samity (PBS) and Northern Zone Power Distribution Company Limited are providing electricity to irrigation pumps.

Expanding use of electricity-run irrigation facilities helped the farmers in producing 13.34 lakh tonnes of potato in 2017 against 11.52 lakh tonnes in 2016, three lakh tonnes vegetables in 2017 against 2.52 lakh tonnes in 2016 in the district, he said.

“Despite discouraging cultivation of high-irrigation water consumption crops, the farmers produced 5.44 tonnes of

Boro rice in 2017, 5.46 lakh tonnes in 2016 and 5.61 lakh tonnes of Boro rice in 2015 here," Ashraf added.

Talking to BSS, farmer Ariful Haque Batul of village Najirdigar under Sadar upazila said he cultivates Boro rice and other crops on his 3.50 acres of land using own electricity-run irrigation pump.

Ariful spends Taka 3,000 per acre of his sandy land for cultivating Boro rice using one electricity-run irrigation pump while other farmers are spending up to Taka 10,000 per acre there using own diesel-run STWs.

"The REB through Rangpur PBS-1 supplies electricity to my irrigation pump at Taka 3.82 per unit with 20 per cent subsidy on total bills," he said, adding that he also cultivates potato, vegetables and other crops on his land.

Abul Hossain of village Tahirpur under Mithapukur upazila said he cultivates Boro rice in his one acre of sandy-loamy land using prepaid digitised card to avail irrigation water being supplied from DTW by BMDA.

"I spend Taka 2,100 per acre of land for cultivation of Boro rice while irrigation cost is much lower for cultivation of potato, vegetables, maize, aus rice and other crops using irrigation water of electricity-run DTW," he said.

Executive Engineer of BMDA Reza Md Noor-e Alam said farmers are getting irrigation facilities at Taka 100 for an hour irrigation using subsidised prepaid card.

"We provide irrigation to 12,599 hectares of land for Boro rice cultivation, 208 hectares for wheat, 3,633 hectares for potato, 652 hectares for maize, 268 hectares for mustard, 19,062 hectares for aus and 1,606 hectares of land for cultivating other crops," he said.

Farmer Mahbub Hossain of village Rajib under Kawnia upazila said he cultivates Boro rice and other crops in his one acre land as a member of local Farmers' Group using irrigation water from the rental DTW of BADC under a scheme.

"Irrigation cost for cultivation of Boro rice stands around Taka 2,000 to 2,200 per acre under the scheme where various other crops are also being cultivated on a total of 120 acres of land," he said.

Assistant Engineer of BADC Shahe Alam said the organisation provides irrigation facilities with their 230 DTWs, 22 STWs and six LLPs through the farmers' groups under different schemes on rental basis across the district.

Superintend Engineer of REB said farmers are getting 20 per cent government subsidy on bills for consumption of electricity being provided by PBS to irrigation pumps for enhancing food production at reduced costs.

Executive Engineer of the Northern Zone Power Distribution Company Limited Golam Mortuza said the company provides electricity to irrigation pumps at Taka 3.82 against production cost of around Taka eight per unit.

Report : Mamun Islam

বিশেষ উদ্যোগ ৭

# কমিউনিটি ক্লিনিক ও মানসিক স্বাস্থ্য

## "শেখ হাসিনার অবদান, কমিউনিটি ক্লিনিক বাঁচায় প্রাণ"

## কমিউনিটি ক্লিনিক ও মানসিক স্বাস্থ্য


হাতের কাছে কমিউনিটি ক্লিনিক–বদলে গেছে গ্রামীণ স্বাস্থ্যসেবা ১৭৩

নিরাপদ সন্তান প্রসবের ক্ষেত্রে উপকূলের নারীদের সচেতন করে তুলেছে হেলথ ক্যাম্প ১৭৭

গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্যসেবায় নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান কমিউনিটি ক্লিনিক ১৮০

প্রসূতি স্বাস্থ্য সেবায় দরিদ্র নারীদের আস্থা অর্জন করেছে কমিউনিটি ক্লিনিক ১৮৪

খুলনার ১০ লাখ মানুষের দোরগোড়ায় মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবা ১৮৭

Rural people can now happily rely on community clinics 189

Health camp makes coastal women more aware of safe delivery 192

Community clinics draw global accolade 195

Community clinic earn confidence of poor mothers in Rangpur 198

10 lakh people in Khulna get better health services 201

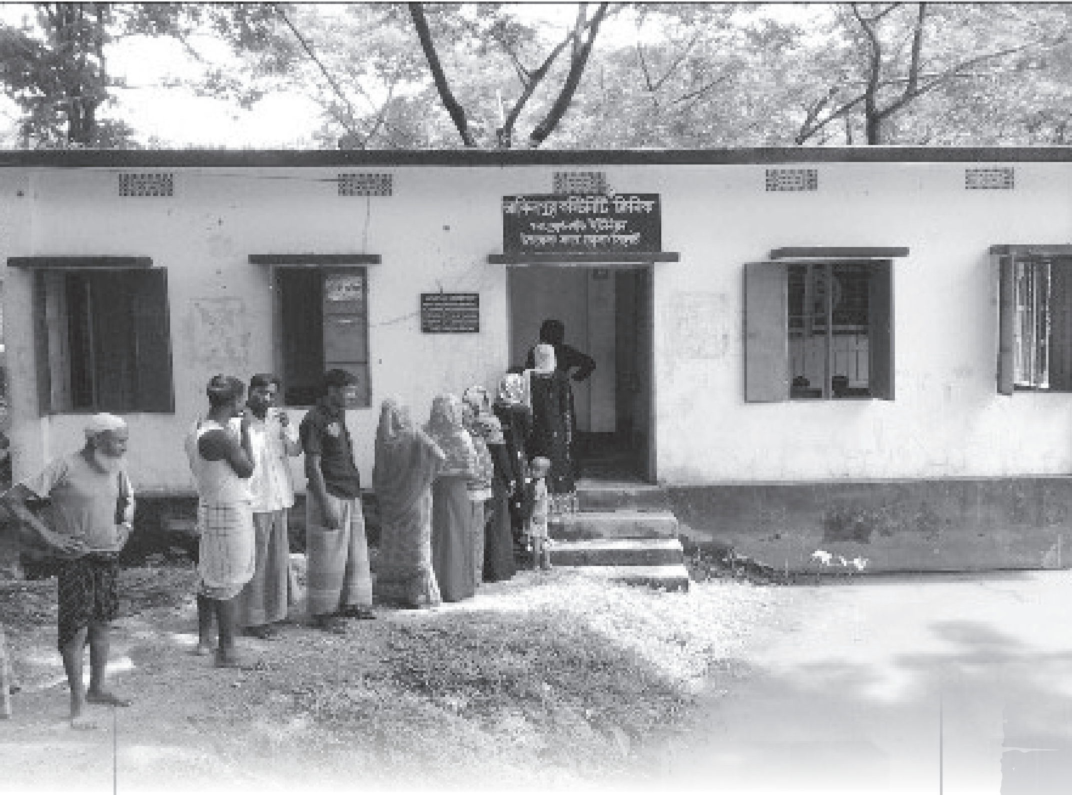

গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করাই এ কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য। এর আওতায় সন্তান সম্ভবা মায়েদের মাতৃত্বকালীন যাবতীয় সেবা নিশ্চিত করা, প্রজনন স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনার সব ধরনের সেবা প্রদান করা, জন্ম, মৃত্যু নিবন্ধন এবং নতুন বিবাহিত দম্পতি ও সন্তান সম্ভবা মায়েদের নিবন্ধিত করা, মা ও শিশুর খাদ্য ও পুষ্টির বিষয়ে সহায়তা প্রদান, বিভিন্ন স্বাস্থ্য সমস্যা বিষয়ে পরামর্শ প্রদান এবং জটিল স্বাস্থ্য সমস্যার ক্ষেত্রে উন্নততর চিকিৎসার জন্য উপজেলা ও জেলা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে প্রেরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

## অর্জন

- গ্রামের মানুষের দোরগোড়ায় স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছাতে প্রতি ৬ হাজার মানুষের জন্য একটি কমিউনিটি ক্লিনিক গড়ে তোলা হয়েছে।
- সারাদেশে ১৩ হাজার ১৩৬টি (জুন ২০১৬) কমিউনিটি ক্লিনিকের মাধ্যমে গ্রামের সুবিধাবঞ্চিত দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হচ্ছে।

- কমিউনিটি ক্লিনিক থেকে বিনামূল্যে ৩০ প্রকার ওষুধ সরবরাহের মাধ্যমে সাধারণ রোগের চিকিৎসা দেয়া হচ্ছে।

## ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

- প্রতি হাজারে শিশু মৃত্যুর হার ৪১ থেকে ৩৭-এ নামিয়ে আনা এবং প্রতি লাখে মাতৃ মৃত্যুর হার ১৯৪ থেকে ১০৫-এ নামিয়ে আনা।

- ১২ মাসের নিচের শিশুদের শতভাগ টিকাদান কর্মসূচির আওতায় আনা।
- দম্পতিদের জন্মনিয়ন্ত্রণ সুবিধার আওতায় আনার হার ৭৫ শতাংশে উন্নীতকরণ।
- গার্মেন্টস কারখানার নারী শ্রমিকদের সন্তানদের জন্য ডে-কেয়ার সেন্টার কর্মসূচির আওতায় শিশুদের দিবাকালীন সেবা প্রদান কার্যক্রম সম্প্রসারিত করা হবে।

তথ্য: http://communityclinic.gov.bd
ছবি: চলচিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর

## হাতের কাছে কমিউনিটি ক্লিনিক-বদলে গেছে গ্রামীণ স্বাস্থ্যসেবা

দেশের প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে স্বাস্থ্যসেবার সুযোগ গ্রামীণ মানুষের জীবনে এনেছে স্বস্তি। প্রথমদিকে সচেতনতার অভাবে কমিউনিটি ক্লিনিকে সেবা গ্রহিতাদের ভিড় না থাকলেও এখন ক্লিনিকগুলোতে রোগীর ভিড় ক্রমশ বাড়ছে। এই ক্লিনিকের মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলের মানুষের দোরগোড়ায় স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দেয়া হচ্ছে।

প্রকল্প কার্যালয় সূত্রে জানা যায়, বর্তমানে দেশে ১৩ হাজার ২৩৬টি কমিউনিটি ক্লিনিক থেকে স্বাস্থ্যসেবা দেয়া হচ্ছে। এখানে ৩০ প্রকার ওষুধ বিনামূল্যে বিতরণের পাশাপাশি স্বাস্থ্য, পরিবার-পরিকল্পনা ও পুষ্টিবিষয়ক পরামর্শ দেয়া হয়। বাড়ির কাছের মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবার কারণে বড় ধরনের অসুখ ছাড়া উপজেলা ও জেলা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যাওয়া কমিয়ে দিয়েছে প্রান্তিক জনপদের মানুষরা।

কমিউনিটি ক্লিনিক পরিদর্শন করে জানা যায়, এখানে সার্বিক প্রজনন স্বাস্থ্য পরিচর্যার আওতায় গর্ভবর্তী মহিলাদের প্রসব-পূর্ব (প্রতিষেধক টিকাদানসহ) এবং প্রসব-পরবর্তী (নবজাতকের সেবাসহ) সেবা দেয়া হয়। মৌলভীবাজার জেলার জুড়ী উপজেলার ভুকতেরা কমিউনিটি ক্লিনিকে কথা বলে জানা যায়, এই কমিউনিটি ক্লিনিকে এ পর্যন্ত দু'শতাধিক নবজাতক প্রসব করানো হয়েছে।

এখানে সেবা গ্রহণকারী মিনা রানী এই প্রতিবেদককে জানান, এই ক্লিনিকে সব চিকিৎসা হয়। ওষুধ কিনতে হয় না। ক্লিনিক থেকে বিনামূল্যে ওষুধ দেয়া হয়। আগে শহরে গিয়ে চিকিৎসা নিতে হতো। সময় লাগত বেশি, টাকাও খরচ হতো। কিন্তু এখন আর শহরে যেতে হয় না। সাধারণ রোগের চিকিৎসা তারা এখান থেকেই পাচ্ছেন।

কমিউনিটি ক্লিনিকগুলোতে সময়মতো প্রতিষেধক টিকাদান (যক্ষ্মা,ডিপথেরিয়া, হুপিং কফ, পোলিও, ধনুষ্টংকার, হাম, হেপাটাইটিস-বি, নিউমোনিয়া ইত্যাদি) শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের জন্য প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যসেবা দেয়া হয়। জনগণের জন্য বিশেষ করে মহিলা ও শিশুদের অপুষ্টি দূরীকরণের জন্য ফলপ্রসূ ব্যবস্থা গ্রহণ ও সেবা প্রদান করা হয়। ম্যালেরিয়া, যক্ষ্মা, কুষ্ঠ, কালা-

জ্বর, ডায়রিয়াসহ অন্যান্য সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা এবং সেগুলোর সীমিত চিকিৎসা সুবিধা রয়েছে। সাধারণ জখম, জ্বর, ব্যথা, কাটা/পোড়া, দংশন, বিষক্রিয়া হাঁপানি চর্মরোগ, ক্রিমি এবং চোখ, দাঁত ও কানের সাধারণ রোগের ক্ষেত্রে লক্ষণভিত্তিক প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান করা হয়। অস্থায়ী পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি সংক্রান্ত বিভিন্ন উপকরণ, যেমন- কনডম, পিল, ইসিপি ইত্যাদি সার্বক্ষণিক সরবরাহ ও বিতরণ নিশ্চিত করা হয়। জটিল রোগীদের প্রয়োজনীয় প্রাথমিক সেবা প্রদান করে দ্রুত উচ্চতর পর্যায়ে রেফার করা হয়। সদ্য বিবাহিত ও অন্তঃসত্ত্বা মহিলাদের নিবন্ধিকরণ ও সম্ভাব্য প্রসব তারিখ সংরক্ষণ করতে হয়। মহিলা ও কিশোর-কিশোরীদের রক্তস্বল্পতা শনাক্ত এবং প্রয়োজনীয় চিকিৎসা প্রদান করা হয়।

নাটোর জেলার বড়াইগ্রাম উপজেলা সদর কমিউনিটি ক্লিনিকের কমিউনিটি হেলথ কেয়ার প্রোভাইডার উজ্জ্বল কুমার বাসসকে বলেন, এই কমিউনিটি ক্লিনিক প্রকল্পের কারণে দেশের দরিদ্র মানুষ আজ সঠিকভাবে স্বাস্থ্যসেবা পাচ্ছে। কমিউনিটি ক্লিনিকগুলোতে রোগীর সংখ্যা আগের চেয়ে অনেক বেড়েছে। গড়ে প্রতিদিন প্রায় ৮০ জন রোগীকে এখান থেকে সেবা দেয়া হয়।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম কমিউনিটি ক্লিনিক প্রকল্পকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার চিন্তা প্রসূত ফসল হিসেবে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, রাজনৈতিক প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে এই প্রকল্প বন্ধ করে দিয়েছিল বিএনপি-জামায়াত জোট সরকার। আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় এসে প্রকল্পটি আবার চালু করে। আর এই প্রকল্পটি আজ বিশ্বে স্বাস্থ্যসেবার রোল মডেল হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রধান মার্গারেট চ্যান সম্প্রতি বাংলাদেশের স্বাস্থ্য খাতের সাফল্যকে রোল মডেল হিসেবে অনুসরণ করতে বিশ্ববাসীকে পরামর্শ দিয়েছেন। কমিউনিটি ক্লিনিকে সেবাগ্রহীতা ও সেবার মান বাড়ছে। ক্লিনিকের সুফল ভোগ করছে দেশের সাধারণ মানুষ। বাড়ির পাশেই বিনামূল্যে মিলছে স্বাস্থ্যসেবা। বর্তমানে প্রতি মাসে প্রায় এক কোটি মানুষ কমিউনিটি ক্লিনিক থেকে সেবা নেয়। তিনি বলেন, মা ও শিশু স্বাস্থ্যসেবার ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে কমিউনিটি ক্লিনিক। প্রতিটি ক্লিনিকেই সরবরাহ করা হয়েছে ল্যাপটপ।

কমিউনিটি ক্লিনিক প্রকল্পের সাবেক প্রকল্প পরিচালক ডা. মমতাজুল হক বলেন, কমিউনিটি ক্লিনিকের সেবার কারণেই দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলসহ গ্রামীণ মানুষের স্বাস্থ্যসেবার মান বেড়েছে। হাতের কাছে ফ্রি চিকিৎসা সেবা ও ওষুধ পেয়ে সবাই খুশি। কমিউনিটি ক্লিনিকগুলোতে মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদার হওয়ায় সাধারণ মানুষের আস্থাও বেড়েছে।

তিনি বলেন, ভবিষ্যতে কমিউনিটি ক্লিনিকগুলোই হবে দেশের স্বাস্থ্যসেবার পরিসংখ্যানের তথ্য ভাণ্ডার। চতুর্থ স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টর উন্নয়ন কর্মসূচির ২৭টি অপারেশনাল প্ল্যানের মধ্যে রয়েছে কমিউনিটি বেইজড হেলথ কেয়ার (কমিউনিটি ক্লিনিক প্রকল্প)। এই প্রকল্পের কার্যপরিধি ও অবকাঠামো আরো বৃদ্ধি পাবে।

প্রকল্প কার্যালয় সূত্রে জানা যায়, কমিউনিটি ক্লিনিক থেকে ২০১০ সালে দুই কোটি ৩৬ লাখ মানুষ সেবা নেয়। ২০১১ সালে তিন কোটি ৭২ লাখ, ২০১২ সালে সাত কোটি ২২ লাখ, ২০১৩ সালে নয় কোটি ৮৫ লাখ, ২০১৪ সালে ১০ কোটির বেশি এবং ২০১৬ সালে প্রায় ১২ কোটি মানুষ সেবা নিয়েছে।

জাতীয় জনসংখ্যা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের (নিপোর্ট) জরিপে দেখা গেছে, বাড়ির পাশের ক্লিনিক থেকে ওষুধ আর পরামর্শ নিয়ে ৮০ শতাংশ মানুষ সন্তুষ্ট। জাতীয় রোগ প্রতিরোধ ও সামাজিক চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান (নিপসম)-এর জরিপে দেখা যায়, সেবা নিয়ে ৯৮ শতাংশ মানুষ সন্তুষ্ট।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তর জানায়, জনগণের স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও পরিবার পরিকল্পনা সেবার মান বৃদ্ধি ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় তৃতীয় সেক্টর কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। ৪র্থ সেক্টর কর্মসূচিতে ভিশন ২০২১, সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা, স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা এবং পুষ্টি নীতির আলোকে বাস্তবায়িত হবে।

কমিউনিটি ক্লিনিকের সর্বশেষ প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, কমিউনিটি ক্লিনিক কার্যক্রম এবং সেবাদানকারীদের করণীয় সম্পর্কে নির্দেশিকা প্রতিটি ক্লিনিকে রয়েছে। নির্দেশিকা টাঙানো থাকায় চিকিৎসা ও ওষুধ নিয়ে অবৈধ কাজ করার সুযোগ থাকে না।

কমিউনিটি হেলথ কেয়ার প্রোভাইডাররা (সিএইচসিপি) শুক্রবার এবং সরকারি ছুটির দিন ছাড়া প্রতিদিন কমিউনিটি ক্লিনিকে সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৩টা পর্যন্ত উপস্থিত থাকেন। তারা ক্লিনিক খোলা এবং বন্ধ করা, রোগীর নাম নিবন্ধন, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিত করাসহ তাদের কর্মপরিধির আওতাধীন এই মুহূর্তে যে সব কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা সম্ভব তা করেন।

আওয়ামী লীগ ১৯৯৬ সালে সরকার গঠনের পর সারাদেশে সাড়ে ১৩ হাজার কমিউনিটি ক্লিনিক প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা নেয়। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৯৮ সালে প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু হয়। ওই সময়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ার পাটগাতী ইউনিয়নের গিমাডাঙ্গা কমিউনিটি ক্লিনিক উদ্বোধন করেন।

২০০১ সাল পর্যন্ত সারাদেশে প্রায় ১০ হাজার ৭২৩টি ক্লিনিক প্রতিষ্ঠা করা হয়। ২০০১ সালে বিএনপি নেতৃত্বাধীন চারদলীয় জোট সরকার গঠনের পর এই প্রকল্পের কার্যক্রম বন্ধ করে দেয়। এরপর আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন মহাজোট সরকার ক্ষমতায় এসে ২০০৯ সালে আবার প্রকল্পটি চালু করে।

প্রতিবেদন : বরুন কুমার দাস

## নিরাপদ সন্তান প্রসবের ক্ষেত্রে উপকূলের নারীদের সচেতন করে তুলেছে হেলথ ক্যাম্প

গর্ভকালীন ৫টি বিপদের আশঙ্কা, গর্ভবর্তী মায়ের স্বাস্থ্যসেবা, প্রসূতি মায়ের ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থা এবং মা ও শিশুর শারীরিক যত্ন কীভাবে নিতে হয় এই সব জেনে এখন অনেকটাই খুশি সুলতানা বেগম।

হাতিয়া উপজেলার চানন্দী ইউনিয়নের চর নাঙগুলিয়াতে সুলতানার বাড়ি। সুলতানা বেগমের বাড়িতে স্বাস্থ্য বিষয়ক ক্যাম্প বসেছে। গর্ভবর্তী মায়ের স্বাস্থ্যসেবা, প্রসূতি মায়ের ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থা, প্রসবকালীন ৫টি বিপদের আশঙ্কা, মা ও শিশুর শারীরিক যত্ন সবই এখান থেকে জানছেন স্থানীয় নারীরা। তারা জানান, কয়েক বছর আগে এমন সুবিধা ছিল না উপকূলের মানুষের জন্য।

১৯ থেকে ৫৯ বছরের নারীদের জন্য এই স্বাস্থ্য ক্যাম্পের আয়োজন। এটি সরকারের অর্থায়নে পরিচালিত পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশনের (পিকেএসএফ) আর্থিক সহায়তায় ‘দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে দরিদ্র পরিবারসমূহের সম্পদ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি সমৃদ্ধি’ কার্যক্রম। কার্যক্রমের আওতায় স্বাস্থ্য সহকারী আছেন একজন। তাছাড়াও পিকেএসএফএর আর্থিক সহায়তায় বিভিন্ন উন্নয়ন সংস্থা দিচ্ছে স্বাস্থ্য সেবা। এখানে কাজ করছে দ্বীপ উন্নয়ন সংস্থা।

সুলতানা বেগম এখন অন্তঃসত্ত্বা। আগের দুই সন্তানের জন্মের সময় তার এত জ্ঞান ছিল না। এখন এই স্বাস্থ্যকর্মীরা তাদের স্বাস্থ্যবিষয়ক অনেক সেবা ও জ্ঞান দিচ্ছেন। নিয়মিত স্বাস্থ্য পর্যবেক্ষণ করার সুযোগ পাচ্ছেন তারা।

এই ক্যাম্পেই সেবা নিতে আসা নাজমা আক্তার জানান, এবারই প্রথমবারের মতো গর্ভবতী হয়েছেন তিনি।

ক্যাম্পে এসেছেন ৪০ বছর বয়সের আরজেনা বেগম। তিনি জানান, বাল্যবিয়ে ও অল্প বয়সে অধিক সন্তান হওয়ায় কিছু মেয়েলী সমস্যা দেখা দিয়েছে। এখানের প্যারামেডিক চিকিৎসকরা তাকে দেখছেন। তিনি পাঁচ সন্তানের জননী। ছোট সন্তানের বয়স ৭ বছর।

আমিরন বেগম জানান, তিনি তার ছেলের বউ সুমিকে নিয়ে এসেছেন। সুমি ৫ মাসের গর্ভবতী। এখানে এসেই জানতে পারেন প্রসবকালীন ৫টি বিপদ সম্পর্কে। সে নিজের জীবনে যা না পেয়েছেন ছেলের বউকে সেই সেবা দিতে পারছেন বলে আনন্দিত। তিনি বলেন, তার একটি শিশু আঁতুড় ঘরেই মারা যায়। এখনকার মতো স্বাস্থ্য ক্যাম্প থাকলে তার শিশুটি মারা নাও যেতে পারত।

তিনি বলেন, তারা যখন এই দ্বীপে আসেন তখন এখানে কোনো স্বাস্থ্য সেবা তো দূরের কথা, কোনো ডাক্তারও ছিল না । এখন বাড়িবাড়ি গিয়ে এই ক্যাম্প চিকিৎসা সেবা দিচ্ছে। তার ছোট ছেলের দীর্ঘদিনের চুলকানি এই ডাক্তারদের ওষুধে ভালো হয়েছে।

দ্বীপ উন্নয়ন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক রফিকুল আমিন জানান, সমিতির মাধ্যমে এই স্বাস্থ্যসেবা দেয়া হয়। এক একটি সমিতিতে সদস্য সংখ্যা ৩০ জন। প্রতিদিন কোনো না কোনো বাড়িতে বসে এই ক্যাম্প। এই ক্যাম্পে আছেন তিনজন প্যারামেডিক। ১০০ টাকা দিয়ে এক বছরের জন্য স্বাস্থ্য কার্ড করে পুরো পরিবারের চিকিৎসার জন্য সদস্য হওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। ক্যাম্পে প্যারামেডিক চিকিৎসকরা স্বাস্থ্যসেবা দেন। তারা স্বাস্থ্যকর্মী নামে পরিচিত। তাদের সঙ্গে প্রশিক্ষিত ২৫ জন ধাত্রী আছেন।

তিনি জানান, দুই কিলোমিটার দূরে খাসেরহাট উপজেলায় স্বাস্থ্য কেন্দ্র আছে। আশপাশে কোনো হাসপাতাল নেই, জরুরি অবস্থা হলে মাইজদী শহরে যেতে হয়। এখান থেকে নোয়াখালীর মাইজদীর জেলা হাসপাতালের দূরত্ব ৪০ কিলোমিটার। তাই এখন এই এলাকার মানুষের স্বাস্থ্যসেবার ভরসা এই স্বাস্থ্য ক্যাম্প।

স্বাস্থ্যকর্মী নাজমা আকতার জানান, এখানের মেয়েরা ১৫-১৬ বছরেই মা হয়। যদিও এখন বাল্যবিয়ে কিছুটা কমে এসেছে। তিনি বলেন, লবণাক্ত পানির জন্য এলাকার মানুষরা বিশেষ করে মহিলারা প্রধানত চর্মরোগে ভোগেন। তাছাড়াও আছে পানিবাহিত পেটের সমস্যা।

আর এক স্বাস্থ্যকর্মী স্মৃতি কনা মজুমদার জানান, ১৫ রকমের ওষুধ তারা বিনামূল্যে দেন। সর্বোচ্চ পাঁচশ টাকার ওষুধ বিনামূল্যে নিতে পারেন একজন

সদস্য। তাছাড়াও তারা গর্ভবতী ও প্রসূতী মায়েদের নিয়মিতভাবে আয়রন ও ভিটামিন ট্যাবলেট দেন। কিন্তু মা ও নবজাতকের টিকা দেয়ার ব্যবস্থা নেই তাদের কাছে। টিকা দিতে যেতে হয় উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স-এ।

ইউনিয়ন পরিষদের মেম্বার তাহেরা বেগম জানান, নিঝুম দ্বীপে সরকারের কমিউনিটি ক্লিনিক আছে। কিন্তু চরাঞ্চলে যাতায়াত ব্যবস্থা খারাপ তাই পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতির আওতায় আসেনি বেশির ভাগ দম্পতি।

পিকেএসএফের উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মো. জসিম উদ্দিন জানান, উপকূলীয় এলাকায় পানি ব্যস্থাপনার জন্য তারা ৪০ কোটি টাকা ব্যয় করছেন। সমৃদ্ধির আওতায় স্বাস্থ্য খাতে ব্যয় ৫০ কোটি টাকা। অন্যান্য প্রকল্প থেকে একই খাতে আরো ৩০ কোটি টাকা ব্যয় করছে পিকেএসএফ।

'সমৃদ্ধি' প্রকল্প প্রসঙ্গে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমেদ বলেন, উন্নয়ন একটা রাজনৈতিক পরিকল্পনা, তাই বেসরকারি সংস্থার সঙ্গে ইউনিয়ন পরিষদকে যুক্ত করে কাজ করা হচ্ছে। ২১টি ইউনিয়ন নিয়ে কাজ শুরু করা 'সমৃদ্ধি'র কার্যক্রম এখন উপকূলের ১৫০টি ইউনিয়নে চলছে। ১১১টি বেসরকারি সংস্থা কাজ করছে। প্রতিটি বাড়িতে স্বাস্থ্যকর্মীরা যাচ্ছে, ক্যাম্প হচ্ছে। তাদের কাছে আমরা স্বাস্থ্য সেবা পৌঁছাতে পারছি। এর কার্যক্রম সম্প্রসারিত করতে আরো ফান্ডের ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

প্রতিবেদন : রাবেয়া বেবী

## গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্যসেবায় নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান 'কমিউনিটি ক্লিনিক'

'বাংলাদেশের কমিউনিটি ক্লিনিক যেন পৌরাণিক ফিনিক্স পাখি। পাখিটি যতবার আগুনে ঝাঁপ দেয়, ততবারই নতুন করে বেঁচে ওঠে। তেমনি ১৯৯৬-২০০১ মেয়াদে তৈরি কমিউনিটি ক্লিনিকগুলো বন্ধ হওয়ার পর আবার দারুণভাবে ফিরে এসেছে।' ২০১৪ সালে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (ডব্লিউএইচও) 'কমিউনিটি ক্লিনিক-হেলথ রেভুল্যুশন ইন বাংলাদেশ' বইতে বাংলাদেশের কমিউনিটি ক্লিনিককে এভাবেই বর্ণনা করা হয়েছে।

প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবায় বিশ্বের মডেল হয়ে দাঁড়িয়েছে বাংলাদেশের কমিউনিটি হেলথ কেয়ার প্রকল্প। মা ও শিশুর পাশাপাশি সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্যসেবায় এক নীরব বিপ্লব ঘটিয়েছে এ প্রকল্প।

জাতিসংঘের সাবেক মহাসচিব বান কি মুন ও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মহাপরিচালক মার্গারেট চ্যান বাংলাদেশ সফরে এসে কমিউনিটি ক্লিনিকের উদ্যোগকে 'বিপ্লব' হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন। তারা বাংলাদেশের স্বাস্থ্য সেক্টরের এই সাফল্যকে "রোল মডেল" হিসেবে অনুসরণ করতে বিশ্ববাসীকে পরামর্শ দিয়েছেন।

বাংলাদেশে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রতিনিধি এন পারানিথারান এ প্রকল্প সম্পর্কে বলেন, 'কমিউনিটি ক্লিনিক গোটা বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য নতুন এক ধারণা। প্রতি ছয় হাজার মানুষের জন্য একটি করে স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রের এই অনবদ্য ধারণার জনক বাংলাদেশ।'

সার্বিক প্রজনন স্বাস্থ্য পরিচর্যার আওতায় অন্তঃসত্ত্বা নারী প্রসবপূর্ব (প্রতিষেধক টিকাদানসহ) এবং প্রসব পরবর্তী (নবজাতকের সেবাসহ) সেবা প্রদানকারী কমিউনিটি ক্লিনিকগুলো সময়মতো প্রতিষেধক টিকাদান যক্ষ্মা, ডিপথেরিয়া, হুপিং কাশি, পোলিও, ধনুষ্টঙ্কার, হাম, হেপাটাইটিস-বি, নিউমোনিয়া, ম্যালেরিয়া, কুষ্ঠ, কালা-জ্বর, ডায়রিয়াসহ অন্যান্য অসংক্রামক রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা এবং সেগুলোর সীমিত চিকিৎসা সুবিধা দিচ্ছে। এছাড়া জ্বর, ব্যথা, কাটা/পোড়া, হাঁপানি, চর্মরোগ, ক্রিমি এবং চোখ, দাঁত ও কানের সাধারণ

রোগের ক্ষেত্রে লক্ষণভিত্তিক প্রাথমিক চিকিৎসাও দেয়া হচ্ছে। ক্লিনিকগুলোতে অস্থায়ী পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি সংক্রান্ত বিভিন্ন উপকরণসহ বিনামূল্যে ওষুধ সরবরাহ করা হয়।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হালনাগাদকৃত সর্বশেষ ২০১৬ সালের তথ্য অনুযায়ী, দেশে বর্তমানে ১৩ হাজার ২৩৬টি কমিউনিটি ক্লিনিক চালু আছে। বর্তমানে প্রতি মাসে ৮০ থেকে ৯০ লাখ মানুষ কমিউনিটি ক্লিনিক থেকে সেবা নেন। কমিউনিটি ক্লিনিকে নির্ধারিত ৩০ প্রকারের ওষুধ দেয়া হয়। এর মধ্যে দুটি জন্মনিয়ন্ত্রণ সামগ্রী। বর্তমানে নয় শতাধিক কমিউনিটি ক্লিনিকে স্বাভাবিক প্রসবের ব্যবস্থা চালু আছে। মা ও শিশু স্বাস্থ্যসেবার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে কমিউনিটি ক্লিনিক। প্রতিটি ক্লিনিকেই সরবরাহ করা হয়েছে ল্যাপটপ। কমিউনিটি ক্লিনিক থেকে সেবা নিচ্ছেন প্রায় এক কোটি মানুষ।

জাতীয় জনসংখ্যা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের (নিপোর্ট) এক জরিপে দেখা গেছে, বাড়ির পাশের ক্লিনিক থেকে ওষুধ আর পরামর্শ নিয়ে ৮০ শতাংশ মানুষ সন্তুষ্ট।

এই পরিসংখ্যানের সত্যতা মেলে বিভিন্ন এলাকার কমিউনিটি ক্লিনিক থেকে সেবাগ্রহীতাদের বক্তব্যে। সিলেটের বিয়ানীবাজার উপজেলার ঘুঙ্গাদিয়া ইউনিয়নের বাসিন্দা জাহেদা বেগম (২১), নাজমিন আক্তার (২৮), লালমনিরহাটের কালিগঞ্জ উপজেলার চন্দ্রপুর ইউনিয়নের উত্তর বালাপাড়া গ্রামের সালমা বেগম কমিউনিটি ক্লিনিকের সেবা গ্রহণ করে কেবল সন্তুষ্টই নন, তারা নিয়মিত স্বাস্থ্যসেবা ও পরামর্শ গ্রহণের জন্য কমিউনিটি ক্লিনিককেই ভরসা করেন।

ঘুঙ্গাদিয়া ইউনিয়নের ঘুঙ্গাদিয়া একাডেমির শিক্ষক দুই সন্তানের মা জাহেদা এ প্রতিবেদককে জানান, তার বড় সন্তানের বয়স আড়াই বছর। ছোটটার ছয় মাস। চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী ঘুঙ্গাদিয়া কমিউনিটি ক্লিনিক থেকে দুই সন্তান গর্ভে থাকাকালীন এবং প্রসব পরবর্তী সেবা নিয়েছেন। তিনি পরিবারের সদস্যদের স্বাস্থ্য সেবার জন্যও কমিউনিটি ক্লিনিকের ওপরই ভরসা করেন। ঘুঙ্গাদিয়ার অপর বাসিন্দা নাজমিন আক্তার তার সাত মাসের ছেলের জ্বর, ডায়রিয়ার বা যে কোনো স্বাস্থ্যসেবার জন্য কমিউনিটি ক্লিনিকে যান।

লালমনিরহাটের সালমা বেগমের বিয়ে হয়েছে দু'বছর। প্রথমবারের মতো গর্ভবতী হয়ে তিনি নিয়মিত যোগাযোগ রাখতেন পার্শ্ববর্তী উত্তর বালাপাড়া কমিউনিটি ক্লিনিকের সঙ্গে। সেখানে নিয়মিত চেকআপ ও স্বাস্থ্য পরামর্শ নিতেন। ওই কমিউনিটি ক্লিনিকেই তার নিরাপদ প্রসব হয়।

ঘুঙ্গাদিয়া কমিউনিটি ক্লিনিকের হেলথ কেয়ার প্রোভাইডার রুনা বেগম বলেন, মা ও শিশু স্বাস্থ্যসহ সব সাধারণ রোগীদের প্রাথমিক চিকিৎসা এখানে দেয়া হয়। মায়েদের প্রসব-পূর্ব ও পরবর্তী বিভিন্ন পরামর্শ দেয়া হয়। মায়েরা এখন আগের চেয়ে অনেক সচেতন হয়েছেন। শেরপুর জেলার নকলা এবং ফরিদপুর জেলার চর ভদ্রাসন উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের গত বছরের তথ্য অনুযায়ী , কমিউনিটি ক্লিনিকগুলোতে সেবাগ্রহীতার সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে।

১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ সরকার গঠনের পর সারাদেশে সাড়ে ১৩ হাজার কমিউনিটি ক্লিনিক প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা নেয়া হয়। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৯৮ সালে প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু হয়। ২০০১ সাল পর্যন্ত সারাদেশে ১০ হাজার ৭২৩টি ক্লিনিক প্রতিষ্ঠা করা হয়। ২০০১ সালে বিএনপি নেতৃত্বাধীন চারদলীয় জোট ক্ষমতায় আসার পর এই প্রকল্পের কার্যক্রম বন্ধ করে দেয়। এরপর ২০০৯ সালে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন মহাজোট সরকার পুনরায়

ক্ষমতায় আসার পর প্রকল্পটি চালু করে। ২০০৯ সালের জুলাই থেকে ২০১৪ সালের জুন পর্যন্ত সময়ের জন্য ২ হাজার ৭০০ কোটি টাকা ব্যয় নির্ধারণ করে প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু হয়। প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হয়ে আসায় স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি উন্নয়ন (এইচপিএনএসডিপি) কর্মসূচিতে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে কমিউনিটি ক্লিনিক প্রকল্প। এর মধ্য দিয়ে 'কমিউনিটি বেইজড হেলথ কেয়ার' অপারেশনাল প্ল্যানের কার্যপরিধি ও অবকাঠামো আরো মজবুত হবে। এ উন্নয়ন কর্মসূচি আগামী ২০২১ সাল পর্যন্ত চলবে। তবে অভিযোগ উঠেছে, কমিউনিটি ক্লিনিক প্রকল্পের ঈর্ষণীয় সাফল্য ম্লান করে দিতে একটি চক্র কাজ করছে। ক্লিনিকের কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যাবে এবং কমিউনিটি হেলথ কেয়ার প্রোভাইডারদের (সিএইচসিপি) চাকরিও শেষ হয়ে যাচ্ছে বলে অপপ্রচার চালানো হচ্ছে।

স্বাস্থ্যমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম বলেন, কমিউনিটি ক্লিনিকের মাধ্যমে সাধারণ মানুষ বাড়ির পাশেই প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা পাচ্ছেন। এ প্রকল্প কখনও বন্ধ হবে না। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আবিষ্কার এই 'কমিউনিটি ক্লিনিক প্রকল্প'। রাজনৈতিক প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে এ প্রকল্প বন্ধ করে দিয়েছিল বিএনপি-জামায়াত জোট সরকার। ক্ষমতায় এসে প্রকল্পটি আবার চালু করে আওয়ামী লীগ সরকার। আর এ প্রকল্পটি আজ বিশ্বে স্বাস্থ্যসেবার রোল মডেল হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভবিষ্যতে কমিউনিটি ক্লিনিকগুলোই হবে দেশের স্বাস্থ্যসেবার পরিসংখ্যানের তথ্যভাণ্ডার।

কমিউনিটি ক্লিনিক প্রকল্পের সাবেক পরিচালক ও অতিরিক্তি সচিব ডা. মাখদুমা নার্গিস বলেন, কমিউনিটি ক্লিনিক প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দরিদ্র মানুষের চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করা হয়েছে। জনগণকে সম্পৃক্ত করে যেকোনো উদ্যোগ গ্রহণ করলে তা সফল হবেই। এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ এই কমিউনিটি ক্লিনিক। কমিউনিটি ক্লিনিক এমন একটা উদ্ভাবনী শক্তি, যার মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়া সম্ভব হয়েছে। এটা বাংলাদেশের জন্য এক বিরাট অর্জন। এ অর্জন আমাদের গর্বিত করেছে।

প্রতিবেদন : সেবিকা দেবনাথ

## প্রসূতি স্বাস্থ্যসেবায় দরিদ্র নারীদের আস্থা অর্জন করেছে কমিউনিটি ক্লিনিক

প্রসূতি স্বাস্থ্যসেবায় রংপুর জেলার কমিউনিটি ক্লিনিকগুলো দরিদ্র মায়েদের আস্থা অর্জন করেছে। নিরাপদ সন্তান প্রসব মাতৃস্বাস্থ্য সেবা ও নবজাতকের পরিচর্যার জন্য দরিদ্র মায়েরা এখন কমিউনিটি ক্লিনিকের ওপরই ভরসা রাখছেন।

এ ক্লিনিকে কমিউনিটি স্কিলড বার্থ অ্যাটেনডেন্ট (সিএসবিএ) প্রসূতি মায়েদের বিনামূল্যে নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা, ওষুধ, স্বাস্থ্য পরামর্শ ও নবজাতকের স্বাস্থ্যসেবা দিয়ে থাকে। এই প্রশিক্ষিত ধাত্রীরা কমিউনিটি হেলথ কেয়ার প্রোভাইডার (সিএইচসিপি) হিসেবেও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত।

রংপুর জেলা সিভিল সার্জন অফিস সূত্রে জানা যায়, জেলার আটটি উপজেলার ৩০৯টি কমিউনিটি ক্লিনিকের মধ্যে ৪৩টি কমিউনিটি ক্লিনিকে নিরাপদ সন্তান প্রসব করানোর ব্যবস্থা আছে। ৪৩টি কমিউনিটি ক্লিনিকে গত বছর ২৩৪ জন গ্রামীণ নারীর নিরাপদ সন্তান প্রসব করানো হয়। এ বছর আরো ৩৫ জন প্রসূতি এই কমিউনিটি ক্লিনিকগুলোর পর্যবেক্ষণে রয়েছেন।

সূত্র জানায়, ২০১৬ সালে ৩০৯টি কমিউনিটি ক্লিনিকে ১৯ হাজার ৩৭৪ জন প্রসূতি নারী তাদের গর্ভকালীন স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণ করেছেন এবং প্রসব পরবর্তী সময়ে নবজাতকের স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণ করেছেন। আর চলতি বছর প্রতিবেদন তৈরির দিন পর্যন্ত সেবা গ্রহণ করেছেন ৬ হাজার ৫৫৫ জন প্রসূতি নারী।

রংপুর জেলা সিভিল সার্জন ডা. আবু মো. জাকিরুল ইসলাম বলেন, ‘কমিউনিটি ক্লিনিক গ্রামীণ দরিদ্র নারীদের নিরাপদ সন্তান প্রসব এবং মাতৃস্বাস্থ্য সংক্রান্ত সেবার জন্য আস্থা অর্জন করেছে। এ বিষয়টি বিবেচনা করে নিরাপদ সন্তান প্রসবের উপযোগী কমিউনিটি ক্লিনিকের সংখ্যা বাড়ানোর উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।’

সদর উপজেলার হরিদেবপুর ইউনিয়নের গোকুলপুর কমিউনিটি ক্লিনিকের সিএইচসিপি নাজমা খাতুন গ্রামীণ প্রসূতি মায়েদের স্বাস্থ্যসেবা ও নবজাতকের পরিচর্যায় কমিউনিটি ক্লিনিকের কার্যক্রম তুলে ধরে বলেন, প্রথমে যখন

কোন প্রসূতি মা আমাদের কাছে স্বাস্থ্যসেবা নিতে আসেন আমরা তার স্বাস্থ্যের পূর্ববর্তী অবস্থা জানতে চাই। তারপর তার রক্তচাপ, ওজন ও তিনি রক্তস্বল্পতায় ভুগছে কিনা তা পরীক্ষা করি।

কমিউনিটি ক্লিনিকে সেবা নিতে আসা প্রত্যেক প্রসূতি নারীকে শুরুতেই বিনামূল্যে এক মাসের ওষুধ সরবরাহ করা হয়। এর মধ্যে রয়েছে ৩০টি আয়রন ট্যাবলেট, ৩০টি ভিটামিন বি কমপ্লেক্স ট্যাবলেট এবং ৩০টি ক্যালসিয়াম ট্যাবলেট।

নাজমা জানান, একজন প্রসূতি মা গর্ভকালীন ৪০ সপ্তাহের মধ্যে নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য কমপক্ষে চার বার কমিউনিটি ক্লিনিকে আসেন। এছাড়া গর্ভকালীন সময়ে অন্য কোনো শারীরিক জটিলতা দেখা দিলেও তারা কমিউনিটি ক্লিনিকের সেবা নেন। গর্ভকালীন কোনো জটিলতা দেখা দিলে সিএইচসিপিরা ওই প্রসূতি মাকে উপজেলা স্বাস্থ্য কেন্দ্র বা নিকটস্থ সরকারি হাসপাতালে সেবা নিতে পাঠান।

গোকুলপুর কমিউনিটি ক্লিনিকে সরেজমিন পরিদর্শনকালে কথা হয় দিনমজুর শাহীন মিয়ার স্ত্রী আলিমা বেগমের সঙ্গে। আলিমা বেগম সম্প্রতি নিরাপদে এক কন্যা সন্তানের জন্ম দিয়েছেন।

আলিমা বেগম জানান, দিনমজুর স্বামীর কষ্টের সংসারে বাচ্চা প্রসব নিয়ে খুব চিন্তায় ছিলেন। কিন্তু এই কমিউনিটি ক্লিনিক থেকে সিএইচসিপি নাজমার মাধ্যমে প্রথম দিন থেকেই যে বিনামূল্যে সেবা, পরামর্শ ও ওষুধ পেয়েছেন তাতে তিনি খুবই খুশি। তিনি এজন্য নাজমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

একই গ্রামের খামার শ্রমিক জাহাঙ্গীরের স্ত্রী জান্নাতি এ ক্লিনিক থেকে প্রসূতিকালীন স্বাস্থ্যসেবা এবং নবজাতকের স্বাস্থ্যসেবা নিয়ে সুস্থ আছেন।

বদরগঞ্জ উপজেলার কালুরপাড়া ইউনিয়নের মধ্যপাড়া গ্রামের গুটিরডাঙ্গা কমিউনিটি ক্লিনিক থেকে সেবা নিয়েছেন প্রান্তিক কৃষক মাহিদুল ইসলামের স্ত্রী কাশমিরা। ২০১৭ সালের ৩ মার্চ কাশমিরা এ ক্লিনিকে এক পুত্র সন্তানের জন্ম দেন।

কাশমিরা জানান, গর্ভধারণের পরপরই তার স্বামী তাকে এই কমিউনিটি ক্লিনিকে নিয়ে আসেন। এখানে তিনি গর্ভকালীন সব ধরনের স্বাস্থ্যসেবা পেয়েছেন এবং নিরাপদ সন্তান প্রসব করেছেন। এখন তিনি তার বাচ্চার স্বাস্থ্যসেবা এবং পরামর্শের জন্যও এই ক্লিনিকে আসেন।

একই রকম অভিজ্ঞতার কথা শোনালেন গুটিরডাঙ্গা গ্রামের দিনমজুর আখতারুলের স্ত্রী জুলেখা, দরিদ্র মিলনের স্ত্রী রুজিনা। তারা এই কমিউনিটি ক্লিনিকে নিরাপদে তাদের প্রথম সন্তানের জন্ম দিয়েছেন।

সদর উপজেলার মমিনপুর ইউনিয়নের চানকুঠি গ্রামের উত্তর মমিনপুর কমিউনিটি ক্লিনিকে এই প্রতিবেদকের কথা হয় ভ্যানচালক আলামিনের স্ত্রী জিয়াসমিনের সাথে। তিনি ২০১৭ সালের ৬ মার্চ এ ক্লিনিকে এক পুত্র সন্তানের জন্ম দেন। ডাঙ্গাপাড়া গ্রামের প্রান্তিক চাষি মনিরের স্ত্রী রাবেয়া এবং বানিয়াপাড়া গ্রামের দিনমজুর বিমল চন্দ্রের স্ত্রী স্বপ্না রানী এই কমিউনিটি ক্লিনিকে প্রসূতিকালীন সেবা নিয়েছেন। বর্তমানে তারা নবজাতকের স্বাস্থ্যসেবার জন্য ক্লিনিকে আসেন। তারা প্রত্যেকেই কমিউনিটি ক্লিনিকের স্বাস্থ্যসেবায় সন্তুষ্ট।

সাবেক বিভাগীয় পরিচালক (স্বাস্থ্য) ডা. শাহাদাত হোসেইন বলেন, গ্রামীণ দরিদ্র নারীদের প্রসূতিকালীন স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে হলে তাদের নিবিড় পর্যবেক্ষণে রাখতে হবে। যাতে তাদের কেউ কমিউনিটি ক্লিনিকের পরিবর্তে প্রাইভেট ক্লিনিকে গিয়ে ব্যয়বহুল সিজার করতে বাধ্য করতে না পারে।

প্রতিবেদন : মামুন ইসলাম, অনুবাদ : মাহফুজা জেসমিন

## খুলনার ১০ লাখ মানুষের দোরগোড়ায় মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবা

খুলনা জেলার ১৯৮টি কমিউনিটি ক্লিনিকের মাধ্যমে প্রায় ১০ লাখ মানুষ হাতের কাছেই পাচ্ছেন বিনামূল্যে মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবা। সরকারি সূত্র মতে, এরা নিয়মিত স্বাস্থসেবার পাশাপাশি স্বাস্থ্য পরামর্শও নেন।

খুলনার সিভিল সার্জন ডা. এস এম আবদুর রাজ্জাক বলেন, কমিউনিটি ক্লিনিক থেকে সাধারণ জনগণ হাতের কাছেই পাচ্ছে নিয়মিত স্বাস্থ্য শিক্ষা, পরামর্শ, গর্ভকালীন স্বাস্থ্য পরীক্ষা এবং প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা।

বটিয়াঘাটা উপজেলার চকরাখালি ইউনিয়নের ছয়ঘড়িয়া গ্রামের বাসিন্দা বৃদ্ধ গোবিন্দ মণ্ডল বলেন, এর আগে কখনো আমরা হাতের কাছে স্বাস্থ্য সেবা পাইনি। শহরের স্বাস্থ্য কেন্দ্রে গিয়ে চিকিৎসা নেয়ার সামর্থ্যও আমাদের ছিল না। কিন্তু কমিউনিটি ক্লিনিক হওয়ার পর এখন আর শহরে যেতে হয় না। হাতের কাছেই আমরা এখন স্বাস্থ্যসেবা পাই। কমিউনিটি ক্লিনিক থেকে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরামর্শ, স্বাস্থ্যসেবা এবং ওষুধ পাই।

রিকশা-ভ্যান চালক শিবদাস মণ্ডলের স্ত্রী অরুনা মণ্ডল বিনামূল্যে কমিউনিটি ক্লিনিকে তার দুটি সন্তান প্রসব করাতে পেরে খুবই খুশি। তিনি বলেন, শহরে গিয়ে টাকা খরচ করে চিকিৎসাসেবা নেয়ার অবস্থা আমাদের নেই। কিন্তু গত কয়েক বছর ধরে কমিউনিটি ক্লিনিক থেকে চিকিৎসাসেবা পেয়ে আমরা ভালো আছি।

চয়ঘরিয়া কমিউনিটি ক্লিনিকের কমিউনিটি হেলথ কেয়ার প্রোভাইডার (সিএইচসিপি) মোনালিসা রায় জানান, এই ক্লিনিকে প্রতিদিন কমপক্ষে ২৭ থেকে ৩০ জন লোক চিকিৎসা নিতে আসেন। এদের বেশির ভাগই নারী ও শিশু।

তিনি বলেন, প্রত্যেক কমিউনিটি ক্লিনিকে গর্ভবতী নারীদের জন্য কমপক্ষে একটি করে লেবার রুমের প্রয়োজন।

ক্লিনিকের স্বাস্থ্য পরিদর্শক মো. মোস্তফা আকুঞ্জি বলেন, কমিউনিটি ক্লিনিকে স্বাস্থ্যসেবা নিতে আসাদের বেশিরভাগই নারী ও শিশু। তারা মূলত মাতৃস্বাস্থ্য, শিশু স্বাস্থ্য ও প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা নিতে আসেন।

তিনি বলেন, এই ক্লিনিকে স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের জন্য একজন কমিউনিটি স্বাস্থ্য চিকিৎসক (সিএইচপি), স্বাস্থ্য সহকারী এবং পরিবার পরিকল্পনা কর্মীসহ মোট আটজন কর্মচারী আছেন। সরকার রোগীদের জন্য বিভিন্ন ধরনের ২৮ প্রকার ওষুধ দিচ্ছে।

দাকোপ উপজেলার তিলডাঙ্গা ইউনিয়নের তিলডাঙ্গা কাঁচাবাড়ি কমিউনিটি ক্লিনিকের সিএইচসিপি অনুপ কুমার গোলদার জানান, গর্ভবতী নারী ও শিশুসহ প্রতিদিন গড়ে প্রায় ৩৪ জন রোগী এই ক্লিনিকে স্বাস্থ্যসেবা নেন। এখানে আমরা সাধারণত পাঁচ ধরনের স্বাস্থ্যসেবা দিয়ে থাকি। এই স্বাস্থ্য সেবাগুলো হলো– পরিবার পরিকল্পনা, ইপিআই, নিউট্রিশন, প্রাথমিক স্বাস্থ্য চিকিৎসা এবং স্বাস্থ্য শিক্ষা।

তিনি বলেন, এখন আমরা সরকারের কাছ থেকে রোগীদের জন্য ২৬ ধরনের ওষুধ পাই। এর আগে ৩০ ধরনের ওষুধ পেতাম। তিনি দরিদ্র রোগীদের জন্য ওষুধের বরাদ্দ বৃদ্ধি এবং কমিউনিটি ক্লিনিক ভবনগুলোর সংস্কারের দাবি জানান।

বটিয়াঘাটা উপজেলা চেয়ারম্যান আশরাফুল আলম প্রতিটি কমিউনিটি ক্লিনিকে গর্ভবতী নারীদের চিকিৎসা ও সন্তান প্রসবের জন্য চিকিৎসা সুবিধা বৃদ্ধির সুপারিশ করেন।

বৃহত্তর খুলনা উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির সভাপতি শেখ আশরাফুজ্জামান বলেন, সরকার কমিউনিটি ক্লিনিকের মাধ্যমে জনগণের দোরগোড়ায় স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দিতে সক্ষম হয়েছে। তবে পর্যাপ্ত অর্থের অভাবে দীর্ঘদিন কমিউনিটি ক্লিনিকগুলোর সংস্কার হচ্ছে না। কমিউনিটি ক্লিনিক ভবনের উন্নয়ন ও সংস্কারের জন্য বাজেটে বরাদ্দ বাড়ানো জরুরি।

প্রতিবেদন : এস এম জাহিদ হোসেন, অনুবাদ : অহিদুজ্জামান মিয়া

## Rural people can now happily rely on community clinics

Rural people especially the villagers of far-flung areas can now happily rely on the community clinics for getting healthcare services.

Thousands of community clinics have been set up so far in the country to render healthcare services like reproductive health, pre- and post-delivery healthcare, family planning, immunisation, nutrition, health education and consultations. Thirty categories of medicines are being given free of cost at the clinics.

The Bhuktera Community Clinic authority, under Juri upazila in Moulvibazar district, said that around 200 cases of delivery were performed till now in the clinic.

"We are getting all types of treatment from the clinic... even all types of medicine are available here for free of cost," Mina Rani, a patient of the clinic, said.

Many people of her village now getting the health services of the community clinic instead of other private hospitals, she added.

The community clinics are also providing vaccines for tuberculosis, diphtheria, whooping cough, polio, hepatitis-B and pneumonia.

Children and juveniles are being advised on health issues at the community clinic. People can also get treatment for malaria, tuberculosis, fever, leprosy, diarrhoea and other infectious diseases.

People, generally, get their primary treatment for fever, pain, injuries, sting, asthma, skin diseases, worms, eye and teeth problems. They also get different stuff for family planning.

Community Health Provider of Boraigram upazila Sadar Community Clinic, Natore, Uzzal Kumar told BSS that the poor of rural village are now getting their health services through the community clinics. The number of patients has also increased, he added.

Uzzal said, around 80 people are taking treatment from the clinics every day.

Reviving of the community clinic services was made at the behest of Prime Minister Sheikh Hasina, said Health and Family Welfare Minister Mohammad Nasim. He said that the then BNP-Jamaat government had closed the services just for vengeance.

The present government reopened the community clinics after assuming power, he said, adding the service is now a role model for community health services before the world.

Nasim said Director General of World Health Organisation

Margaret Chan advised the leaders across the world to follow the community clinic model in their respective countries.

Around one crore people are getting treatment from the community clinics across the country every month, the minister said.

Former project director of the community clinic Dr Momtajul Haque said the rural people are so much happy as they are getting free treatment and free medicine at their doorsteps.

According to the office of the project, around 2.36 crore people were given health services through the clinics in the country in 2010 while it was 3.72 crore in 2011, 7.22 crore in 2012, 9.85 crore in 2013, above 10 crore in 2014 and around 12 crore in 2016.

A survey, conducted by National Institute of Population Research and Training, showed about 80 per cent people were happy with getting better treatment and free medicine at the clinics.

In another survey, conducted by the National Institute of Preventive and Social Medicine, showed that 98 per cent people is happy as they are getting their health services from the clinics.

The Directorate of Heath Services said the Ministry of Family Planning and Welfare is implementing the third phase of the project for ensuring health service, nutrition and increasing the quality of family planning services.

The fourth phase of the project will be implemented for achieving the goals in health sector, set out in line with the Vision 2021, the seventh five-year plan and the sustainable development Goals (SDGs).

Report : Barun Kumar Das, Translation : Prodyut Sree Barua

## Health camp makes coastal women more aware of safe delivery

Sultana Begum is now happy since she knows five risk factors of pregnant women and how to ensure safe delivery.

Sultana had learnt all these from health workers of a camp set up in Chanandi union of Hatia upazila under Noakhali district. The camp has been set up to provide healthcare services to the poor and vulnerable women living in the natural calamities prone coastal belt.

The health camp set up with the financial support of "Palli Karma-Sahayak Foundation (PKSF)" for the women aged from 19 to 59 in different 'char areas' of Hatia upzaila where people especially women were deprived of such healthcare services for long.

Sultana is now pregnant and waiting for giving birth of her third child. "Now I know how can I take care of myself and my baby, she said, adding that the people in the coastal areas did not know much about safe delivery.

The health workers of the camp are now providing necessary suggestions about the health of pregnant women and conducting regular health checkups.

Arjina Begum (40), a mother of five children, who came to the camp to take medicare services, said she got married when she was a child and as a result she had been suffering from some gynecology related problems. She, however, is now recovering as paramedic is treating her.

Another woman, Amiron Begum, said she came to the health camp with her daughter-in-law, a pregnant teen whose age is only 17. "I came to know about the five risk factors of

pregnant women after coming to the camp. Now, I can take care of my daughte- in-law and suggest her what to do during pregnancy and after birth of a child," she said.

She said the health workers of the camp visit houses in village, providing healthcare services to the women, who were long been deprived of such services.

Executive Director of "Dwip Unnayan Sangstha" Rafiqul Amin said the health services are being provided through a 'Samity' of 30 members, including three paramedics. The camp is used to set up in separate houses. Each member of the 'Samity' are provided a health card in exchange of Taka 100 to get health services for the entire family round the year.

Apart from three paramedics, each camp has 25 trained midwives for providing an array of healthcare services including gynecological examinations, contraceptive counselling, prescriptions, and labour and delivery care.

Amin said the health camp has been playing a crucial role in providing health services to the pregnant women in the remote villages as the health complex is two-kilometers away from the village.

He said if any emergency arises, the patients have to go to Maizdi General Hospital under Noakhali district for better treatment. The hospital is 40-kilometre away from the village.

Health Worker Nazma Akhtar said the girls of this area become mother at the age of 15 or 16 since they got married during their childhood. Due to salinity, people especially the women in this area suffer from various types of skin diseases and malnutrition as well, she added.

Smirity Kona Majumder, another health worker, said they are providing at least 15 types of free medicine from the health complex. Each member of the Samity can get medicine valued up to tk 500.

Apart from these, they provide free iron and vitamin tablets to the pregnant women on a regular basis. But they can't administer vaccine to the new born baby and the mother. For vaccination they have to go to upazila health complex, she added.

Union Parishad member Tahera Khanam said despite government efforts, maternal mortality rate was high in the area due to child marriage and lack of proper knowledge.

Deputy Managing Director of PKSF Dr. Md. Jasim Uddin said that PKSF has already spent Taka 40 crore for water management in coastal belt and Taka 50 crore in health sector under its "Samridhi" programme. It (PKSF) also spent another taka 30 crore in water management and health sector from other projects, he added.

Chairman of Palli Karma-Sahayak Foundation (PKSF) and renowned economist Dr. Qazi Kholiquzzaman Ahmed said the activities of "Samridhi" have been expanded to 150 unions from earlier 21 across the country. At least 111 non-government organisations have are implementing the project under the financial support of PKSF to provide  necessary healthcare services to the poor and vulnerable women.

He said the activities of 'Samriddhi' should be expanded to other remote areas to provide healthcare services to the women.

Report : Rabeya Baby, Translation : Aminul Islam Mirja

## Community clinics draw global accolade

"The community clinics, a flagship programme of the present government, is like a mythological phoenix bird. As many times the bird jumps into fire, it gets a new life to that number. Like the phoenix bird, community clinics which were constructed during the 1996-2001 tenure of the Awami League government came back tremendously despite the closure after 2001," the World Health Organisation (WHO) narrated in this way in a book titled Community Clinics-Health Revolution in Bangladesh in 2014.

Former United Nations Secretary General Ban Ki-moon and WHO Director General Margaret Chan described the community clinic initiatives as a "revolution". They advised the people worldwide to follow Bangladesh for this health sector success as a "role model".

While commenting on the programme, WHO Representative in Bangladesh Dr N. Paranitharan said: "Community clinics are a new concept for the developing countries of the world, and Bangladesh is the pioneer of the unique concept of healthcare centre for every six thousand people."

Under the overall reproductive healthcare, pre-and post-delivery services including preventive injections and services for newborn are being provided to the pregnant women.

Preventive injections for tuberculosis, diphtheria, whooping cough, polio, tetanus, measles, hepatitis-B, pneumonia, malaria, leprosy, kalaazar, diarrhoea and other non-communicable diseases are being given to the people from the clinics. Treatment for fever, pain, injury, burn, asthma, worm is also being provided alongside symptom-based primary health services for eye, teeth and ear. Free medicines

including contraceptives for temporary family planning are also supplied from the clinics.

According to the latest information of the Directorate of Health, 13,236 community clinics are now operational in the country. In every month, one crore people take services from the community clinics where 30 types of medicines are given to patients for free of cost.

According to a survey conducted by National Institute of Population Research and Training, 80 per cent people are satisfied with the services of the community clinics.

The people receiving services from the community clinics also acknowledged the survey result. Jaheda Begum and Nazmin Aktar, residents of Ghungadia union under Bianibazar upazila in Sylhet, and Salma Begum, an inhabitant of Chandrapur union under Kaliganj upazila in Lalmonirhat district, are not only pleased with the services of the community clinics, they are also depended on the clinics for receiving health services and advices.

Jaheda, a teacher of Ghungadia Academy and a mother of two children, said as per the advice of the doctors, she took pre and post-delivery services from the community clinic during the birth of her two children.

Nazmin Akhtar, another resident of Ghungadia, goes to community clinic for fever, diarrhoea or any other health services. According to her, it is the nearest and dependable health facility.

Salma Begum of Lalmonirhat got married two years back. When she became pregnant for the first time, she used to maintain contact with nearby Uttar Balapara Community Clinic. She used to go for regular medical checkup and take advice from the clinic. Safe delivery of her baby also took place at that clinic.

Healthcare Provider of Ghungadia Community Clinic Runa Begum said primary healthcare services for all general patients including mother and children are provided from the clinic. Besides, different pre-and post-delivery advices are given to mothers.

Health Minister Mohammad Nasim said people are getting primary healthcare services at their doorsteps through the community clinics.

He said it is an innovation of Prime Minister Sheikh Hasina. The BNP-Jamaat Alliance Government had shut down the clinic project out of political vengeance. But after coming to power again in 2009, the Awami League government revitalised the project. And the project has now become a "role model" of healthcare services in the world.

The health minister also said in future, the community clinics would have the database of healthcare services of the country.

Former Project Director of Community Clinic Project and Additional Secretary Dr. Makhduma Nargis said healthcare services for the poor people were ensured through establishing community clinics.

She said community clinic such an innovation which takes healthcare services to the people's doorsteps. "It's a huge achievement and it made us proud," she said.

Report: Sebika Debnath, Translation: A Z M Sajjad Hossain Sabuj

## Community clinics earn confidence of poor mothers in Rangpur

The community clinics have earned confidence of poor rural mothers in Rangpur district by providing them with safe delivery facilities and maternal and neonatal healthcare services.

The Community Skilled Birth Attendants (CSBAs) have been conducting regular checkups of pregnant women, providing them with medicines, nutritional education and micro-nutrient supplements free of costs to ensure their safe deliveries. According to the Civil Surgeon Office, safe deliveries are currently being conducted at 43 out of 309 community clinics in all eight upazilas of the districts.

The CSBAs conducted safe delivery of 234 rural mothers last year and 35 more deliveries till date this year at 43 community clinics.

Besides, 19,374 women received maternal healthcare services during pregnancy and neonatal healthcare services after delivery in 2016 while 6,555 women received the same services in all 309 community clinics so far this year.

"The community clinics have become trusted places for safe delivery and some other urgent healthcare services for women," said Civil Surgeon Dr. Abu Md Zakirul Islam.

Community Healthcare Provider (CHCP) Nazma Khatun at Gokulpur Community Clinic under Haridebpur union of Sadar upazila narrated as how the maternal and neonatal healthcare services are being provided to rural pregnant women. "We review previous health conditions of a pregnant woman to give her the right services," Nazma said.

Each of the pregnant women gets 30 iron tablets, 30 vitamin B-complex tablets and 30 pieces of calcium lactate tablets for

one month from community clinic soon after confirmation of her pregnancy.

“A pregnant woman comes at least four times to the community clinic for regular checkups, or even more times if needed, during her 40-week pregnancy period,” she said.

“If any complicacy is noticed during checkups, the CHCPs refer those women to Upazila Health Complex or nearby government hospitals,” Nazma added.

Talking to BSS at Gokulpur Community Clinic, Alima Begum, 20, wife of day labourer Shahin Mian of village Chawrapara, said she safely gave birth to a daughter.

“I was scared after becoming pregnant due to financial hardship of my poor family. I, however, became happy after getting excellent services, medicines and counsel from CHCP when I first came to the community clinic,” she said.

Like many others, Zannati, 21, wife of a farm labourer Jahangir of the same village, also received maternal health care services during her pregnancy and neonatal healthcare services after delivery.

Kashmira, 19, wife of a marginal farmer Mahidul Islam of village Maddhyapara, said she safely gave birth to her first child at Gutirdanga Community Clinic under Kalurpara union in Badarganj upazila.

“My husband took me to the clinic where the CHCP gave me necessary healthcare services till safe delivery of my baby,” she said.

Similarly, Julekha, 20, wife of a day-labourer Akhterul of village Gutirdanga and Ruzina, 19, wife of poor Milan of village Kalurpara Amlidanga, safely gave birth to a son and daughter respectively there.

Ziasmin, 20, wife of a cart puller Al-Amin of village Chankuthi said she gave birth to a son at Uttar Mominpur Community Clinic in Mominpur union under Sadar upazila.

Similarly, Rabeya, 20, wife of a marginal farmer Monir of village Dangapara and Swapna Rani, 20, wife of a day-labourer Bimal Chandra of village Baniyapara expressed satisfaction after giving birth to their sons there.

Like other CHCPs, Nazma said that ‘brokers’ of some ‘business-oriented’ private clinics are inspiring many rural poor women with no complexities to undergo costly cesarean operations for so called ‘safe delivery’.

Former Divisional Director (Health) Dr Shahadat Hossain stressed on enhancing monitoring activities so that none could misguide rural women to go for costly cesarean operation at private clinics instead of coming to the community clinics for safe delivery.

Report : Mamun Islam

## 10 lakh people in Khulna get better health services

With expansion of community clinics, around 10 lakh people are now getting better healthcare services from 198 community clinics in Khulna district, according to official sources.

“People are getting health education, referral advice, pregnancy checkup and de-worming and vaccination at the clinics that brought healthcare services to their doorsteps,” said Khulna Civil Surgeon Dr. S M Abdur Razzak.

“There were no affordable health services available around for the low-income people before launching of the community clinics,” said Govinda Mandal, 87, of Chaygharia village under Chakrakhali Union of Batiaghata upazila in the district.

He said many of his area are now getting physicians advice, health services and necessary medicines from the clinics without hassle and paying higher prices.

Aruna Mandol, 30, wife of Shibdas Mandol, a rickshaw-van puller, expressed her satisfaction over the care she got at the clinic while giving birth to her two children.

Monalisa Roy, 27, a community health service provider of Chaygharia community clinic, said on an average 30 people, especially women and children, come to the clinic every day to get necessary health services.

She, however, said that the community clinic needs separate labour room for safe delivery.

Md. Mostofa Akunji, health inspector of the clinic, said people, mostly women and children, are getting basic

treatment and prenatal and neonatal and child healthcare services. A total of six employees, including community health care provider, health assistant and family planning worker are working at the clinic, he said, adding that the government are giving patients 30 different medicines at free of cost.

While visiting the Tildanga Kacharibari Community Clinic at Tildanga Union under Dakop upazila in Khulna, this correspondent found that some patients were taking health services from community healthcare provider (CHCP).

CHCP Anup Kumar Golder said every day we give health services to around 34 patients, including pregnant women and children.

“We mainly provide five health services to people. These are: family planning, EPI, nutrition, primary healthcare and health education,” he said. Goldar urged the authorities concerned to provide more medicine at free of cost as most of the low-income people cannot afford medicine.

Sheikh Ashrafuzzaman, President of Greater Khulna Development Action Coordination Committee, also sought more fund and medicine for the community clinics those are providing basic, but important heath services to the rural people who were earlier out of the support of institutional health services.

Report: S M Zahid Hossain

বিশেষ উদ্যোগ ৮

# সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি

"শেখ হাসিনার বারতা, গড়ো সামাজিক নিরাপত্তা"

# সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি


সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি বদলে দিল ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর জীবন ২০৫

প্রাণঘাতী রোগে অসুস্থদের চিকিৎসা সহায়তা তহবিলে বরাদ্দ বৃদ্ধি করেছে সরকার ২০৮

শত দরিদ্র বধির পেল স্বাভাবিক জীবন ২১০

প্রতিবন্ধীরা পাচ্ছে বাঁচার সুযোগ ২১২

বিধবা ভাতা কর্মসূচি অসহায় বিধবাদের জীবনমান উন্নয়নে কাজ করছে ২১৬

Ethnic people get a new lifeline 219

Govt. increases funding for terminally ill patients 223

Hundreds hearing impaired poor get normal life 225

Disabled people getting scope to survive 227

Widow allowance changes lives of destitute women 231

বয়স্ক, শারীরিক সামর্থ্যহীন জনগোষ্ঠীর আর্থসামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্ত নারীদের আর্থসামাজিক উন্নয়ন ও সামাজিক নিরাপত্তা বিধান, গ্রামীণ দরিদ্র নারীদের স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পুষ্টি ইত্যাদি সম্পর্কে উদ্বুদ্ধ করাই সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির লক্ষ্য। অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের আর্থসামাজিক উন্নয়নের জন্য মাসিক ভাতার আওতায় আনা হয়েছে। ভূমিহীন, ছিন্নমূল পরিবারের জন্য সহায়তার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

## অর্জন

- ২০১৬-১৭ অর্থবছর থেকে খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির আওতায় সঙ্কটকালীন সময়ে (Lean Period, মার্চ-মে ও নভেম্বর-ডিসেম্বর) ৫০ লাখ পরিবারকে ১০ টাকা কেজি দরে পরিবার প্রতি ৩০ কেজি করে চাল বিতরণ করা হচ্ছে।
- সমাজের অবহেলিত, অক্ষম, নিঃস্ব জনগোষ্ঠীর জন্য সরকার ১৩২টি সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কার্যক্রম গ্রহণ করেছে।

- ২০১৬-১৭ অর্থবছরে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য প্রায় ৩৪ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা ছিল।
- প্রায় ২৫ লাখ অসহায় বয়স্ক মানুষকে মাসে ৪০০ টাকা হারে ভাতা প্রদান করা হচ্ছে।
- ৯ লাখের অধিক বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা নারীকে প্রতি মাসে ৪০০ টাকা হারে ভাতা প্রদান করা হচ্ছে।
- ১ লাখ ২০ হাজার ভূমিহীন পরিবারের মধ্যে ৫৫ হাজার একর কৃষি জমি বিতরণ করা হয়েছে।
- ১ লাখ ৮০ হাজার ৯৯৬ জন মুক্তিযোদ্ধাকে জনপ্রতি মাসিক ১০ হাজার টাকা সম্মানী ভাতা প্রদান করা হচ্ছে।
- সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় ২০০৯-১০ থেকে ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে স্নাতক (পাস) ও সমমান পর্যায় পর্যন্ত মোট ২ কোটি ১৫ লাখ শিক্ষার্থীকে প্রায় ৪ হাজার কোটি টাকা উপবৃত্তি প্রদান করা হয়েছে।

## ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

- ২০২০ সাল নাগাদ সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি খাতে ব্যয় জিডিপির ২.৩ শতাংশে উন্নীতকরণ।
- ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ও খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির আওতায় সংকটকালীন সময়ে ৫০ লাখ পরিবারকে ১০ টাকা কেজি দরে পরিবার প্রতি ৩০ কেজি করে চাল বিতরণ।
- মহিলাদের আত্মকর্মসংস্থানের জন্য ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের আওতায় প্রতি অর্থবছরে ১ হাজার ৫০০ জন দুস্থ, অসহায়, মহিলার মাঝে ১.৫০ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ।
- মাসিক সম্মানী ভাতা প্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের সংখ্যা ১ লাখ ৮০ হাজার থেকে বৃদ্ধি করে ২ লাখ করা হবে।

(ছবি ও তথ্য : চলচিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর)

## সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি বদলে দিল ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর জীবন

জয়পুরহাটের পাঁচবিবি উপজেলার ছাতিনালী গ্রামের হতদরিদ্র গৃহিণী রিতা মালী (৩৫)। স্বামী নিখিল মালী সেলুন কর্মী (৪৫)। সাড়ে তিন শতাংশের ভিটেটুকু ছাড়া আর কোনো স্থাবর সম্পত্তি নেই। সংসারে চার কন্যা সন্তান। রিতার স্বামী বেশির ভাগ সময় অসুস্থ থাকেন। উপার্জন না থাকায় দিনের পর দিন স্বামী-সন্তান নিয়ে না খেয়ে থেকেছেন। মাঠে কৃষি কাজ থেকে শুরু করে অন্যের বাড়িতে ঝিয়ের কাজ করেন। কিন্তু নিয়মিত কাজ না পাওয়ায় অভাব পিছু ছাড়ছিল না।

একদিন স্থানীয় একজন এনজিও কর্মীর মাধ্যমে রিতাসহ গ্রামের অন্যান্য হতদরিদ্র নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী  সরকারের সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচি সম্পর্কে জানতে পারেন। জানতে পারেন তাদের প্রাপ্য অধিকারের কথা। এরপর তারা সবাই স্থানীয় আওলাই ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়ে যোগাযোগ করেন।

ইউনিয়ন পরিষদ থেকে রিতা ৪০ দিনের কর্মসূচিতে কাজ শুরু করেন। এ কাজ করে রিতা পান ৭ হাজার টাকা। রিতার গ্রামীণ সংসারে এই টাকার গুরুত্ব অনেক। রিতা জানান, বড় মেয়ে ব্র্যাকের স্কুলে পড়ত। সেখান থেকে সে এককালীন ১৫ হাজার টাকা শিক্ষাবৃত্তি পায়। শিক্ষাবৃত্তির টাকা আর ৪০ দিনের কর্মসূচির টাকা মিলিয়ে কেনা হয় একটি গাভী। এখন সেই গাভীর একটি বাছুর আছে। দুধ বিক্রি করে প্রতিদিন ৭০-৮০ টাকা আয় হয়। এছাড়া বাছুরসহ গাভীটির বর্তমান মূল্যও প্রায় ৪০-৪৫ হাজার টাকা। রিতা বলেন, আগের মতো অভাব আর নেই। এখন তিন বেলা খেতে পারি। ছোট দুই মেয়েও এখন স্কুলে যায়।

একই গ্রামের বীথি মালীও সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচির আওতায় ৪০ দিনের কর্মসূচির কাজ নেন। বীথি জানান, তার স্বামী দিনমজুর। ফসলের মৌসুমে নিয়মিত কাজ পেলেও অন্য সময় বেকার থাকতে হয়। নিজেদের কোনো জমিজমা নেই। বীথি বলেন, 'আমরা হতদরিদ্র শ্রেণির মানুষ। সরকার যে আমাদের জন্য বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা চালু করেছে তা জানতাম না। এখন নিজেদের অধিকার সম্পর্কে জানি। বীথি ৪০ দিনের কর্মসূচির কিছু টাকা এখন ও জমিয়ে রেখেছেন। এটা দিয়ে বাড়িতে হাঁস-মুরগি পালনের ইচ্ছে আছে। রিতার মতো তারও চাওয়া এই কাজটা যেন নিয়মিত পান।

সবুজে ঘেরা ছাতিনালীর হতদরিদ্র মানুষগুলোর লড়াইয়ের 'হাতিয়ার' হয়ে উঠেছে বর্তমান সরকারের সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচি। এই কর্মসূচির আওতায় দারিদ্র্য জয়ের স্বপ্ন দেখছেন এখানকার নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী।

অতিদারিদ্র্য কমিয়ে আনার মাধ্যম হিসেবে সরকার ব্যাপক আকারে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। সমতলের এ ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর বিশাল একটি অংশ হতদরিদ্র। বর্তমানে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর আর্থ সামাজিক ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্য পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে।

সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্তির হার বাড়ানোর পাশাপাশি সমতলের ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান পাল্টাতে সরকারের উদ্যোগ বাস্তবায়নে এগিয়ে এসেছে আন্তর্জাতিক  বেসরকারি সংস্থা ওয়ার্ল্ড ভিশন। পল্লীশ্রী এবং পামদো নামের স্থানীয় দুটি বেসরকারি সংস্থার সহযোগিতায় তারা বাস্তবায়ন করছে ইভিপিআরএ প্রকল্প। এর মাধ্যমে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির নয়টি খাতে জয়পুরহাট ও দিনাজপুরের ৫ উপজেলার প্রায় দুই লাখ ৮০ হাজার অতিদরিদ্র মানুষের প্রবেশাধিকার বাড়ানো, তাদের সচেতন করা এবং কর্মসূচির স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা হচ্ছে।

সম্প্রতি জয়পুরহাটের পাঁচবিবি উপজেলার ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত আওলাই ইউনিয়নের ছাতিনালী, লক্ষ্মীকূল এবং কামদিয়া গ্রাম ঘুরে এবং স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে এখানকার ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ বাড়ছে। সেবা পাওয়ায় ধীরে ধীরে পাল্টাচ্ছে আদিবাসীদের জীবনমান। ইউনিয়নের মোট জনসংখ্যা প্রায় ৩৫ হাজার। এর মধ্যে ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী প্রায় ২ হাজার। লক্ষ্মীকূল এবং কামদিয়া গ্রামে ৪৫-৫০টি ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী পরিবার রয়েছে। তাদের কারোরই নিজস্ব জমি নেই। ঘরে বিদ্যুৎ নেই। গ্রামের যোগাযোগ ব্যবস্থা খুবই করুণ। সবচেয়ে কাছের বাজারটির অবস্থান গ্রাম থেকে প্রায় সাত কিলোমিটার দূরে। তবে এসবের কোনোকিছুই হতদরিদ্র গৃহিণী আন্না কুজোর (২৭) ভিজিএফ কার্ড পাওয়ার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারেনি। তিনি জানান, এতদিন তারা সরকারের কোনো সুযোগ-সুবিধা পেতেন না। এমনকি ভিজিএফ কার্ড কী তাও জানতেন তা। এনজিও কর্মীদের কাছ থেকে সরকারের সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কে অবগত হয়ে ইউনিয়ন পরিষদে আবেদন

করে ভিজিডি কার্ড পেয়েছেন। একই কথা জানালেন বয়স্ক ভাতাভোগী ডেভিড কুজো (৮০)।

এ প্রসঙ্গে জানতে চাইলে আওলাই ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আবদুর রাজ্জাক মণ্ডল বলেন, প্রত্যন্ত জনপদ হিসেবে আমার ইউনিয়নে সাধারণ হতদরিদ্র মানুষের সংখ্যাই বেশি। সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় বিভিন্ন খাতে চলতি অর্থবছরে ইউনিয়নের তিন হাজারের বেশি হতদরিদ্র মানুষ ভাতা ও অন্যান্য সুবিধা পেয়েছেন। এর মধ্যে তিনশ'রও বেশি ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভূক্ত। এ কর্মসূচির বরাদ্দের ৩০ শতাংশ ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর জন্য রাখা হয়েছে। আদিবাসীরা আগের চেয়ে এখন অনেক অধিকার সচেতন হয়েছেন।

ওয়ার্ল্ড ভিশনের ইভিপিআরএ প্রকল্প কর্মকর্তা শান্তনু কুমার সাহা জানান, সরকারের কর্মসূচি কার্যকরভাবে বাস্তবায়নে সহযোগিতা করা এ প্রকল্পের অন্যতম উদ্দেশ্য। সেবা পাওয়ার ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর মধ্যে অধিকার সচেতনতা তৈরিতে কাজ করা হচ্ছে। অ্যাডভোকেসির মাধ্যমে ৫ উপজেলার প্রায় সাড়ে ৫শ প্রকৃত হতদরিদ্র ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর মানুষকে এ কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আওলাই ইউনিয়নে এ সংখ্যা ১৪ জন।

তিনি বলেন, প্রথমত চাহিদার তুলনায় বরাদ্দের পরিমাণ এখন অপ্রতুল। তাই বরাদ্দ বাড়াতে হবে। দ্বিতীয়ত, হতদরিদ্র মানুষের ডাটাবেজ না থাকায় প্রকৃত ভাতাভোগী নির্বাচনে বিচ্যুতি ঘটছে। এতে কর্মসূচিতে যাদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কথা তারা অনেক ক্ষেত্রে শুরুতেই বাদ পড়ে যাচ্ছেন।

পামদোর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হৈমন্তী সরকার দেবী বলেন, সাধারণভাবে সমতলের ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী নিজেদের অধিকার সম্পর্কে জানেন না। কেবল সচেতনতার অভাবে তারা যাতে বঞ্চনার শিকার না হন সেটি নিশ্চিত করা জরুরী।

পরিকল্পনামন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল বলেন, বাজেটে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি খাতে প্রতিবছর বরাদ্দ ও ভাতা ভোগীর সংখ্যা বাড়ানো হচ্ছে। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য (এসডিজি) কাউকে পেছনে ফেলে বা বাদ দিয়ে অর্জন করা যাবে না। সমতল ও পাহাড়িসহ সব ধরণের নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীকে অর্থনীতির মূল স্রোতে যুক্ত করা হবে।

প্রতিবেদন : আনোয়ার রোজেন

## প্রাণঘাতী রোগে অসুস্থদের চিকিৎসা সহায়তা তহবিলে বরাদ্দ বৃদ্ধি করেছে সরকার

সরকার দীর্ঘস্থায়ী অসুস্থ রোগী যারা নিজেদের চিকিৎসা ব্যয় বহনে অক্ষম তাদের উন্নত চিকিৎসা নিশ্চিত করতে চলতি অর্থবছরে বরাদ্দ বৃদ্ধি করেছে।

অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আব্দুল মুহিতের ২০১৭-১৮ অর্থবছরের বাজেটে ৫টি প্রাণঘাতী রোগে আক্রান্ত রোগীদের জন্য ৫০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে। এই বরাদ্দ ২০১৬-১৭ অর্থবছরের বরাদ্দের চেয়ে ২০ কোটি টাকার বেশি।

ক্যান্সার, কিডনির অসুস্থতা, লিভার সিরোসিস, স্ট্রোকজনিত প্যারালাইসিস এবং আজীবন হার্টের অসুস্থতার মতো প্রাণঘাতী রোগে আক্রান্তরা ৫০ কোটি টাকার তহবিল থেকে সহায়তা পাবেন। সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় এই অর্থ বিতরণ করা হবে।

বরাদ্দ বাড়ানোর জন্য সরকারের ভূয়সী প্রশংসা করে বাংলাদেশ ক্যান্সার সোসাইটির সভাপতি প্রফেসর ডা. মোল্লা ওবায়দুল্লাহ বাকী বলেন, এই বরাদ্দ বিভিন্ন প্রাণঘাতী রোগে আক্রান্তদের জন্য আরো সহায়ক হবে।

তিনি বলেন, বিভিন্ন কারণে দেশে ক্যান্সার রোগীর সংখ্যা উদ্বেগজনকহারে বাড়ছে।

তিনি বলেন, দেশে প্রতিবছর প্রায় ৩ লাখ লোক ক্যান্সার আক্রান্ত হচ্ছে, এদের মধ্যে ২ লাখই মারা যাচ্ছেন।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (ডব্লিউএইচও) বরাত দিয়ে ডা. বাকি বলেন, দেশের ক্যান্সারের হুমকি মোকাবেলায় অন্তত ১৬০টি ক্যান্সার সেন্টার নির্মাণের পরামর্শ দিয়েছে এই সংস্থা। বর্তমানে দেশে ক্যান্সার সেন্টার রয়েছে মাত্র ২২টি।

তিনি বলেন, এই প্রাণঘাতী রোগে আক্রান্ত রোগীদের দুর্ভোগ লাঘবে সেন্টারগুলোতে আরো উপযুক্ত সরঞ্জাম প্রয়োজন।

কিডনি রোগীদের জন্য আরো তহবিল বরাদ্দের অনুরোধ জানিয়ে ন্যাশনাল

ইনস্টিটিউট অব কিডনি ডিজিস অ্যান্ড ইউরোলজির (এনআইকেডিইউ) প্রফেসর ড. নুরুল হুদা বলেন, দেশে দ্রুত কিডনি রোগী বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রস্তাবিত বাজেটে কিডনি চিকিৎসায় বরাদ্দ বাড়ানো প্রয়োজন।

ওয়ার্ল্ড কিডনি ডে অর্গানাইজিং কমিটি এবং কিডনি অ্যাওয়ারনেস মনিটরিং অ্যান্ড প্রিভেনশন সোসাইটি (কেএএমপিএস) জানায়, দেশের ২ কোটি লোক কিডনি জনিত অসুস্থতায় ভুগছেন।

এদের মধ্যে মাত্র ১০ শতাংশ ব্যয়বহুল চিকিৎসা সুবিধা গ্রহণের ব্যয় বহন করতে পারেন।

ন্যাশনাল লিভার ফাউন্ডেশন অব বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা মহাসচিব এবং লিভার ট্রান্সপ্লান্ট সার্জন প্রফেসর ডা. মোহাম্মদ আলী বরাদ্দ বাড়ানোর জন্য সরকারকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, এই তহবিলের যথাযথ ব্যবহারের বিষয়টি সরকারকে মনিটরিং করতে হবে।

প্রতিবেদন : দিলারা হোসেন, অনুবাদ : আজম সারোয়ার চৌধুরী

## শত দরিদ্র বধির শিশু পেল স্বাভাবিক জীবন

সরকারের যুগান্তকারী পদক্ষেপে শ্রবণের স্বাদ পেয়েছে শত শত দরিদ্র বধির শিশু। সরকারের এই পদক্ষেপে স্বাভাবিক জীবন ফিরে পেয়েছে।

এই প্রকল্পের অধীনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় (বিএসএমএমইউ) বিনামূল্যে এ পর্যন্ত ২৯৩ জন বধিরকে চিকিৎসা দিয়েছে। শ্রবণ শক্তি ফিরে পাওয়া এসব রোগীর অধিকাংশই শিশু। চিকিৎসা নেয়ার পর অধিকাংশ শিশুই প্রথমবারের মতো তাদের বাবা-মায়ে কণ্ঠস্বর শুনতে পায়।

যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক শ্রবণ স্বাস্থ্য বিষয়ক প্রতিষ্ঠান বেল্টন জানায়, ৭০ ভাগ বধির মানুষের ক্ষেত্রে সমস্যার প্রকটতা 'মৃদু থেকে মাঝারি' ধরনের হয়ে থাকে। অন্যদিকে ৩০ ভাগের ক্ষেত্রে এই সমস্যাটি আরো 'গুরুতর' পর্যায়ে থাকে। সাধারণত উচ্চ শব্দের মধ্যে কথা বললে যারা শুনতে পায় না, তাদের 'মৃদু' ক্যাটাগরিতে ফেলা হয়। আর উচ্চ শব্দের মধ্যে কিছুটা উচ্চ স্বরে কথা বললেও যারা শুনতে পায় না, তাদের 'মাঝারি' ক্যাটাগরিতে ফেলা হয়। অন্যদিকে উচ্চ শব্দ তরঙ্গ ব্যবহার করা হলেও যারা শুনতে পায় না, তাদের 'গুরুতর' পর্যায়ে ফেলা হয়।

বিএসএমএমইউ-এর ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক ডা. কামরুল হাসান খান বাসসকে বলেন, গুরুতর শ্রবণ সমস্যা নিয়ে জন্মানো দরিদ্রদের, বিশেষত শ্রবণ সমস্যা নিয়ে জন্মানো দরিদ্র শিশুদের আমরা বিনামূল্যে চিকিৎসা দিচ্ছি। তিনি আরো বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনা অনুসারে সমাজকল্যাণ বিভাগের অর্থায়নে বিনামূল্যে চলছে এই চিকিৎসা কার্যক্রম। ২০১০ সাল থেকে এখন পর্যন্ত কোহেলার ইমপ্ল্যান্টের (সিআই) মাধ্যমে ১৪১ জনের চিকিৎসা দেয়া হয়েছে, যাদের অধিকাংশই শিশু। এ ছাড়াও শ্রবণ শক্তি ফিরিয়ে দেয়ার জন্য ১৫২ জনের সার্জারি করা হয়েছে।

যে কোনো ধরনের সিআই দিতে ১০ থেকে ২০ লাখ টাকা পর্যন্ত খরচ হয়। এখন এখানে বিনামূল্যে সেই চিকিৎসা দেয়া হচ্ছে।

কোহেলার ইমপ্ল্যান্টের (সিআই) আরেক নাম বায়োনিক এয়ার বা বায়োনিক কান। এটি মূলত একটি যন্ত্র যা শব্দ শক্তিকে মস্তিষ্কের উপযোগী বৈদ্যুতিক

সিগনালে পরিণত করে। বিএসএমএমইউ-এর পাশাপাশি এই প্রকল্পের অধীনে বর্তমানে ঢাকা মেডিকেল কলেজ, ইএনটি হাসপাতাল এবং সোসাইটি ফর অ্যাসিস্ট্যান্ট টু হেয়ারিং ইমপায়ারড চিলড্রেন হাসপাতালে এই চিকিৎসা কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়ের মধ্যে বিয়ে, গর্ভবতী অবস্থায় মায়ের হাম, মামস হলে বা রুবেলা ভাইরাসে আক্রান্ত হলে অথবা বিশেষ কিছু ওষুধ ব্যবহার করলে শিশু এই ধরনের জেনেটিক ত্রুটি নিয়ে জন্মাতে পারে।

বধির একটি শিশুর জীবনে বড় ধরনের পরিবর্তন নিয়ে আসতে সক্ষম সিআই। বিশেষজ্ঞদের মতে, ২ থেকে ৫ বছর বয়স এই চিকিৎসা নেয়ার সর্বোত্তম সময়।

উল্লেখ্য, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (ডব্লিউএইচও) মতে, বাংলাদেশের ১৬ লাখ মানুষ শ্রবণ সমস্যায় আক্রান্ত। প্রতি বছর এই দেশে বধির হয়ে জন্ম নিচ্ছে ২ হাজার ৬০০ শিশু।

প্রতিবেদন : দিলারা হোসেন, অনুবাদ : মলয় কুমার দত্ত

## প্রতিবন্ধীরা পাচ্ছে বাঁচার সুযোগ

পটুয়াখালী পৌরসভার গোরস্থান রোডের বাসিন্দা বেলাল হাওলাদার, পেশায় দিনমজুর। সাত সন্তানের জনক বেলাল হাওলাদারকে আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে সংসার চালাতে হিমশিম খেতে হয়। তবুও সব দুঃখ-কষ্ট, অভাব অনটন মেনে নিয়ে কোনোমতে তার দিন কেটে যাচ্ছিল। কিন্তু, মড়ার উপর খাড়ার ঘা-এর মতো ধরা পড়ে তার সাত ছেলেমেয়ের মধ্যে রাকিব ও সাকিব দু'জন জন্মগতভাবে মানসিক প্রতিবন্ধী।

ওদের জন্মের পরপরই বেলাল হাওলাদার ও রুনু বেগম দম্পতি প্রথমে তা বুঝতে পারেন। কিন্তু ধীরে ধীরে তাদের আচরণে অস্বাভাবিকতা লক্ষ্য করেন। পরবর্তীতে ডাক্তারের স্মরণাপন্ন হয়ে ওদের মানসিক অসুস্থতার কথা তারা নিশ্চিত হন। তখন পাড়া-প্রতিবেশী ও আত্মীয়-স্বজনের অনেকেই বলতে শুরু করে বেলাল হাওলাদার ও তার স্ত্রীর পাপের ফল হলো তাদের ওই দুই সন্তান রাকিব ও সাকিব। লোকজনের এ ধরনের কথায় নিরাশ হয়ে পড়েন তারা। একদিকে সন্তানদের অসুস্থতা অন্যদিকে আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে মানসিকভাবে ভেঙে পড়েন তারা।

বেলাল হাওলাদারের সার্বিক অবস্থা বিবেচনা করে উপজেলা চেয়ারম্যান স্থানীয় সমাজসেবা কার্যালয়ের সহায়তায় তার দুই ছেলের জন্য প্রতিবন্ধী ভাতার ব্যবস্থা করে দেন। এরপর থেকে প্রতি মাসে মাথাপিছু ৬০০ টাকা করে ৩ মাস পর পর ৩ হাজার ৬০০ টাকা সরকারি ভাতা গ্রহণ করে আসছেন তারা। যে টাকা দিয়ে শুধু তার প্রতিবন্ধী ছেলেদের ওষুধপত্রই নয়, সংসারের দৈনন্দিন প্রয়োজনও মেটানো হচ্ছে।

এমনই আরেকজন হলেন ৩৭ বছর বয়সী শারীরিক প্রতিবন্ধী নারী মনোয়ারা খাতুন কমলা। ১৯৮০ সালে কুষ্টিয়ার খোকসার পল্লী বনগ্রামে দরিদ্র কৃষক ইসমাইলের ঘরে জন্মগ্রহণ করা কমলার শারীরিক অবস্থা ছিল খুবই দুর্বল। পরিণত বয়সেও তার উচ্চতা আড়াই ফুট। বাবা-মায়ের একমাত্র মেয়ে কমলা যে শারীরিকভাবে অক্ষম সেটি জানতে তাদের সময় লেগে গিয়েছিল ৫ বছর। তখন আদরের ধন কমলাকে নিয়ে বাবা-মায়ের ভাবনার অন্ত ছিল না। কিন্তু তাকে নিয়ে এখন আর উদ্বিগ্ন নন বাবা-মা।

মানুষের সব হাস্য-তামাশাকে উপেক্ষা করে উদ্যোগী কমলা ২০০০ সালে কৃতিত্বের সঙ্গে ডিগ্রি পাস করেন। ছোটবেলা থেকেই কমলার স্বপ্ন ছিল অবহেলিত অসচ্ছল প্রতিবন্ধীদের জন্য কিছু করার। ছাত্রজীবন থেকেই তিনি প্রতিবন্ধীদের নিয়ে নানা ধরনের উন্নয়নমূলক কাজ করতেন। তারই ফলস্বরূপ ২০০৩ সালে আরেক প্রতিবন্ধী আসলামকে সঙ্গে নিয়ে অসচ্ছল, দরিদ্র, সুবিধাবঞ্চিত প্রতিবন্ধীদের কর্মসংস্থান ও তাদের অধিকার বাস্তবায়নের জন্য

উপজেলা সদরে গড়ে তোলেন খোকসা উপজেলা প্রতিবন্ধী কল্যাণ সংস্থা। আর এ সংগঠনটিই এখন কমলা ও আসলামের মতো অনেক প্রতিবন্ধীর স্বপ্ন বাস্তবায়নের কারখানা। বর্তমানে ৩৯৫ জন শারীরিক প্রতিবন্ধী একযোগে কাজ করছেন এ সমিতির কুটিরশিল্পে। কমলাসহ এখানের অধিকাংশ প্রতিবন্ধীই সরকারের দরিদ্র অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতার আওতাভুক্ত। তাছাড়া এ সংস্থাটি পরিচালনার জন্য সমাজ কল্যাণ অধিদপ্তর থেকে কমলা প্রতি বছর ১০ হাজার টাকা করে পান।

প্রতিবন্ধী-বান্ধব সরকার শুধু রাকিব-সাকিব কিংবা কমলার ভবিষ্যৎই সুনিশ্চিত করেনি, এখন অনেক রাকিব-সাকিব ও কমলা আত্মনির্ভরশীল ও সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিতও হয়েছে।

সমাজসেবা অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক ফরিদ আহমেদ মোল্লার সঙ্গে এ বিষয়ে কথা বলে জানা গেছে, সরকার দরিদ্র অসচ্ছল প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর ভাগ্য পরিবর্তন ও জীবনমান উন্নয়নে প্রতিবন্ধী ভাতা কর্মসূচি প্রবর্তন করে। সে সময় ১ লাখ ৪ হাজার ১৬৬ জন প্রতিবন্ধীকে মাসিক ২০০ টাকা হারে এ ভাতা প্রদান করা হতো। কিন্তু পরবর্তীতে ক্রমান্বয়ে সুফলভোগীর সংখ্যা ও টাকার পরিমাণ বাড়ানো হয়। বর্তমানে এ কর্মসূচির আওতায় ৭ লাখ ৫০ হাজার প্রতিবন্ধীকে মাসিক ৬০০ টাকা হারে ৫৪০ কোটি টাকা ভাতা প্রদান করা হচ্ছে। তিনি আরো জানান, ইউনিয়নের পাশাপাশি সিটি কর্পোরেশনে বসবাসকারী প্রতিবন্ধীরাও এ সুবিধা পাচ্ছেন। তাছাড়া প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের

জন্য শিক্ষার প্রাথমিক থেকে উচ্চ স্তর পর্যন্ত উপবৃত্তি ঘোষণা করা হয়েছে। এক্ষেত্রে যথাক্রমে প্রাথমিক স্তরে ৫০০ টাকা, মাধ্যমিক স্তরে ৬০০ টাকা, উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে ৭০০ টাকা এবং উচ্চতর স্তরে মাসিক ১ হাজার ২০০ টাকা প্রদান করা হচ্ছে। প্রতিবন্ধীদের আত্মকর্মসংস্থানের জন্য ৫ হাজার টাকা থেকে ৩০ হাজার টাকা পর্যন্ত সুদমুক্ত ঋণ এবং বিনামূল্যে বৃত্তিমূলক ও কারিগরি প্রশিক্ষণ এবং প্রশিক্ষণ শেষে তাদের আত্মনির্ভরশীল করার জন্য এককালীন অনুদান প্রদান করা হচ্ছে। দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য ব্রেইল নামে বিশেষ বইয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে, পাবলিক পরীক্ষায় প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য অতিরিক্ত ৩০ মিনিট সময় বরাদ্দ করা হয়েছে,

তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির চাকরিতে প্রতিবন্ধীদের জন্য ১০ শতাংশ কোটা এবং প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির চাকরিতে এক শতাংশ কোটা ঘোষণা করা এবং প্রতিটি উপজেলায় বিশেষায়িত স্বাস্থ্যসেবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এছাড়া বর্তমানে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে প্রতিবন্ধী শিশুদের মানসিক বিকাশে একাধিক প্রতিষ্ঠান কাজ করছে। ঢাকা সেনানিবাসে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য 'প্রয়াস' নামে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছে, কুমিল্লা, চট্টগ্রামেও এর শাখা প্রতিষ্ঠার কাজ চলছে। পাশাপাশি সব সেনানিবাসে এর শাখা চালু করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

তিনি জানান, ভাতা দেয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধিত্বের ধরন, মাত্রা ও আর্থিক অবস্থাকে প্রাধান্য দেয়া হয়। এক্ষেত্রে কাজ করতে পুরোপুরি অক্ষম ও অসচ্ছল ব্যক্তিদের অগ্রাধিকার দেয়া হয়। ওয়ার্ড কমিটি দরখাস্ত আহ্বান করে। ভাতা গ্রহণে আগ্রহী আবেদনকারীকে আবেদনপত্র সংগ্রহ করে ওয়ার্ড কমিটির সভাপতি বরাবর জমা দিতে হয়। উপজেলা চেয়ারম্যানের পরামর্শে চূড়ান্ত তালিকা প্রণয়ন করা হয়। চূড়ান্ত প্রার্থী নির্বাচনের পর উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা উপজেলা কমিটির চূড়ান্ত অনুমোদিত তালিকা ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্য উপজেলা হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তার কাছে পাঠান। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার স্বাক্ষরসহ আবেদনকারীকে একটি পাস বই দেয়া হয়। উপজেলা হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা এ বই দিয়ে থাকেন। উপজেলা হিসাবরক্ষণ অফিস আবেদনকারীর নাম, ছবি ও সম্ভব হলে নমুনা স্বাক্ষরসহ রেজিস্টার সংরক্ষণ করেন। অতঃপর স্থানীয় তফসিলি ব্যাংকে আবেদনকারীকে ১০ টাকার বিনিময়ে ব্যাংক হিসাব খুলতে হয়। তিন মাস পর পর প্রার্থীর ব্যাংক হিসাবে ভাতার টাকা জমা হয়।

তিনি আরো বলেন, সরকারের উদ্যোগ ও পদক্ষেপ প্রতিবন্ধী শিশুদের সমাজের মূলস্রোতধারায় সম্পৃক্ত করতে ব্যাপক ভূমিকা রাখছে। এ ভাতা দরিদ্র,অসচ্ছল প্রতিবন্ধীদের জীবনযাপনের মান বৃদ্ধি করছে। তিনি সরকারের এ উদ্যোগকে সফল করতে সমাজের উচ্চবিত্ত শ্রেণিকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

প্রতিবেদন : তাহামিনা ইসলাম

## বিধবা ভাতা কর্মসূচি অসহায় বিধবাদের জীবনমান উন্নয়নে কাজ করছে

ঢাকার কেরানীগঞ্জ উপজেলার রিনা বেগম, মাকসুদা বেগম ও বেবী। বয়সের ভারে অনেক আগেই তারা কর্মশক্তি হারিয়েছেন। পরিবারের কাছে তারা হয়ে উঠেছিলেন বোঝা। কাজ করতে না পারলে প্রায়ই অনাহারে-অর্ধাহারে দিন কাটাতে হতো। বর্তমান সরকারের বিধবা ভাতা কর্মসূচি তাদের জীবনে এনে দিয়েছে পরিবর্তন। তারা দু'বেলা দু'মুঠো ভাতের নিশ্চয়তা পাচ্ছেন। ছেলে-বউ-মেয়ের সংসারে কদরও বেড়েছে।

ঢাকার কেরানীগঞ্জ উপজেলার জিনজিরা ইউনিয়নের কসাইভিটা গ্রামের মৃত সোয়াব আলীর স্ত্রী বেবী বলেন, 'শেখ সাহেবের মাইয়্যা বিধবা ভাতা দিছিলো বইল্যা, চইলা খাইতে পারতাছি। নইলে মাইনষের লাথিথ-উষ্ঠা খাইয়্যা মরণ লাগত। কসাইভিটা গ্রামের ৬৭ বছর বয়সী বেবীর টিকে থাকার সম্বল এই বিধবা ভাতার টাকা। এই টাকাতেই চলে নিজের চিকিৎসা। একমাত্র ছেলের সংসারে নাতি-নাতনিদের এটা-ওটা কিনেও দিতে পারেন।

প্রতিবেদকের সঙ্গে আলাপকালে তিনি জানান, এক পুত্র সন্তান জন্মের পরই স্বামী রেখে চলে যায়। কখনো ভিক্ষা করে, কখনো মানুষের বাসায় কাজ করে ছেলেকে মানুষ করেছেন। টাকার অভাবে ছেলেকে লেখাপড়া শেখাতে পারেননি। এখন আর কাজও করতে পারেন না। চোখে দেখেন না, ঠিকমতো কানেও শোনেন না। একমাত্র ছেলেকে বিয়ে করিয়েছেন। ছেলের সংসারেই থাকেন। দুটি নাতি আছে। তারা লেখাপড়া করে। ছেলে ছাড়া পৃথিবীতে তার কেউ নেই। ছেলে কাজ করে কেরানীগঞ্জের একটি গ্যারেজে। যে টাকা পায় তা দিয়ে সংসার চালানোই কঠিন। কখনো কখনো মানুষের কাছে হাত পাততে হয়। বেবীর এ অবস্থা দেখে এলাকার লোকজন তাকে একটি বিধবা ভাতার কার্ডের ব্যবস্থা করে দেয়।

রিনা বেগমের বয়স এখন ৫৪ বছর। স্বামী মারা গেছেন অনেক বছর আগে। শ্বশুরবাড়ির আর্থিক অবস্থা ভালো না বলে স্বামীর মৃত্যুর পর ১০ বছরের মেয়েকে নিয়ে বাবার বাড়ি চলে আসেন। বাবার সংসারে কোনো রকম খেয়ে-পরে বাঁচলেও বাবার মৃত্যুর পর শুরু হয় কঠিন জীবন যুদ্ধ। কোনো উপায় না পেয়ে রিকশাচালক ভাইয়ের বাড়িতে আশ্রয় নেন। সেখানে অর্ধাহারে-

অনাহারে, অন্যের বাড়িতে কাজ করে কোনো রকমে দিন চলে যেত। মেয়ে বড় হলে মেয়েকে বিয়ে দেন রিনা বেগম। মানুষের বাড়িতে কাজ করে কোন রকমে চলে যাচ্ছিল জীবন। হঠাৎ প্যারালাইসিসে ডান পাশ অবশ হয়ে যাওয়ায় এখন আর কাজ করতে পারেন না। চিকিৎসায় অনেক টাকা লাগে। মেয়ে ছয়-সাত মাস পরপর দুই-তিনশ টাকা দেয়। তার অবস্থা দেখে ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য আলো আপা স্থানীয় সমাজসেবা কার্যালয়ের সহায়তায় বিধবা ভাতার ব্যবস্থা করে দেন।

রিনা বেগম জানান, প্রথম দিকে মাসে ৩০০ টাকা করে ভাতা পেতেন। বর্তমানে সরকার তা ৫০০ টাকায় উন্নীত করেছে। প্রতি তিন মাস পর পর ব্যাংক থেকে ভাতার টাকা তুলে নিজের চিকিৎসা ও ওষুধ কিনতে ব্যয় করেন। মাঝে মাঝে ভাইয়ের সংসারে বাজারও করে দেন। এতে ভাইও খুশি হন। এই পদক্ষেপের জন্য তিনি সরকারের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তবে বর্তমান বাজার দরের সঙ্গে তাল মেলাতে রিনা বেগম বিধবা ভাতা ৫০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ১০০০ টাকা করার সুপারিশ করেন।

ছোট্ট একটা একচালা ঘরে ছেলে, ছেলের বউ এবং নাতি-নাতনিদের নিয়ে কোনো রকমে মাথা গুঁজে থাকেন মাকসুদা বেগম। বয়স ৭২ বছর। স্বামী শামসুদ্দিন মারা গেছেন ৩০ বছর আগে। অভাবের সংসারে দুই ছেলেকে লেখা-পড়া করাতে পারেননি। বড় ছেলে গাড়িচালক। আর ছোট ছেলে দোকানে কাজ করে। আগে সংসারের কাজ করতে পারতেন। এখন শরীর চলে না। খুব শ্বাসকষ্ট। শ্বাসকষ্টের জন্য ঠিকমতো কথাও বলতে পারেন না। ছেলেদের আয় কম। মায়ের ওষুধ কেনার সামর্থ্য তাদের নেই।

মাকসুদা বেগম বলেন, ‘সরকারের উছিলায় একটা বিধবা ভাতার কার্ট (কার্ড) পাইছি। ওইহান থে যে টেকা পাই ওই টেকা দিয়া ওষুধ খাই। কিন্তু অনেক টেকার ওষুধ লাগে। ওই টেকায় হয় না। মাইনসের কাছ থেইক্যা ধার করতে হয়।’ তিনি বিধবা ভাতার টাকা তিন মাস পর পর না করে প্রতি মাসে টাকা উঠানোর ব্যবস্থা করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

সমাজসেবা অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক ফরিদ আহমেদ মোল্লা এ প্রতিবেদককে বলেন, দরিদ্র, অসহায়, পশ্চাদ্রপদ, অনগ্রসর, অবহেলিত বিধবা জনগোষ্ঠীর সামাজিক নিরাপত্তা বিধান ও আর্থসামাজিক উন্নয়ন, পরিবার ও সমাজে তাদের

মর্যাদা বৃদ্ধি, মনোবল জোরদার, চিকিৎসা সহায়তা ও পুষ্টি সরবরাহ বৃদ্ধিতে ১৯৯৮-৯৯ অর্থবছরে এ কর্মসূচি প্রবর্তন করা হয়। সে সময় ২ লাখ ১ হাজার ৫৫৫ জন বিধবাকে মাসিক ১০০ টাকা হারে ৪ কোটি ৩ লাখ ১১ হাজার টাকা ভাতা প্রদান করা হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীতে ক্রমান্বয়ে সুফলভোগীর সংখ্যা ও টাকার পরিমাণ বাড়ানো হয়। বর্তমানে এ কর্মসূচির আওতায় ৬৯০ কোটি টাকা ভাতা দেয়া হচ্ছে। ভাতাভোগীর সংখ্যা ১১ লাখ ১৩ হাজার ২০০ জন থেকে বাড়িয়ে ১১ লাখ ৫০ হাজার জনে এবং জনপ্রতি মাসিক ভাতার হার ৪০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৫০০ টাকা করা হয়েছে। এ কর্মসূচির আওতায় সারাদেশে সুফলভোগীর সংখ্যা বেড়েছে ৩৬ হাজার। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে জেলা সমাজসেবা কার্যালয়ের মাধ্যমে বিধবাদের এ ভাতা দেয়া হয়।

তিনি জানান, বিধবা ভাতা দেয়ার জন্য শারীরিকভাবে অক্ষম, নিঃস্ব, উদ্বাস্তু, ভূমিহীন, নিঃসন্তান ব্যক্তিকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেয়া হয়। এক্ষেত্রে ওয়ার্ড কমিটি দরখাস্ত আহ্বান করে। ভাতা গ্রহণে আগ্রহী আবেদনকারীকে আবেদনপত্র সংগ্রহ করে ওয়ার্ড কমিটির সভাপতি, সদস্য সচিব বরাবর জমা দিতে হয়। উপজেলা চেয়ারম্যানের পরামর্শে চূড়ান্ত তালিকা প্রণয়ন করা হয়। উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা উপজেলা কমিটির চূড়ান্ত অনুমোদিত তালিকা ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্য উপজেলা হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তার কাছে পাঠান। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার স্বাক্ষরসহ প্রার্থীকে একটি পাস বই দেয়া হয়। উপজেলা হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা এ বই দিয়ে থাকেন। উপজেলা হিসাবরক্ষণ অফিস বিধবা ভাতা প্রার্থীর নাম, ছবি ও নমুনা স্বাক্ষরসহ রেজিস্টার সংরক্ষণ করেন। স্থানীয় তফসিলি ব্যাংকে প্রার্থীর ১০ টাকার বিনিময়ে ব্যাংক হিসাব খুলতে হয়। তিন মাস পর পর প্রার্থীর ব্যাংক হিসাবে ভাতার টাকা জমা হয়। কেরানীগঞ্জের জিনজিরা ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য আছিয়া খাতুন আলো দেশের দরিদ্র বিধবা নারীদের জীবন মানোন্নয়নে এই কর্মসূচিকে একটি যুগান্তকারী কর্মসূচি হিসেবে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, এ ভাতা অসহায় বিধবাদের জীবন যাপনের মান বৃদ্ধি করে। এই ভাতার পরিমাণ বাড়ালে বিধবাদের সত্যিকারের উপকার হবে। তিনি সরকারের এ উদ্যোগকে সফল করতে সমাজের উচ্চবিত্ত শ্রেণিকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

প্রতিবেদন : তাহামিনা ইসলাম

## Ethnic minority people get a new lifeline

Rita Mali (35) is no more a poor woman. She is now economically self-reliant as her socio-economic condition improved to a great extent.

The credit goes to the Social Safety Net Programme, launched by the government to support ultra-poor and cut poverty to achieve Sustainable Development Goals (SDGs).

Rita, a landless ethnic woman of Chhatinali village under Panchbibi upazila of Joypurhat district, was unable to manage three meals a day for herself, four daughters and her ailing husband only a few years ago.

Now, she sends her children to school and helps her husband to run his small business besides earning the cost of foods and treatment for her family.

Her life has changed a lot. Now, she is dreaming of her children's higher education, buying land and starting a business in her locality to improve her economic conditions further.

"My family did not have any other property than a little house on a small piece of land. I used to work as a housemaid which was not enough to feed my six members family," said Rita while talking to BSS at her village home.

She said her husband Nikhil Mali (45) used to work in a tailoring shop on daily wage. He, however, could not continue the job due to illness.

Against this backdrop, Rita was desperate to get a better means of earning to support her family. One day she came to know from a worker of a non-government organisation about the Social Safety Net Programme of the government.

Eventually, she went to Awlai Union Parishad office and started working in the government's 40 days programme.

Since then, Rita has been earning Taka 7,000 a month by working under the programme. The value of this amount is immense for her family. Her elder daughter, who was studying in a BRAC school, received Taka 15,000 as education stipend.

Together with her savings and her daughter's scholarship, she bought a cow, which gave birth to a calf.

"My poverty has gone, I am now self sufficient. I earn Taka 70 to 80 per day by selling cow milk. The cow and the calf can also be sold for Taka 40,000 to 50,000," said a happy Rita.

Like Rita, Bithi Mali, another ethnic co-villager, used to work in government's 40-day Social Safety Net Programme.

A day labourer's wife Bithi could not manage daily meal for her family. Now, the landless lady has a saving from her earnings to set up a small poultry farm. She hoped that her dream would come true should the safety-net programme continues in her area.

The government has undertaken a massive Social Safety Net Programme across the country especially for the ethnic people in the plain land aimed at scaling down the number of ultra-poor people. This programme has already started improving the living standard of the ethnic people.

When this correspondent visited different villages, including Chhatinali, Luxmipur and Kadmia under Awlai union of Panchbibi upazila in Joypurhat district, he found that ethnic people's participation in the government's Social Safety Net

Programme has increased significantly in the recent years.

Over 2,000 ethic people live in Awlai union. They do not have any land property. Most of them have no access to modern day's facilities like electricity and paved roads.

These problems, however, were not obstacles to bring Anna Kujo (27) under the Social Safety Net Programme in providing her with a VGF (Vulnerable Group Feeding) card. "We did not get any support from the government in the past...Even we did not know what VGF card was," said Anna.

"I have gotten my VGF card through Union Parishad, which brought an end to my long struggle for food," she said, expressing her gratitude to the government.

Devid Kujo (80), a beneficiary of elderly allowance initiated by the government, also shared the same feeling.

Awlai Union Parishad Chairman Abdul Razzak Mandal said nearly 3,000 poor people in his union are now under different Social Safety Net Programmes.

Among those, 300 people belong to ethnic group while 30.0 per cent of the total allocation of the safety net programme has been kept for the ethnic minority, he said.

Project Director of Establishing Vulnerable Peoples Rights and Access (EVPRA) to social safety net programmes of World Vision Shantanu Kumar Saha said, a total of 5,500 ultra poor ethnic people in five upazilas under Joypurhat district have been included in the programmes due to their advocacy programme.

He suggested increasing allocation to the project since the present allocation is not enough against the demand.

Planning Minister AHM Mustafa Kamal told BSS that allocation and number of beneficiaries of the Social Safety Net Programme would increase in the next financial year.

He said that Sustainable Development Goals (SDGs) cannot be achieved by keeping the eligible people out of the programme.

The minister added that all ethnic groups, both in the hill tracts and plain land, would be brought under the mainstream of national development initiatives to achieve the SDGs.

Report : Anwar Rosen, Translation : Aminul Islam Mirja

## Govt. increases funding for terminally ill patients

The government has increased the fiscal allocation for ensuring better treatment of the terminally ill patients who are unable to arrange their own treatment cost.

Finance Minister AMA Muhith in his budget for the 2017-18 fiscal year (FY18) proposed an allocation of Taka 50 crore for supporting the patients suffering from five deadly diseases. The allocation is significantly higher than the Taka 20 crore allocation for the 2016-17 financial year (FY17).

The patients who are suffering from five life threatening diseases, including cancer, kidney ailment, liver cirrhosis, stroke related paralysis and congenital heart ailment will get support from the Taka 50-crore fund, which would be disbursed under social safety-net programme.

Lauding the government's initiative to increase the allocation, Bangladesh Cancer Society President Professor Dr Molla Obaedullah Baki said this would help provide more support to the patients who are suffering from different deadly diseases.

He said the number of cancer patients in the country is increasing at an alarming rate due to various causes.

"There are nearly three lakh people are affected by cancer every year in the country, of them around two lakh die," he said.

Giving reference to the World Health Organisation (WHO), Dr Baki said the WHO recommended establishing at least 160 cancer centres in the country to treat cancer patients properly. The country, however, now have only 22 centres.

Besides, he said the centres need more and proper equipment to deal with the patients suffering from the deadly diseases.

Urging the government for allocating more funds for kidney patients, Director of National Institute of Kidney Diseases

and Urology (NIKDU) Professor Dr Nurul Huda said the increased allocation in proposed budget is very low as the kidney patients rising rapidly in the country.

"With the modernisation of the country, we also loosing adequate place for physical activities which cause diabetes and high blood pressure and in the long run these too diseases cause kidney ailment", he said.

According to the World Kidney Day organising committee and the Kidney Awareness Monitoring and Prevention Society (KAMPS), around two crore people in the country are now affected by kidney ailment. Among them, only 10.0 per cent can afford treatment due to its higher expenditure.

Founder Secretary General of National Liver Foundation of Bangladesh and liver transplant surgeon Professor Dr Mohammad Ali thanked the government for the increased allocation, but he said the government should monitor utilisation of the fund.

He also suggested that the government should introduce a strategy on Hepatitis with the increased allocation, which would help enhance awareness to prevent the disease.

The expert said these all are long term disease and treatments are costly, too. Moreover all the diseases are increasing day by day at alarming rates.

About 1.5 crore people suffer from chronic liver disease hepatitis-B virus, 8 lakh from hepatitis-C virus and nearly 2 crore from other liver-related diseases like liver cirrhosis, cancer and fatty liver disease, according to Bangladesh Hepatology Society.

Report : Dilara Hossain

## Hundreds hearing impaired poor get normal life

A life-changing initiative of the government has become a blessing for many hearing impaired poor, with giving them the ability of listening to others and doing all activities like normal ones.

Under the initiative, Bangabandhu Sheikh Mujib Medical University (BSMMU) alone successfully treated 293 people, mostly the children who had been suffering from profound hearing loss. After getting the treatment, many of the children heard their parents for the first time.

According to Beltone, a US-based global leader in hearing health care, nearly 70.0 percent of hearing aid wearers have hearing loss in the "mild-to moderate" range. Many of the remaining 30.0 per cent have hearing loss that falls into the "severe-to-profound" category.

The people who have difficulty in hearing soft speech in noisy situations fall in mild category and the moderate category people cannot hear moderate speech when background noise is present.

The people with sever to profound hearing loss have difficulty in hearing and understanding even with amplification.

"We are treating poor people, especially the children who have profound hearing loss to give them the ability of leading a normal life," vice-chancellor of Bangabandhu Sheikh Mujib Medical University (BSMMU) Prof Dr Kamrul Hasan Khan told BSS.

He said the free treatment is given under a project as per the direction of Prime Minister Sheikh Hasina and with funding from the social welfare ministry.

Since 2010, BSMMU had treated 141 poor people, mostly children, with Cochlear Implant (CI) when 152 people went under surgery for getting hearing ability, Prof Khan said.

He said that the cost of a CI ranges Taka 10 to 20 lakh, but poor children are getting those free at BSMMU.

CI, also known as bionic ear, is an artificial electronic hearing device designed to produce useful hearing sensations by stimulating cochlear nerve inside the inner ear. It transforms the mechanical energy of sound into electrical energy which directly excites the remaining auditory fibre.

Besides the BSMMU, CI surgery is now going on in Dhaka Medical College, ENT Hospital and Society for Assistance to Hearing Impaired Children in the capital city.

Experts identified genetic factor, transmitted mainly through marriage between consanguineous relatives; and measles, mumps, rubella virus attack during pregnancy and taking some drugs are the major causes that damage the sound sensitive cochlea of a baby.

The CI could make a big difference to the life of the deaf people, especially the children in the country, the experts said, adding that children aged 2 to 5 years are the most suitable for the treatment.

According to World Health Organisation (WHO), about 16 lakh people in Bangladesh are suffering from acute deafness while 2600 children are born every year with deafness.

Report: Dilara Hossain

## Disabled people getting scope to survive

Belal Hawlader, a resident of Gorsthan (graveyard) Road of Patuakhali Pourasabha, is a day-lobourer by profession. The father of seven children, Belal Hawlader was struggling to run his family due to financial insolvency. He was passing his days somehow by accepting sorrow, pain and hardship. But his sufferings increased further when two of his children -- Rakib and Shakib -- were detected as mentally-challenged by born.

Belal Hawlader and his wife Runu Begum could not understand the problem immediately after the birth of their two children. They noticed their abnormality from their behaviour gradually. They were confirmed of their mental sickness when they visited doctors later. At that time many neighbours and relatives started talking that Rakib and Shakib are the result of the sin of Belal Hawlader and his wife. The couple got frustrated for such comments of the people. They were broken down mentally due to sickness of the two children in one hand and the financial insolvency in the other hand.

Considering the situation of Belal Hawlader, the upazila chairman with the assistance of local Social Service Office has arranged disabled allowance for his two children. They are now receiving the government allowance of Taka 3600 after three months as Tk 600 per person in every month. With this money, they are not only buying medicines for the physically-challenged children, they are also meeting their daily needs.

Monwara Khatun Kamola, a 37-year-old physically-challenged woman, is another such person. The physical

condition of Kamola, who was born in a house of poor farmer Ismail at Banagram village under Khoksha upazila in Kushtia in 1980, was very weak. Her height was only two and a half feet when she became an adult. Her parent needed five years to know that their only child Kamola is physically incapable. At that time they were so much worried about Kamola. But now they are not concerned about her.

Amid physical and social challanges, Kamola passed degree examination with good results. From the childhood, she had a dream of doing something for the neglected and insolvent disabled people.

From the student life, she used to do various types of development work. Along with Aslam, another disabled, Kamola established Khoksha Upazila Protibandhi Kalyan Sangstha for creating employment and realising the rights of insolvent, poor and disadvantageous disabled people. This organisation is now running a cottage industry for materialising dreams of many disable like Kamola and Aslam. Currently, 395 persons with disabilities are working together in the cottage industry of the organisation. Most of the disabled including Kamola have been brought under the allowance for the poor and insolvent disabled. Besides, Kamola is getting Tk 10,000 every year from the Directorate of Social Welfare to run the organisation.

The government has not only ensured the future of Rakib, Shakib or Kamala, many like Rakib, Shakib and Kamola are now self-dependent and well-established in the society due to effective support from the government.

Deputy Director of the Department of Social Service Farid Ahmed said the government introduced the allowance for the persons with disablities for improving the living standard of the poor and insolvent disabled people.

Initally a Tk-200 monthly allowance was provided to 1,04,166 disabled people. But the number of beneficiaries and the amount of money were increased later. Currently, Tk 540 crore are being given to 7.50 lakh physically challenged people at a monthly rate of Tk 600. Besides, stipend for the students with disabilities has been declared from the primary level to higher level. Interest-free loan from Tk 5000 to Tk 30,000 are being provided for self-employment of the physically-challenged. One time grants are also being given to them for vocational training and making them self-reliant .

The other steps that have been taken for the welbeing of the people with disabilities included arrangement for special books named “brail” for the visually-impaired students, allocation of 30 minutes additional time in the public examinations for the disabled students, preservation of 10 per cent quota in class three and four jobs and one per cent quota in class one and two jobs and arrangement of specialised healthcare services for the disabled in every upazila.

A number of organisations are working at government and private levels for supporting mental growth of the physically-challenged children. A school named “Proyash” has been launched at Dhaka Cantonment for the students with disabilities. Work is underway to establish its branch in Comilla and Chittagong, while directives have been given to launch such schools at all cantonments. Farid Ahmed said types and level of disability and financial condition of the challenged people are given priority in providing allowance. In this case, preference is given to those who are insolvent and fully incapable of doing work.

He said the government initiatives and measures are playing a massive role in integrating physically-challenged children in the mainstream of the society.

“This allowance has improved the living standard of the poor and insolvent disabled,” Farid Ahmed said, urging the well-off people to come forward to make the government initiative a success.

Report: Tahamina Islam, Translation: A Z M Sajjad Hossain Sabuj

## Widow allowance changes lives of destitute women

The ordeal of Baby Begum, Rina Begum and Maksuda Begum, the three widows of Jinjira union in Keraniganj upazila of Dhaka district, has come to an end, thanks to the allowances provided by the government to the widows.

The dreams of the three ultra-poor women shattered following the death of their husbands in several years back, but things started changing with receiving the allowances.

They are now dreaming of rebuilding live, keeping behind their horrific past.

“I have started dreaming of a good living since the daughter of Bangabandhu Sheikh Mujib and current Prime Minister, Sheikh Hasina, gave us (widow) allowance. Now I can buy food for my grandchildren,” a sexagenarian widow from Kashaivita village, Baby Begum, said in her local accent.

The widow allowance is the only source of Baby Begum’s survival as it helps meeting her treatment cost and paying for food for her grandchildren.

The ordeal of Baby Begum begun following death of her husband Shoeb Ali after she gave birth of her only son, who is now working at a motor garage.

She used to beg for her survival besides occasionally working as housemaid in the village. Her economic condition forced her to keep her only son away from school.

The 67-year old Baby Begum has been suffering from many health-related complications since her husband’s death, which forced her to begging door to door.

Seeing Baby Bagum's condition, the local government authority gave her a Widow Allowance Card that immensely changes her life. Like Baby Begum, Rina Begum and Maksuda Begum of the same village had to struggle for living before getting widow allowances.

Now, the allowances have brought tremendous changes to the lives of these poor and distressed old women. The struggle of Rina Begum (54) begun after death of her husband a few years back when her only daughter was 10 years old.

She took shelter at her rickshaw-puller brother's house along with her daughter when she worked as a maid in different households in the locality for living.

Meantime, she arranged marriage of her daughter. But, bad fortune always haunted her as suddenly the left side of her body paralysed following a severe stroke which forced her begging to bear the treatment cost and other expenses.

The ordeal of her life came to an end when Alo Begum, a local female union parishad member, arranged a widow allowance card for her.

"Initially, I got Taka 300 as widow allowances per month, now the amount has been raised at Taka 500," said the apparently happy Rina Begum while talking to this reporter at her house.

Now, I can bear my medical expenses and also buy foods with the money which I withdraws after every three months, she said adding that these allowances had immensely helped her to live with honour in her family.

Expressing her gratitude to the present government for introducing the programme for the distressed humanity in

society, she requested the government to raise the amount at Taka 1000 from the existing Taka 500 considering the present market value of essentials.

Almost same things happened to Maksuda Begum (72), who lost her husband Shamsuddin Miah 30 years back. Maksuda, an asthma patient, had to lead her life by begging following her husband's death.

Now, a widow allowance card brought changes to her life. "I got a widow allowance card by the government...Now I can buy medicine and food from the money that I withdraw after every three months," said Maksuda. She requested the government to facilitate the process for monthly withdrawal of the money.

Deputy Director of the Department of Social Service Farid Ahmed Molla said the previous Awami League government had introduced the programme in 1998-1999 fiscal year aimed at ensuring socio-economic development of the poor widows and their social security so that they can live in the society with honour and dignity. Initially, more than Taka 4,03,11,000 crore was provided to 2,01,555 lakh widows when each woman got Taka 100. Now, the amount and the number of beneficiaries have been increasing gradually.

At present Taka 690 crore has been providing to the beneficiaries while each beneficiary is getting Taka 500 monthly.

He said widows, who are physically challenged, landless, have no child and are considered as distressed women, are nominated for the widow allowances.

The list of the beneficiaries has to be made following recommendation of upazila chairman. After getting

nomination, the beneficiary has to open a bank account by depositing only Taka 10 for withdrawing of the allowance, Molla said.

Describing the widow allowance as an epoch-making programme of the government, Jinjira Union Parishad member Asia Khatun said it has brought tremendous changes to the livelihood of the distressed and widows across the country.

She called upon the affluent persons of the society to help making the programme a great success for the welfare of the nation.

Report : Tahamina Islam, Translation : Aminul Islam Mirja

বিশেষ উদ্যোগ ৯

# বিনিয়োগ বিকাশ

“শেখ হাসিনার নির্দেশ, বিনিয়োগ বান্ধব বাংলাদেশ”

## বিনিয়োগ বিকাশ


দেশে ডিসেম্বরের মধ্যেই আরো ১০টি অর্থনৈতিক অঞ্চল তৈরির কাজ শেষ হবে : বেজা ২৩৭

বিদেশি বিনিয়োগ বাড়াতে চালু হচ্ছে “ওয়ানস্টপ সার্ভিস” ২৩৯

উত্তরা ইপিজেডে বিনিয়োগ বৃদ্ধিতে জোরদার হচ্ছে গ্রামীণ অর্থনীতি ২৪১

সহজ শর্তে ঋণ পাওয়ায় বাড়ছে নারী উদ্যোক্তা ২৪৪

পর্যটন শিল্পের বিকাশে ডিজিটাল উদ্যোগ ২৪৭

10 more EZs to be ready for investment by December: BEZA 249

One-stop service centre to drive FDI inflow 251

Uttara EPZ starts improving rural economy 253

Easy loan help rapid rise of women entrepreneurs 256

BTB exploring social media for promoting tourism 260

বাংলাদেশ এক বিপুল সম্ভাবনার দেশ। অতীতে এদেশের সৌন্দর্য এবং সম্পদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে আরব ও ইউরোপ থেকে বণিকরা বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে এদেশে আসত। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দায়িত্ব নিয়েই দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার জন্য বেশ কিছু যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। বিনিয়োগের অন্যতম পূর্বশর্ত হলো বিদ্যুৎ। বর্তমান সরকার বিদ্যুৎ ঘাটতি দূর করে উৎপাদন ক্ষমতা ১৫ হাজার ৭৫৫ মেগাওয়াটে উন্নীত করেছে। যোগাযোগ খাতের উন্নয়ন বিনিয়োগের নতুন দ্বার উন্মোচিত করেছে। নির্মাণাধীন পদ্মা সেতুর কাজ দ্রুত এগিয়ে চলেছে। মহাসড়কগুলো চার লেনে উন্নীত হয়েছে। বাংলাদেশের সার্বিক যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির ফলে দেশের অভ্যন্তরে এবং আমদানি-রফতানির ক্ষেত্রে পণ্য পরিবহনের ব্যবস্থা সহজ হয়েছে। চট্টগ্রাম ও মংলা সমুদ্রবন্দর অত্যাধুনিক সমুদ্রবন্দর হিসেবে গড়ে উঠেছে।

## অর্জন

- দেশের ৮টি রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলে ৪৬৪টি চালু শিল্প প্রতিষ্ঠানে এ পর্যন্ত ৪.৩৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ হয়েছে।
- ২০০১-০৮ সময়ে ইপিজেডগুলোতে বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল ৯৫৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। ২০০৯-১৬ পর্যন্ত এই বিনিয়োগের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ২ হাজার ৬৬৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। প্রবৃদ্ধির পরিমাণ ১৭৯%।
- দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ প্রচার ও প্রসার এবং নতুন উদোক্তা সৃষ্টির লক্ষ্যে বিনিয়োগ বোর্ড ও প্রাইভেটাইজেশন কমিশন একীভূত করে বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা) গঠন করা হয়েছে।
- পশ্চাদপদ ও অনুন্নত অঞ্চলসহ দেশের সম্ভাবনাময় এলাকাগুলোতে অর্থনৈতিক অঞ্চল সৃষ্টির লক্ষ্যে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেজা) গঠন করা হয়েছে।
- সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক, আইটি পার্ক, আইটি ভিলেজ, আইটি হাব ও আইটি খাতে রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট সেন্টার স্থাপনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ হাইটেক পার্ক কর্তৃপক্ষ গঠন করা হয়েছে।
- বিনিয়োগ ও ব্যবসা-বাণিজ্য সহজতর করতে গ্যাস-বিদ্যুৎ, পানি, টেলিফোন, প্লট বরাদ্দ, ওয়ার্ক পারমিট, রেসিডেন্ট ও নন-রেসিডেন্ট ভিসাসহ ১৬ ধরনের সেবা এক ছাতার নিচে দেয়ার জন্য ওয়ান স্টপ সার্ভিস অ্যাক্ট ২০১৭ মন্ত্রিসভায় অনুমোদিত হয়েছে।

  ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা অধিকতর প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে রূপকল্প-২০২১'-এর আওতায় বৈদেশিক বিনিয়োগের লক্ষ্যমাত্রা ৫.৪ বিলিয়ন ডলার নির্ধারণ করা হয়েছে।
- ২০৩০ সালের মধ্যে সারাদেশে ১০০টি অর্থনৈতিক অঞ্চল সৃষ্টি করা হবে।

ছবি ও তথ্য : চলচিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর

## দেশে ডিসেম্বরের মধ্যেই আরো ১০টি অর্থনৈতিক অঞ্চল তৈরির কাজ শেষ হবে : বেজা

আগামী ডিসেম্বরের মধ্যেই দেশে আরো ১০টি অর্থনৈতিক অঞ্চল তৈরির কাজ শেষ হবে বলে ঘোষণা দিয়েছে বাংলাদেশ ইকোনমিক জোনস অথরিটি (বেজা)। এর ফলে দেশে মোট অর্থনৈতিক অঞ্চল বেড়ে হবে ১৫টি।

বিইজেডের নির্বাহী চেয়ারম্যান পবন চৌধুরী বলেন, পরিকল্পিত ১০০টি অর্থনৈতিক অঞ্চলের মধ্যে ২৩টির জমি অধিগ্রহণ, ডেভেলপার নিয়োগ ও কাঠামোগত উন্নয়নসহ অন্যান্য উন্নয়ন কাজ দ্রুত গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে।

তিনি বলেন, ২৩টির মধ্যে ১০টি অর্থনৈতিক অঞ্চলের কাজ এ বছর ডিসেম্বরের মধ্যে শেষ হবে। এগুলো হলো- মেঘনা ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইকোনমিক জোন, মিরসরাই ইকোনমিক জোন, নাফ ট্যুরিজম স্পেশাল ইকোনমিক জোন, সাবরাং ইকোনমিক জোন, মৌলভীবাজার ইকোনমিক জোন, জামালপুর ইকোনমিক জোন, সিরাজগঞ্জ ইকোনমিক জোন, সোনারগাঁও ইকোনমিক জোন, ইস্ট-ওয়েস্ট স্পেশাল ইকোনমিক জোন এবং আকিজ ইকোনমিক জোন।

বিইজেডএ প্রধান বলেন, অর্থনৈতিক অঞ্চলগুলোর মধ্যে মংলা ইকোনমিক জোন, আব্দুল মোনেম ইকোনমিক জোন, বে ইকোনমিক জোন, আমান ইকোনমিক জোন এবং মেঘনা ইকোনমিক জোনের কাজ শেষ হয়েছে। এরই মধ্যে বেশ কিছু দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকারী এই অঞ্চলগুলোতে বিনিয়োগে আগ্রহ প্রকাশ করেছে।

তিনি বলেন, চীন এবং জাপানসহ বেশ কিছু বিদেশি বিনিয়োগকারী এবং দেশের অভ্যন্তরীণ বিনিয়োগকারীরা এই খাতে বিনিয়োগ করতে আগ্রহ প্রকাশ করেছে।

পবন চৌধুরী আরো বলেন, এই অঞ্চলে ঝামেলামুক্ত বিনিয়োগ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকার আইনি জটিলতা নিরসনের জন্য এরই মধ্যে প্রয়োজনীয় আইন ও নীতিমালা প্রণয়ন করেছে। একই সঙ্গে বিনিয়োগের যথাযথ পরিবেশ নিশ্চিত করতে ওয়ান স্টপ সার্ভিসের মাধ্যমে গ্যাস, পানি ও বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করার ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।

বিনিয়োগকে আকৃষ্ট করতে সরকার এই অঞ্চলে বিদ্যুতের ওপর ভ্যাট অপসারণ, আয়কর হ্রাস, অন্যান্য প্রণোদনাসহ স্থানীয় কেনাকাটা শুল্কমুক্ত ঘোষণা করেছে।

তিনি বলেন, এই অর্থনৈতিক অঞ্চলের ডেভেলপার এবং বিনিয়োগকারী উভয়ই এই প্রণোদনা ভোগ করতে পারবে।

বিইজেডের নির্বাহী চেয়ারম্যান বলেন, আগামী ১৫ বছরের মধ্যে দেশের ৩০ হাজার হেক্টর জমিতে ১০০টি অর্থনৈতিক অঞ্চল তৈরির পরিকল্পনা সরকারের রয়েছে। এই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে এখানে ১ কোটি মানুষের কর্মসংস্থান হবে।

'বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল অ্যাক্ট ২০১০'-এর মাধ্যমে ২০১০ সাল থেকে প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ের অধীনে বিইজেডএ পরিচালিত হচ্ছে। দেশের সম্ভাবনাময় অঞ্চলগুলোতে অর্থনৈতিক কার্যক্রম আরো গতিশীল করতে এই উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।

আঞ্চলিক যোগাযোগ, বন্দরগুলোর সঙ্গে যাতায়াতের সুবিধা এবং পর্যাপ্ত শ্রমিক ও পণ্য পরিবহনসহ অপরাপর সুবিধার কথা মাথায় রেখে এই অর্থনৈতিক অঞ্চলের স্থান বাছাই করা হয়েছে। বিইজেডএ এই অঞ্চলগুলো পর্যবেক্ষণের দায়িত্ব পালন করছে। পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপের (পিপিপি) আওতায় এই প্রতিষ্ঠানটি এসব অঞ্চলে ডেভেলপার নিয়োগ দিচ্ছে। একই সঙ্গে এই অর্থনৈতিক অঞ্চলগুলোতে সরকারের কাছ থেকে লাইসেন্স গ্রহণের মাধ্যমে ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানও কাজ করছে।

পবন চৌধুরী সরকারের ভিশন ২০২১ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য (এসডিজি) অর্জনে এই অর্থনৈতিক অঞ্চলগুলো বড় ভূমিকা রাখবে বলে আশা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, বিনিয়োগ, উৎপাদন ও রফতানি বৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টির ক্ষেত্রে এসব অর্থনৈতিক অঞ্চল বড় ভূমিকা রাখবে।

প্রতিবেদন : এ কে এম কামালউদ্দিন চৌধুরী, অনুবাদ : মলয় কুমার দত্ত

## বিদেশি বিনিয়োগ বাড়াতে চালু হচ্ছে 'ওয়ান স্টপ সার্ভিস'

ভার্চুয়াল 'ওয়ান স্টপ সার্ভিস সেন্টার' চালুর পর দেশে বিদেশি বিনিয়োগ অনেক বাড়বে বলে আশা করছে বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা)।

এই সার্ভিসটি চালু হলে 'এক ছাতার' নিচে বিদেশি কোম্পানিগুলো স্বল্পতম সময়ের মধ্যে সব ধরনের আইনি সহায়তা ও সুযোগ-সুবিধা পাবে বলেও জানিয়েছে বিডা।

বিডার নির্বাহী চেয়ারম্যান কাজী মো. আমিনুল ইসলাম বাসসকে বলেন, আশা করছি, আগামী ছয় মাসের মধ্যে নতুন ওয়েবভিত্তিক সিস্টেমের অধীনে 'ওয়ান স্টপ সার্ভিস সেন্টার' চালুর পর বাংলাদেশে উল্লেখযোগ্য হারে বিদেশি বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাবে"। এ সময় একটি মাঝারি ধরনের শিল্প প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানি আবেদন করার ছয় থেকে নয় মাসের মধ্যে কার্যক্রম শুরু করতে পারবে বলেও জানান তিনি।

বিডা প্রধান আরো জানান, 'ওয়ান স্টপ সার্ভিসে'র পরীক্ষামূলক কার্যক্রম শুরু হয়েছে। এর ফলে বর্তমানে দেশি বা বিদেশি যে কোনো বিনিয়োগকারীর জন্য ব্যবসা শুরু করতে ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা পেতে একটিমাত্র আবেদন করলেই চলবে।

আমিনুল ইসলাম বলেন, বর্তমানে 'ওয়ান স্টপ সার্ভিসে'র অধীনে একটি কোম্পানিকে বিদ্যুৎ পেতে ২৮ দিন সময় লাগে এবং নির্মাণ কাজের অনুমতি পেতে সময় লাগে মাত্র ৬০ দিন। যেখানে আগে এই দুটি সার্ভিস পেতে সময় লাগত যথাক্রমে ৪০০ ও ২৬৯ দিন।

তিনি আরো বলেন, বাংলাদেশে এমন নজিরও আছে যে, বিদ্যুৎ পেতে কোম্পানিগুলোকে দুই বছরেরও বেশি সময় অপেক্ষা করতে হতো এবং ব্যবসা শুরু করতে আবেদনের পর থেকে তাদের চার থেকে পাঁচ বছর পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হতো।

বিডা প্রধান বলেন, যে কোনো বিনিয়োগকারীর জন্য দ্রুত গতিতে সব ধরনের অনুমোদন ও সেবা পাওয়া একটি জটিল প্রক্রিয়া। কিন্তু যেহেতু আমরা 'এক ছাতা'র নিচে কোনো রকম ভোগান্তি ছাড়াই আগ্রহী বিনিয়োগকারীদের দ্রুত গতিতে সেবা দিতে প্রস্তুত সেহেতু আমাদের সব ব্যবসায়িক পরিবেশ শিগগিরই অনেক উন্নত হবে"।

‘ওয়ান স্টপ সার্ভিস’ একটিমাত্র ওয়েবভিত্তক ভার্চুয়াল সার্ভিস হবে বলে উল্লেখ করে আমিনুল ইসলাম বলেন, “আগে বিনিয়োগকারীদের স্বশরীরে আবেদন করে সব ধরনের অনুমোদন ও সেবা পেতে, সেবা প্রদানকারীদের দুয়ারে দুয়ারে ঘুরতে হতো। কিন্তু এখন বিনিয়োগকারীরা অনলাইনে একটি ‘একক ওয়েবভিত্তিক অ্যাপ্লিকেশনে’র মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন এবং অনলাইনেই আবেদনের অগ্রগতি সম্পর্কে জানতে পারবেন”।

তিনি আরো বলেন, ‘ওয়ান স্টপ সার্ভিস সেন্টার’টি আগামী ছয় মাসের মধ্যে বিশ্বব্যাংক ও ইন্টারন্যাশনাল ফিন্যান্স করপোরেশনের (আইএফসি) আর্থিক সহায়তায় রাজধানীর আগারগাঁও-এ অবস্থিত বিডা’র নতুন কার্যালয় স্থাপন করা হবে।

‘ওয়ান স্টপ সার্ভিস’ বাস্তবায়নে ‘ওয়ান স্টপ সার্ভিস অ্যাক্ট’ নামে একটি নতুন আইনের খসড়া তৈরি করা হয়েছে জানিয়ে আমিনুল ইসলাম বলেন, “আইনটি মন্ত্রিসভার অনুমোদন পেয়েছে এবং বর্তমানে জাতীয় সংসদে পাসের অপেক্ষায় আছে। আমরা আশা করছি চলতি বাজেট অধিবেশনেই আইনটি সংসদে পাস হবে”। খসড়া আইনে সংশ্লিষ্ট অফিসকে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বিনিয়োগকারীদের ছাড়পত্র দেয়ার জন্য সময় বেঁধে দেয়া হয়েছে উল্লেখ করে তিনি আরো বলেন, “প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করেই আইনের সব রীতি-নীতি তৈরি করা হয়েছে। জাতীয় সংসদে আইনটি পাস হওয়ার পর পরই আমরা ‘ওয়ান স্টপ সার্ভিস সেন্টার’টি চালু করতে পারব”।

বিদেশি বিনিয়োগে আকৃষ্ট করতে ২০১৫ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষের (বেজা) বোর্ড সভায় একটি আইন প্রণয়নের প্রথম পদক্ষেপ নেয়া হয়। ২০১৬ সালের ২৭ জুলাই বেজার ৪র্থ বোর্ড সভায় আইন প্রণয়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এর আগে পর্যন্ত সরকারি অফিস থেকে ছাড়পত্র পাওয়ার ক্ষেত্রে নানা জটিলতার কারণে দেশে কোনো বিদেশি বিনিয়োগকারী ছিল না বলে জানিয়েছে একটি সূত্র।

সূত্র মতে, বেসরকারিকরণ কমিশন ও বিনিয়োগ বোর্ডকে একত্রিত করে গত বছরের সেপ্টেম্বর মাসে বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা) প্রতিষ্ঠা করা হয়।

প্রতিবেদন : তানজিম আনোয়ার, অনুবাদ : সৈয়দ এলতেফাত হোসেইন

## উত্তরা ইপিজেডে বিনিয়োগ বৃদ্ধিতে জোরদার হচ্ছে গ্রামীণ অর্থনীতি

উত্তরা রফতানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলে (ইপিজেড) স্থানীয় ও বিদেশী উদ্যোক্তাদের ব্যাপক বিনিয়োগের ফলে বিপুলসংখ্যক কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে। এতে গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নয়ন এবং দারিদ্র্য বিমোচনের মাধ্যমে স্থানীয় জনগণের জীবনমানের উন্নয়ন ঘটছে।

শিল্পায়নের মাধ্যমে স্থানীয় দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং মঙ্গা কবলিত এলাকার দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০০১ সালের জুলাই মাসে নীলফামারী সদর উপজেলার সংগোলশি ইউনিয়নে ২১২ একর জমি নিয়ে গঠিত উত্তরা ইপিজেডের উদ্বোধন করেন।

উত্তরা ইপিজেডের ডেপুটি ম্যানেজার (বাণিজ্যিক অপারেশন) খালেদ মাহমুদ বলেন, 'এখানে এই পর্যন্ত ১৪০টি প্লটে দেশি-বিদেশি ১৪টি প্রতিষ্ঠান কারখানা স্থাপন করেছে, যাতে মোট প্রায় ২৪ হাজার মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। কর্মরতদের ৬৫ শতাংশই গ্রামীণ নারী।'

এসব প্রতিষ্ঠানের মধ্যে আটটি স্থানীয় এবং ছয়টি বিদেশি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান। যার মধ্যে হংকংয়ের প্রতিষ্ঠান রয়েছে পাঁচটি এবং যুক্তরাজ্যের একটি। মোট ১৪টি কোম্পানি মিলে এখানে এই পর্যন্ত প্রায় ১৩৫ দশমিক ৬৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ করেছে। এখানে প্রতি বছর বিনিয়োগ বেড়েই চলেছে।

বিদেশি কোম্পানিগুলো রফতানিমুখী পরচুলা, কফিন, চামড়ার ব্যাগ, বেল্ট, ওয়ালেট, মানি ব্যাগ, সোয়েটার এবং আন্তর্জাতিক মানের অন্যান্য পণ্য উৎপাদন করে। স্থানীয় কোম্পানিগুলো তৈরি পোশাক এবং বিদেশি কোম্পানির ব্যবহারের জন্য বিভিন্ন এক্সেসরিজ তৈরি করে।

মাহমুদ বলেন, বরাদ্দের জন্য তৈরি আরো ৪৭টি প্লটে কারখানা স্থাপন করা হলে ৫০০ জন বিদেশিসহ এই কর্মসংস্থানের সংখ্যা ৫০ হাজারে দাঁড়াবে।

নীলফামারী চেম্বারের প্রাক্তন সভাপতি এস এম শফিকুল আলম জানান, কৃষি-অর্থনীতিভিত্তিক নীলফামারী জেলায় অতীতে আশ্বিন-কার্তিক মাসের মঙ্গার সময় হাজার হাজার লোক কাজের অভাবে দুঃসহ কষ্টের মধ্যে জীবনযাপন করত।

শফিকুল বলেন, উত্তরা ইপিজেডের শুরুতেই কর্মহীন গরিবদের রফতানিমুখী কলকারখানায় কাজের সুযোগ দিয়ে এটি তাদের জন্য আশীর্বাদ হয়ে দেখা দেয়। এতে মানুষ ভাগ্য পরিবর্তন করে জেলার মৌসুমি মঙ্গাকে স্থায়ীভাবে বিদায় জানিয়ে সুস্থ সুন্দর জীবন-যাপন করছে।

নীলফামারী সদর উপজেলার বাংমারী গ্রামের ২২ বছর বয়সী পারভিন আক্তার ও তার স্বামী আনোয়ারুল ইসলাম জানান, উত্তরা ইপিজেডের পরচুলা উৎপাদনকারী এভারগ্রিন কারখানায় চাকরি পাওয়ার আগে তারা দুঃস্থ অবস্থায় জীবন কাটাত।

পারভিন দৃঢ় আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলেন, বর্তমানে আমরা প্রতি মাসে ১৮ হাজার টাকা উপার্জন করি। এরই মধ্যে আমাদের আয়ের টাকায় একটি ঘর নির্মাণ ও যাতায়াতের জন্য একাট মোটর সাইকেল কেনার পরও আমরা সচ্ছল জীবন যাপন করছি।

উত্তরা ইপিজেডে চাকরি পাওয়ার আগে দারিদ্র্যের কারণে জীবনে চরম দুর্দশার কথা বর্ণনা করে হরিবল্লভ গ্রামের ২২ বছরের লক্ষ্মী রানী রায় এবং তার বোন সরস্বতী রানী রায় বলেন, দারিদ্র্যের কারণে তারা অষ্টম শ্রেণীর পর আর পড়াশোনা করতে পারেননি।

উভয়েই দরিদ্র দিন-মজুর বাবুল চন্দ্র রায়ের কন্যা, পাঁচ সদস্যের এই পরিবারে তাদের ঠিকমত খাবারও জুটতো না।

কয়েক বছর আগে লক্ষ্মী উত্তরা ইপিজেডের এভারগ্রিন কোম্পানিতে চাকরি পান এবং সরস্বতী চাকরি পান মাজেন বিডি লিমিটেডে। তারা এখন এক মাসে ২০ হাজার টাকার বেশি আয় করছেন।

লক্ষ্মী বলেন, আমরা এখন জমি কিনে একটি ঘর নির্মাণ করেছি, আসবাবপত্রসহ আমাদের ঘর সাজানোর পর এখন আমরা সচ্ছল দিন কাটাচ্ছি। আগে আমাদের বাবার আয় খুব সামান্য ছিল। মাঝে মাঝে আমাদের চাল কেনার পয়সাও থাকত না।'

বাবুল বায় বলেন, 'আমার কন্যা লক্ষ্মী এবং সরস্বতীকে নিয়ে আমি গর্বিত, যারা আমার পরিবার থেকে দারিদ্র্য দূর করে আমাদের আত্মনির্ভরশীল করে তুলেছে। উত্তরা ইপিজেড প্রতিষ্ঠার জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ধন্যবাদ'।

উত্তরা ইপিজেডের উজ্জ্বল সম্ভাবনা সম্পর্কে এর জেনারেল ম্যানেজার আব্দুস সোবহান বলেন, ২০০৬-এর এপ্রিল মাস থেকে এই পর্যন্ত প্রতি মাসে এখানকার রফতানি বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং বর্তমানে কোম্পানিগুলো মোট প্রায় ৫৪০ দশমিক ৭৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার রফতানি আয় করছে।

তিনি বলেন, উত্তরা ইপিজেডের বিশ্বমানের পণ্য যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপীয় ইউনিয়নের দেশগুলো, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, ব্রাজিল, কলম্বিয়া ও অন্যান্য অনেক দেশে রফতানি হচ্ছে।

রংপুর চেম্বারের সভাপতি আবুল কাশেম বলেন, উত্তরা ইপিজেডে বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ, সস্তা শ্রমিক প্রাপ্যতা এবং শান্তিপূর্ণ আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির কারণে স্থানীয় ও বিদেশি বিনিয়োগের ক্রমাগত বৃদ্ধি অব্যাহত রয়েছে।

তিনি বলেন, উত্তরা ইপিজেড থেকে ১৬ কিলোমিটার দূরে সৈয়দপুর বিমানবন্দরকে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে উন্নীত করা হয়েছে। এর ফলে উদ্যোক্তারা সরাসরি এখানে আসতে এবং সমুদ্র বন্দরের জাহাজের পরিবর্তে এয়ার কার্গোর মাধ্যমে রফতানি করতে পারে।

অন্যান্য অঞ্চলের মতো প্রাকৃতিক গ্যাস সরবরাহ না থাকায় উত্তরা ইপিজেডে ভর্তুকিসহ হ্রাসকৃত হারে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করে উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানগুলোকে প্রতিযোগিতামূলক বাজারে টিকে থাকায় সহায়তা করার জন্য কাশেম পরামর্শ দেন।

প্রতিবেদন : মামুন ইসলাম, অনুবাদ : রুহুল গণি জ্যোতি

## সহজ শর্তে ঋণ পাওয়ায় বাড়ছে নারী উদ্যোক্তা

আনজুম আরা মেরিন ১৯৯৫ সালে মাত্র ৩০ হাজার টাকা পুঁজি নিয়ে ঘরে বসে পুতুল বানানোর ব্যবসা শুরু করেছিলেন। এর বেশি বিনিয়োগের সামর্থ্য তার ছিল না। সে সময় ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোতেও নারী উদ্যোক্তাদের জন্য কোনো ঋণের ব্যবস্থা ছিল না। প্রাতিষ্ঠানিক অর্থায়ন ব্যবস্থায় নারীদের অধিকতর প্রবেশাধিকার নিশ্চিতকরণে সরকারের যুগান্তকারী সিদ্ধান্তের ফলে আনজুম আরার দিন বদলেছে। তার প্রবল মনোবল আর আর্থিক সহায়তায় তিনি এখন সাধারণ গৃহিনী থেকে হয়ে উঠেছেন সফল নারী উদ্যোক্তা। তার মাসিক আয় এখন গড়ে ১৫ হাজার টাকা। সফল নারী উদ্যোক্তা হিসেবে তিনি এখন ব্রাহ্মণবাড়িয়ার অন্য নারীদের জন্যও দৃষ্টান্ত হয়ে উঠেছেন। বড় হয়েছেন ব্রাহ্মণবাড়িয়ায়। স্কুলে পড়ার সময়ই বিয়ে হওয়ার কিছুদিনের মধ্যেই তার স্বামী মারা যান। তাই খুব অল্প বয়সে জীবনের কঠিন অধ্যায়ের সম্মুখীন হতে হয় তাকে। নিজের একমাত্র কন্যাকে নিয়ে শুরু করেন জীবন সংগ্রাম। তার সফল উদ্যোক্তা হয়ে ওঠার পথটা তাই অন্যদের চেয়ে একটু বেশিই কঠিন।

আরিফা সুলতানা আর একজন সফল নারী উদ্যোক্তা। নারী উদ্যোক্তাদের চেনা গণ্ডি পেরিয়ে গাড়ি মেরামতের কারখানা চালান। স্বামী চাকরি নিয়ে দেশের বাইরে গেলে তার স্বামীর গাড়ি মেরামতের ব্যবসাটারই হাল ধরেন তিনি। ব্যাংক থেকে ৪-৫ বছর আগে ঋণ নিয়ে ব্যবসাকে প্রসারিত করেন।

আরিফা সুলতানা বলেন, ইচ্ছা আর যথাযথ সহযোগিতা থাকলে একজন নারী উদ্যোক্তাও ব্যতিক্রমী পেশায় সফল হতে পারেন।

আনজুম ও আরিফার মতো সারাদেশে গ্রাম, শহর এবং নগরীর হাজার হাজার নারী এখন নিজেদের উদ্যোক্তা হিসেবে তৈরি করছেন। তারা সরকারের এই যুগান্তকারী পদক্ষেপের জন্য কৃতজ্ঞ।

সরকারের এ নীতিমালার অধীনে বাংলাদেশ ব্যাংক নারী উদ্যোক্তাদের জন্য ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে সহজে ও স্বল্প সুদে ঋণ পাওয়ার সুবিধা দিয়েছে। ২০১৪ সালে কেন্দ্রীয় ব্যাংক পরিচালিত এক জরিপ প্রতিবেদন অনুযায়ী, ব্যাংকগুলো নারী উদ্যোক্তাদের আর্থিক সহায়তা দেয়ার সিদ্ধান্ত

গ্রহণ করার ফলে ২০১০ সালের পর ক্ষুদ্র নারী উদ্যোক্তার সংখ্যা ব্যাপক হারে বেড়েছে।

জরিপ প্রতিবেদনে দেখা যায়, তিন বছরে নারী উদ্যোক্তা ১৮২ দশমিক ৪৩ শতাংশ বেড়েছে। ২০১০ সালে যেখানে নারী উদ্যোক্তা ছিল ১৩ হাজার ২৭৮ জন সেখানে ২০১৩ সালে এসে দাঁড়ায় ৩৭ হাজার ৫০২ জন। একই সময়ে ঋণ দেয়ার পরিমাণ বেড়েছে ৮৩ দশমিক ৪৯ শতাংশ এবং ২০১৩ সালে এসে ঋণ দেয়ার পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৩ হাজার ২১৫ দশমিক ৬০ কোটি টাকা। ২০১০ সালে এর পরিমাণ ছিল ১ হাজার ৭৫২ দশমিক ৪৬ কোটি টাকা।

নারী উদ্যোক্তাদের বর্তমান মোট সংখ্যার কোনো হালনাগাদ তথ্য না থাকলেও বাংলাদেশ ব্যাংকের একটি প্রতিবেদনে দেখা যায়, গত বছর নির্ধারিত ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো ১ লাখ ৪৬ হাজার নতুন নারী উদ্যোক্তাকে ২ হাজার ৯৮১ কোটি টাকা ঋণ দিয়েছে।

এই জরিপে বলা হয়, বাংলাদেশ ব্যাংক এবং অন্যান্য ব্যাংকের গৃহিত নীতিমালার কারণেই নারী উদ্যোক্তাদের ঋণ নেয়ার সংখ্যা বেড়েছে।

এই জরিপে উল্লেখ করা হয়, ৫৪ দশমিক ১ শতাংশ নারী স্বইচ্ছায় অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হওয়ার জন্য ব্যবসা শুরু করেন। বেশিরভাগ নারী উদ্যোক্তা ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের জন্য ঋণ নেন। অন্য নারী উদ্যোক্তারা কৃষি, বাটিক, তৈরি পোশাক, হস্তজাত সামগ্রী প্রস্তুতকরণ, কাপড় ও কাগজের ব্যাগ তৈরি এবং আসবাব তৈরি কারখানার জন্য ঋণ নেন।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের এসএমই অ্যান্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস বিভাগের মহাব্যবস্থাপক স্বপন কুমার রায় বলেন, বাংলাদেশ ব্যাংকের পুনঃঅর্থায়ন তহবিলের আওতায় নারী উদ্যোক্তারা সহজ শর্তে এবং স্বল্প সুদে ঋণ পাওয়ায় এসএমই খাতে নতুন নারী উদ্যোক্তার সংখ্যা বাড়ছে।

তিনি বলেন, প্রান্তিক পর্যায়ের কোনো নারী ঋণ পাওয়ার ক্ষেত্রে যাতে কোনো ধরনের সমস্যার সম্মুখীন না হন সেজন্যও কঠোর মনিটরিংয়ে ব্যবস্থা আছে।

বাংলাদেশ উইমেন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির সভাপতি সেলিমা আহমেদ বলেন, কার্যকর নীতিমালা এবং উপযুক্ত পরিবেশের কারণে

বিভিন্ন ব্যতিক্রম ও চ্যালেঞ্জিং পেশায় নারীরা এগিয়ে আসছে এবং সফল হচ্ছে। শহুরে নারীদের পাশাপাশি গ্রামীণ নারীরাও যাতে উদ্যোক্তা হিসেবে নিজেদের তৈরি করতে পারে সেদিকে খেয়াল রাখার জন্য তিনি সংশ্লিষ্টদের প্রতি আহ্বান জানান।

নিটোল নিলয় গ্রুপের ভাইস-চেয়ারপারসন সেলিমা রহমান বলেন, 'নারীদের ক্ষমতায়িত না করতে পারলে বাংলাদেশ উচ্চ আয়ের দেশে পরিণত হতে পারবে না।'

বিশ্বব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, বর্তমানে ৩৪ শতাংশ নারী শ্রমিক দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে অবদান রাখছে। আগামী পাঁচ বছরে নারী শ্রমিকের সংখ্যা ১০ শতাংশ বাড়াতে পারলে দেশের প্রবৃদ্ধিও ১ শতাংশ বাড়বে।

প্রতিবেদক : মরিয়ম সেঁজুতি

## পর্যটন শিল্পের বিকাশে ডিজিটাল উদ্যোগ

পর্যটন শিল্পের বিকাশে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড (বিটিবি) ডিজিটাইজেশনের ওপর গুরুত্বারোপ করছে।

স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যটক বিশেষ করে তরুণ পর্যটক আকর্ষণের জন্য বিটিবি বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমকে ব্যবহার করছে। এরই অংশ হিসেবে বাংলাদেশের জাতীয় পর্যটন সংস্থা বিটিবি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের ফেসবুক, টুইটার ও উইচ্যাটে নিজস্ব ওয়েব পেইজ পরিচালনা করছে।

বিটিবির আইটি ইনচার্জ শাহজাহান কবির বাসসকে বলেন, আমরা পর্যটকদের কাছ থেকে ভালো সাড়া পাচ্ছি। বর্তমানে পর্যটনের ফেসবুক পেইজে ৫০ হাজার ফলোয়ার আছে।

তিনি বলেন, দেশের এবং দেশের বাইরের আগ্রহী পর্যটকরা প্রতিদিন আমাদের পর্যটন কেন্দ্রগুলো সম্পর্কে নানা তথ্য জানতে চান। পর্যটকদের চাহিদা অনুযায়ী আমরা পর্যটন সংক্রান্ত তথ্য ফেসবুকে ও অন্যান্য যোগাযোগ মাধ্যমের সাইটগুলোতে দিয়ে থাকি।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমকে যে কোনো পণ্যের বাজারজাতকরণের একটি শক্তিশালী মাধ্যম হিসেবে উল্লেখ করে বিটিবি কর্মকর্তা বলেন, আমরা এই মাধ্যমে আমাদের গুরুত্বপূর্ণ পর্যটন কেন্দ্রগুলোতে পর্যটক আকর্ষণের উদ্যোগ নিয়েছি।

তিনি বলেন, বিটিবি ফেসবুক এবং অন্যান্য সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে বাংলাদেশ পর্যটনের বিজ্ঞাপন প্রচারের পরিকল্পনা নিয়েছে। আগামী অর্থবছরের জন্য ফেসবুক, টুইটার ও ইউটিউবে বিজ্ঞাপন প্রচারের জন্য বিটিবি কর্তৃপক্ষ ইতিমধ্যেই বাজেট বরাদ্দের আবেদন জানিয়েছে।

দেশের আকর্ষণীয় পর্যটন কেন্দ্রগুলোর ভিডিও দেখানোর জন্য বিটিবি একটি নিজস্ব ইউটিউব চ্যানেল চালু করেছে। শাহজাহান কবির বলেন, “বর্তমানে ইউটিউব চ্যানেল সবার কাছে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে পশ্চিমা তরুণ সমাজ টেলিভিশনের চেয়ে ইউটিউবই বেশি দেখে।”

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের পাশাপাশি বিটিবি ‘বিউটিফুল বাংলাদেশ’ নামে একটি মোবাইল অ্যাপও তৈরি করেছে। এই অ্যাপের মাধ্যমে ভিসা প্রক্রিয়া, থাকা, খাওয়ার জায়গা, পরিবহন ব্যবস্থা, আকর্ষণীয় পর্যটন কেন্দ্র, ইভেন্ট ক্যালেন্ডার, বিনোদন, কেনাকাটা ও ট্যুর ক্যালকুলেটর সম্পর্কিত তথ্য পাওয়া যাবে।

তিনি বলেন, এই অ্যাপের মাধ্যমে বাংলাদেশে পর্যটনে আগ্রহী যে কোন পর্যটক পর্যটন সংক্রান্ত সব তথ্য পাবেন। এই অ্যাপ প্রমোট করার জন্য আমরা বিশ্বের বিভিন্ন আন্তর্জাতিক পর্যটন মেলায় প্রদর্শনের জন্য কাজ করছি।

বিটিবি পর্যটনের ওয়েবসাইটকেও নতুনভাবে সাজিয়েছে। এই নতুন ওয়েবসাইট এখন আরো অনেক বেশি পর্যটক-বান্ধব ও তথ্যবহুল। এতে আকর্ষণীয় পর্যটন কেন্দ্রগুলোর দৃষ্টিনন্দন ছবিও আপলোড করা হয়েছে। পর্যটকদের সুবিধার্থে এই ওয়েবসাইটে বাংলাদেশ ট্যুর অপারেটরস, ট্রাভেল এজেন্টস, হোটেল, মোটেল এবং রেস্টুরেন্টের লিংক দেয়া আছে।

বাংলাদেশ সরকারের ডিজিটাল উদ্যোগের অংশ হিসেবেই বাংলাদেশ পর্যটন বোর্ড পর্যটনকে ডিজিটালাইজড করার উদ্যোগ নিয়েছে।

ট্যুর অপারেটর অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (টিওএবি) প্রেসিডেন্ট তৌফিক উদ্দিন আহমেদ বলেন, বর্তমান বিশ্বের পর্যটন শিল্প অনলাইন মার্কেটিংয়ের ওপর নির্ভরশীল। ওয়েবসাইটে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতেই বিদেশি পর্যটকরা পর্যটনস্থল নির্বাচন করে থাকেন।

তিনি বলেন, বর্তমান ইন্টারনেটভিত্তিক বিশ্বে অনলাইন মার্কেটিং আবশ্যক। ভার্চুয়াল জগতের সাহায্য নেয়া ছাড়া অন্য কোনো বিকল্প নেই। এটি অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক যে, আমাদের সরকার পর্যটন শিল্পকে অনলাইনে প্রচারের ব্যবস্থা করেছে।

প্রতিবেদন : তানজিম আনোয়ার, অনুবাদ : মাহফুজা জেসমিন

## 10 more EZs to be ready for investment by December: BEZA

Development of at least 10 more economic zones (EZs) would be completed by December 2017, increasing the number of the completed EZs to 15.

“Development of 23 EZs out of the planned 100 ones is progressing fast, with acquiring land, appointing developers and developing basic infrastructure”, Bangladesh Economic Zones Authority (BEZA) Executive Chairman Paban Chowdhury said.

He said among the 23 EZs, 10 would be completed by the end of this year. These are: Meghna Industrial Economic Zone, Mirsarai Economic Zone, Naf Tourism Special Economic Zone, Sabrang Economic Zone, Moulvibazar Economic Zone, Jamalpur Economic Zone, Sirajganj Economic Zone, Sonargaon Economic Zone, East-West Special Economic Zone and Akij Economic Zone.

BEZA chief said they had already developed five EZs in different areas of the country where some investors already made investment commitment. The completed EZs included Mongla Economic Zone, Abdul Monem Economic Zone, Bay Economic Zone, Aman Economic Zone and Meghna Economic Zone.

“Many investors, both local and foreign, including those from Japan and China, are showing keen interest in investing in the completed EZs”, Chowdhury said.

He said the government has already formulated necessary laws and regulations and provided necessary policy, financial and utility supports, including ensuring supply of gas, water and electricity under one stop service to offer entrepreneurs a hassle-free environment for investment.

For attracting investments in EZs, Chowdhury said, the government also declared multiple incentives and benefits, including exemption of income tax, customs duty, stamp duty and dividend tax and VAT on electricity and local purchase.

"All the developers of the EZs as well as the investors will get the incentives," he said.

Describing the activities of BEZA, he said, BEZA wants to establish 100 economic zones on 30000 hectares of land in the next 15 years, which will also create new jobs for around 1 crore people.

Through the Bangladesh Economic Zones Act 2010, BEZA was established under the Prime Minister's Office in November 2010 to establish economic zones in potential areas of the country for expediting inclusive growth.

The BEZA executive chairman said the government has chosen the location of economic zones based on regional connectivity, access to ports, and availability of enough workers and backward linkages.

BEZA is playing regulatory role to establish the EZs, he said, adding that the authority is appointing developers under the Public Private Partnership (PPP) modality to develop the EZs. Private sector is also establishing EZs by taking licence from the government.

Referring to the government's vision for 2021 and 2041 as well as achieving the targets of Sustainable Development Goals (SDGs) by 2030, the BEZA chief said the economic zones would contribute to the national economy in terms of increasing investment, production, export and creating new jobs.

Report: A K M Kamaluddin Chowdhury

## One-stop service centre to drive FDI inflow

Bangladesh is expecting higher inflow of Foreign Direct Investment (FDI) after launching a virtual one-stop service centre that will help foreign companies to get all legal permissions as well as connections of utilities in fastest possible time from a single window.

"We are expecting high inflow of the FDI after launching the one-stop centre as under the new web-based system, a medium sized industry or company can start its operation in Bangladesh in six to nine months from its application," Bangladesh Investment Development Authority (BIDA) Executive Chairman Kazi M Aminul Islam told BSS.

The BIDA chief said they have already started the one-stop-service as test basis. Now an investor whether local or foreign needs to fill up only one application to get permission to do business here as well as to get all kind of utility connections.

"Currently, a company is getting power connection in 28 days and the construction permit by 60 days under the one-stop-service, which was previously took 400 days and 269 days respectively," he said.

Aminul said there are such instances that some companies had to wait for more than two years to get electricity connection and wait for four to five years for starting their operation in Bangladesh after submitting application.

"Our total business climate would be improved a lot as we are set to offer potential investors all services from a single point at a faster pace," he said.

Noting that the one-stop service will be a web-based and virtual one, BIDA chairman said previously investors had to apply physically and go door to door of all service providers to get permissions and utility connections. Now they can

apply online through a single web-based application. They can also track progress of their application online.

The One-Stop Service Centre is setting up at the new BIDA office at Agargon in the capital city with the financial support from the World Bank and the International Finance Corporation (IFC).

"The centre will be set up within next six months," he said. Aminul said a new law named 'One-Stop Service Act' has been drafted to set up the single point service.

"The draft law has already got node from the cabinet division and now waiting for passing by the parliament. We are hoping that the new law will be passed during the ongoing budget session of the parliament," he said.

The draft law secures a time-frame to the offices concerned to give their clearance to the investors.

"All the modalities of the law have been framed with consultation of the Prime Minister. We will be able to operate the one-stop-service centre immediately after passing the law by the parliament", he said.

Bangladesh Economic Zones Authority (BEZA) at a board meeting on February 28, 2015 initiated the process of enacting a law to attract foreign investments. On July 27, 2016, the fourth BEZA board meeting decided to enact the law. BIDA was formed in September 2016 through the merger of the Privatisation Commission and Board of Investment (BoI).

Report: Tanjim Anwar

## Uttara EPZ starts improving rural economy

The increasing investments by local and foreign entrepreneurs at Uttara Export Processing Zone (EPZ) have created good employment opportunity, which will help improve rural economy and life standard of people in Rangpur district.

Inaugurated in July 2001 by the then Prime Minister Sheikh Hasina on 212 acres of land at Songolshi union under Sadar upazila of Nilphamari, the Uttara EPZ also helped ultra-poor people to come out of poverty.

"Fourteen companies have so far set up factories on 140 plots, creating employments for 24 thousand people, 65 per cent of them are rural women," said Deputy Manager (Commercial Operation) of Uttara EPZ Khaled Mahmud.

The 14 companies, including five from Hong Kong, one from the United Kingdom and eight locals, have invested 135.63 million US dollars at the EPZ.

The foreign companies are producing wig, coffin, spectacle, leather bag, belts, wallet, sweater and other products for global market while local ones are producing readymade garments, various goods and accessories for foreign companies.

"The number of employed people would become 50 thousand, including 500 foreigners, after setting up factories on 47 more plots now ready for allocation," Mahmud added.

According to former president of Nilphamari Chamber SM Shafikul Alam, thousands of people used to struggle for earning living due to lack of job during the lean 'monga' period of 'Aswin and Kartik' months in agri-economy based Nilphamari district.

“The Uttara EPZ, however, has now changed their life by creating jobs and other opportunities of income generation,” Shafikul added.

Like many other workers, Pervin Akhter, 22, and her husband Anwarul Islam, 26, of Bangmari village under Nilphamari Sadar upazila said they led miserable life before getting jobs at the wig-producing ‘Evergreen’ factory at Uttara EPZ.

“Currently, we together earn over Taka 18 thousand per month,” said Pervin adding that they have already built a house and purchase a motorcycle for easy movement. Narrating their sufferings due to abject poverty before getting job at Uttara EPZ, Laksmi Rani Roy, 22, and her sister Saraswati Rani Roy, 20, of Hariballov village, said they could not complete even high school education as their family was in hardship.

Both of them are daughters of a poor day-labourer Babul Chandra Roy, who could not properly provide his five family members with adequate foods as his income was low.

Few years back, Laxmi got a job at ‘Evergreen’ company while Saraswati got another job at ‘Majen BD Limited’ at Uttara EPZ. They are now earning over Taka 20 thousand together a month. “We are leading decent life now after purchasing land, building a house and buying furniture,” said Laxmi.

Noting the brighter prospect of Uttara EPZ, its General Manager Abdus Sobhan said the companies have so far earned 540.75 million US dollars through exporting products since 2006 to April this year.

“The high standard products of Uttara EPZ are being exported to the USA, European Union countries, Canada, Australia, South Africa, Brazil, Columbia and many other countries,” he said.

President of Rangpur Chamber Abul Kashem said local and foreign investments at Uttara EPZ would continue to increase following investment-friendly environment, availability of cheap labourers and peaceful law and order situation in the area.

“The investments would rise further if the Saidpur Airport, 16-kilometre off from Uttara EPZ, is upgraded to international one,” he said. Kashem also suggested ensuring uninterrupted power supply at subsidised rates to Uttara EPZ to assist entrepreneurs in manufacturing products at competitive rates like those in other regions having natural gas supply.

Report: Mamun Islam

## Easy loans help rapid rise of women entrepreneurs

Anjum Ara Merin was struggling to survive when she started her small and home-based doll making venture in 1995 with a tiny working capital of Taka 3000. She was unable to increase her capital as banks and other financial institutions were reluctant in lending to women entrepreneurs at that time.

The housewife, however, triumphed over the unfavourable situation with her strong determination that eventually was supported by the government breakthrough decision on promoting women entrepreneurships through financial inclusion.

With a regular monthly income of nearly Taka 15,000, Anjum is now a successful entrepreneur and an idol to many women in her area in Brahmanbaria district where she also grew up.

She got married to a man while studying at school, but unfortunately became a widow with a daughter only after few years of conjugal life. So, her journey toward a successful women entrepreneur was harder than many others.

Arifa Sultana is another woman who became a winning entrepreneur through hard work, willpower and obtaining loan from bank and ensuring the best use of the institutional financial support.

She also came out of the usual comfortable zones for doing business by women, with taking responsibility of a motor workshop, which her husband was running before going overseas for job.

"A woman can become a successful entrepreneur even in an area out of her comfort zone if she keeps her willpower up and utilise the assistance efficiently she gets from different sources", said Arifa.

Like Anjum and Arifa, thousands of women in many villages, towns and cities across the country have turned themselves triumphant entrepreneurs in the past few years, thanks to the government's policy of financial inclusion.

Under the policy, Bangladesh Bank (BB) declared a number of supportive measures so that women can easily avail financial assistance from banks and other financial institutions at a lower cost. The measures effectively helped women to be involved in financial activities.

According to a survey conducted by the central bank in 2014 on women entrepreneurship, the number of female entrepreneurs started surging from 2010 when the scheduled banks took specific policy to support women entrepreneurs with adequate financing.

The survey shows that the female entrepreneurs surged by 182.43 per cent in three years to reach 37,502 in 2013 from 13,278 in 2010. During the period, loan disbursement increased by 83.49 per cent and stood at Taka 3215.60 crore in 2013, which was Taka 1,752.46 crore in 2010.

There is no updated data about the total number of women entrepreneurs readily available from the central bank. A BB report, however, noted that last year alone scheduled banks and financial institutions disbursed Taka 2 thousand 981 crore to 1 lakh 46 thousand new women entrepreneurs.

"Bangladesh Bank's policies, as well as initiatives by the scheduled banks, jointly contributed to a substantial growth

in the number of women entrepreneurs for taking loans from the banking system," the BB survey said.

The BB in the survey also noted that 54.1 per cent of women started their business by self motivation as they wanted to become economically independent. Most of the women received loan for micro industries followed by the cottages and small industries. The other major areas of women's business operations include agriculture, boutique, garments, handicrafts, paper and fabric bag production and furniture production.

“Most of the women are involved in small and medium enterprises (SMEs) because they are getting low-cost and easy loans from banks and financial institutions under the BB’s revolving finance scheme,” said Sawpan Kumar Roy, the general manager of the central bank’s SME and Special Programmes Department.

He said the central bank is monitoring closely the lending programme so no woman entrepreneur face any problem in getting loans from banks and financial institutions.

Bangladesh Women Chamber of Commerce and Industry (BWCCI) President Selima Ahmed said due to effective policy and better environment, many women came out of their usual domestic duties and took successfully the challenges of becoming an entrepreneur.

She suggested taking more and targeted initiatives so more women, especially from rural areas could be involved in financial activities.

“Without empowering women, Bangladesh cannot achieve higher economic growth”, Selima, also the vice-chairperson of the Nitol-Niloy Group, said.

According to World Bank, currently 34.0 per cent women labour force is contributing to the country’s growth. If the participation of women in labour force can increase by 10.0 per cent in the next five years, it would drive the country’s GDP growth by 1.0 per cent.

Report: Moriom Sejuti, Translation: A Z M Sajjad Hossain Sabuj

## BTB exploring social media for promoting tourism

Taking the advantage of digitisation process, Bangladesh Tourism Board (BTB) is now using different platforms of social media to attract more domestic and international tourists especially the youths.

BTB, the national tourism organisation (NTO) of Bangladesh, is now operating its own pages on different social networking sites including facebook, twitter and wechat.

"We are getting good response from the travellers as presently about 50,000 people follow us through facebook," said BTB IT in-charge Shahjahan Kabir.

"In our facebook page we are getting various queries daily from both domestic and international tourists about different tourist attractions. We do provide all tourism-related information to intending tourists through facebook and other social media sites," he said.

The BTB official said currently social media has become a strong tool of marketing for any product. "Keeping this in mind, we are trying to promote our major tourist attractions through social media," Kabir said.

He said the BTB has also a plan to go for uploading advertisement of Bangladesh tourism in facebook and other social media commercially. The tourism board has already sought additional budgetary allocation for the next financial year for digital marketing through facebook, twitter and youtube.

BTB has also created its own youtube channel where anyone can enjoy visual footages featuring different exciting tourist

spots of Bangladesh. “Youtube channel has become very crucial now-a-days. Currently, especially young generation of the western world watch youtube more than television,” Shahjahan said.

Besides concentrating on social media, the BTB has also developed a mobile app called “Beautiful Bangladesh”. The app contains information about visa process, accommodation, restaurants, transportation, attraction, event calendar, entertainment, shopping and tour calculator.

“This app works as a single point tour solution for any tourist, intending to visit Bangladesh. Now we are working on promoting this app at different international tourism fair around the globe,” he said.

The BTB also redesigned its website. “Now our new website is more tourist friendly and informative with eye-catching photographs of our popular and unexplored tourist spots,” he said.

The BTB website provides links to Bangladesh tour operators, travel agents, hotels, motels and restaurants to help tourists in making their own plan for Bangladesh.

The BTB took all these digital steps to promote tourism as part of the ongoing digital innovation endeavour of the Bangladesh government.

President of Tour Operator Association of Bangladesh (TOAB) Taufiq Uddin Ahmed said the present global tourism industry is heavily dependent on online marketing. Foreign tourists mostly choose their destinations through surfing different tourism information providing websites, he said.

“In this current internet-based world, online marketing is a must. There is no other alternative rather taking help of virtual world. It is a positive sign that the government is trying to promote our tourism through online,” Taufiq said.

Report: Tanjim Anwar

বিশেষ উদ্যোগ ১০

# পরিবেশ সুরক্ষা

"শেখ হাসিনার নির্দেশ, জলবায়ু সহিষ্ণু বাংলাদেশ"

## পরিবেশ সুরক্ষা


সুপরিকল্পিত উদ্যোগে পরিচ্ছন্ন রাজশাহী মহানগরীর পরিবেশ ২৬৬

বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় নীতিমালা তৈরি করছে পরিবেশ অধিদপ্তর ২৬৯

দেশের ৬৪ শতাংশ ইটভাটা পরিবেশ বান্ধব প্রযুক্তিতে চলছে ২৭১

ঢাকার বর্জ্য পরিণত হবে সম্পদে ২৭৩

ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় বাড়ছে সবুজ বিনিয়োগ ২৭৬

Good initiatives make Rajshahi air cleaner 278

DoE drafts rules for better waste management 280

64pc brickfields get eco-friendly technology 282

Dhaka waste to be made assets 284

Green investment rising on banks' drive 287

প্রতিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ, জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবেলা, গবেষণা, উদ্ভিজ্জ জরিপ এবং বনজ সম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে টেকসই পরিবেশ ও বন নিশ্চিতকরণ এ উদ্যোগের লক্ষ্য। বিজ্ঞানভিত্তিক ও লাগসই প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে দেশের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ জনগোষ্ঠীর বসবাস উপযোগী পরিবেশ নিশ্চিতকল্পে মোট বনভূমির পরিমাণ সম্প্রসারণ, বন ও বনজ সম্পদের উন্নয়ন, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও শনাক্তকরণ, দারিদ্র্য বিমোচন, পরিবেশ দূষণ রোধ, জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলা এবং টেকসই পরিবেশ উন্নয়নই এ কর্মসূচির প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

## অর্জন

- ২০০৫-০৬ সালের শতকরা ৭-৮ ভাগ থেকে বনভূমির বিস্তার ডিসেম্বর ২০১৬ সালে শতকরা ১৭.৪৮ ভাগে উন্নীত হয়েছে।
- ২০০৯-১০ অর্থবছরে সরকারের নিজস্ব সম্পদ থেকে জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড (Climate Change Trust Fund ) গঠন করা হয়েছে এবং সরকার এই ট্রাস্টের তহবিলে ২ হাজার ৯০০ কোটি টাকা বরাদ্দ দিয়েছে।

- জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের আওতায় এ পর্যন্ত আইলা দুর্গত উপকূলীয় এলাকায় ঘূর্ণিঝড় প্রতিরোধী বাড়ি নির্মাণ, দেশব্যাপী ৫৩৫ কিলোমিটার খাল পুনঃখনন, ১২২ কিলোমিটার নদী বাঁধ সংরক্ষণ এবং ১৫.৪ কিলোমিটার উপকূলীয় বাঁধ নির্মাণসহ উপকূলীয় এবং বন্যাপ্রবণ এলাকায় ৭৪০টি গভীর নলকূপ খনন, ৫৫০টি বৃষ্টির পানি সংরক্ষণাগার স্থাপন, ৪ হাজার ৯৭১ হেক্টর জমি বনায়ন এবং অফ-গ্রিড এলাকায় ১২ হাজার ৮৭২টি সোলার হোম সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে।
- উন্নয়ন সহযোগী এবং দাতাদের সহায়তায় জলবায়ু পরিবর্তন রিজিলিয়েন্স ফান্ড গঠন করা হয়েছে।
- "ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০১৩" ১ জুলাই ২০১৪ থেকে কার্যকর করা হয়েছে। এ আইনের আওতায় এ পর্যন্ত শতকরা ৪৯.৮৪ ভাগ ইটভাটা পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তিতে রূপান্তর করা হয়েছে।

- বায়ু দূষণ রোধের জন্য বিশ্বব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় ৪৮৬.৫৬ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মল বায়ু ও টেকসই পরিবেশ (Clean Air & Sustainable Environment-CASE) প্রকল্পটি পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের আওতায় পরিচালিত হচ্ছে।
- ২০১৪-১৫ অর্থবছরে মোট ১৮২টি শিল্প কারখানায় বর্জ্য শোধনাগার প্লান্ট (Effluent Treatment Plant-ETP) স্থাপিত হয়েছে। চামড়া শিল্প থেকে ঢাকা শহর ও বড়িগঙ্গা নদীর পরিবেশ দূষণ রোধকল্পে কেন্দ্রীয়ভাবে বর্জ্য পরিশোধনাগার স্থাপনপূর্বক হাজারীবাগের ট্যানারিগুলো সাভারের হরিণধরা এলাকায় স্থানান্তরের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।
- পরিবেশ সংরক্ষণে গৃহীত অন্য আইনগুলো হচ্ছে বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ (সংশোধন) আইন-২০১০, পরিবেশ আদালত আইন-২০১০, জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট আইন-২০১০, বাংলাদেশ জীববৈচিত্র্য আইন-২০১২।
- প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ক্ষেত্রে তাঁর সুদূরপ্রসারী উদ্যোগের জন্য জাতিসংঘের পলিসি লিডারশিপ শ্রেণিতে'চ্যাম্পিয়ন অব দ্য আর্থ-২০১৫' পুরস্কারে ভূষিত করা হয়েছে।

## ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

- ২০২০ সাল নাগাদ বনভূমির হার ২০ শতাংশে উন্নীতকরণ।
- ঢাকাসহ অন্যান্য শহরে বায়ুর গুণগত মান বাড়ানো এবং বায়ু দূষণ কমিয়ে আনা।
- শিল্প কারখানায় বর্জ্য নির্গমন শূন্যতে নামিয়ে আনা।
- ১৫ শতাংশ জলাশয় শুষ্ক মৌসুমে অভয়ারণ্য হিসেবে গড়ে তোলা।
- জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলায় সচেতনতা বৃদ্ধি করা।

ছবি ও তথ্য : চলচিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর

## সুপরিকল্পিত উদ্যোগে পরিচ্ছন্ন রাজশাহী মহানগরীর পরিবেশ

পরিকল্পিত বনায়ন এবং সেই সঙ্গে পরিবেশবান্ধব অন্য বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে রাজশাহী মহানগরীর বায়ুদূষণের মাত্রা উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পেয়েছে।

নগর কর্তৃপক্ষ দাবি করেছে, মহানগরীর এখনকার পরিবেশ গত ক'বছর আগের তুলনায় অনেক বেশি পরিচ্ছন্ন ও বিশুদ্ধ।

'রাউন্ড দ্য ক্লক এয়ার মনিটরিং স্টেশন' এ সংগৃহীত ডাটার উদ্ধৃতি দিয়ে পরিবেশ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক মামুনুর রশীদ বলেন, নগরীর বাতাসে বৃহত্তর বস্তুকণা (পিএম) দ্বারা দূষণের মাত্রা ২০১৪ সালে প্রতি ঘন মিটারে ১৯৫ মাইক্রোগ্রাম থেকে প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ হ্রাস পেয়ে ২০১৬ সালে ৬৩ দশমিক ৯ মাইক্রোগ্রামে দাঁড়ায়, অপরদিকে একই সময়ে ছোট বস্তুকণার পরিমাণ প্রতি ঘন মিটারে ৭০ মাইক্রোগ্রাম থেকে প্রায় অর্ধেক হ্রাস পেয়ে ৩৭ মাইক্রোগ্রামে দাঁড়ায়।

রশীদ বলেন, নগরীর বাস ও কারগুলো দ্রুত সিএনজিতে রূপান্তরিত করে ফেলা এবং অটোরিকশাগুলো ব্যাটারিচালিত হওয়ায় বায়ুদূষণের হার দ্রুত হ্রাস পেয়েছে।

রাজশাহী সিটি করপোরেশনের মেয়র মোসাদ্দেক হোসেন বুলবুল বলেন, সাফল্যটি নীরবে এসেছে কারণ, আমরা বৃক্ষরোপণের দিকে আমাদের মনোযোগ নিবদ্ধ রেখেছি, যা অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে মিলে বায়ু থেকে ক্ষতিকারক কণাগুলোকে পরিষ্কার করে ফেলেছে।

মেয়র বলেন, 'আমরা নিজেরা প্রায় ১০ কিলোমিটার সড়কজুড়ে ৫ হাজারেরও বেশী গাছ লাগিয়েছি এবং ফল বাগান করার জন্য নাগরিকদের উৎসাহিত করেছি। করপোরেশন বৃক্ষরোপণের জন্য ২০০৯, ২০১১, ২০১২ এবং ২০১৩ সালে প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় পুরস্কার লাভ করে বলে তিনি জানান।

মেয়র বুলবুল বলেন, সবুজ গাছের আবরণে সব মাটি ঢেকে দেয়ার লক্ষ্যে আমরা এখনও 'জিরো সয়েল' শীর্ষক একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছি এবং এ পর্যন্ত  এই প্রকল্পের প্রায় ১২ শতাংশ সাফল্য অর্জিত হয়েছে। তিনি

বলেন, সম্প্রতি বৃক্ষরোপণকে উৎসাহিত করতে স্কুলের ছেলেমেয়েদের মধ্যে বিনামূল্যে ২০ হাজার নিম গাছের চারা বিতরণ করা হয়েছে।

আগে পদ্মা নদী থেকে ধুলাবালি উড়ে এসে নগরীর বাতাস দূষিত করত, কিন্তু এখন আমরা নদীর তীরে পার্ক নির্মাণ করেছি এবং চরগুলো কাশবন, ঘাস, ফসল ও গাছপালা লাগিয়ে ঢেকে দেয়া হয়েছে।

তিনি বলেন, ডিজেল বা পেট্রোলচালিত যানবাহনের পরিবর্তে নগরীর রাস্তায় এখন ব্যাটারিচালিত অটোরিকশা এবং গ্যাসচালিত যানবাহন চলাচল করায় কার্বন নির্গমনের হার উল্লেখযোগ্যভাবে কমে গেছে। ট্রাকের মতো ভারী যানবাহন দিনের বেলা নগরীর রাস্তায় চলাচল করতে দেয়া হচ্ছে না।

বুলবুল আরো বলেন, রাস্তাঘাটের পাশের উন্মুক্ত মাটি ফুটপাত নির্মাণ করে ঢেকে দেয়া হয়েছে। পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটানো হচ্ছে, আম বাগানের সংখ্যা বাড়ানো হচ্ছে এবং পরিচ্ছন্নতা কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য পাদদেশ নির্মাণ করা হচ্ছে।

আরসিসির গৃহস্থালি ময়লা-আবর্জনা ও বর্জ্য রাতের বেলা অপসারণ করে তা  যথাযথ স্থানে নিষ্কাশন করার ব্যবস্থাও পরিবেশ দূষণ রোধ করে পরিবেশ উন্নয়নে ভূমিকা রেখেছে।

এ ব্যাপারে চিফ কনজারভেন্সি অফিসার শেখ মামুন বলেন, ‘সরকারি বেসরকারি হাসপাতাল, ক্লিনিক ও ডায়াগনোস্টিক সেন্টার থেকে মেডিকেল বর্জ্য অপসারণের জন্য আমাদের স্বাস্থ্যসম্মত ব্যবস্থাপনা রয়েছে।’

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিবিজ্ঞান বিভাগের সিনিয়র অধ্যাপক খালেকুজ্জামান বলেন, যদি কেউ বিমান থেকে বা কোনো বহুতল ভবনের ওপর থেকে লক্ষ্য করেন তবে তার চোখে রাজশাহী মহানগরী এবং এর আশপাশের এলাকার ক্রমবর্ধমান সবুজায়নের ছবিটি ধরা পড়বে।

কিন্তু মাত্র ক’বছর বছর আগেও পরিস্থিতি এমন ছিল না। তখন পদ্মা নদীর দিক থেকে ধেয়ে আসা গ্রীষ্মকালে ধুলি ঝড়ের ফলে নগরবাসীর কাছে তাপদাহ আরো দুঃসহ হয়ে উঠত। বাধ্য হয়ে তাদের ঘরের দরজা-জানালা বন্ধ করে রাখতে হতো। সেই সঙ্গে মাঠ-ঘাট-রাস্তা থেকে আসা ধুলা এবং ইটভাটা ও গাড়ির ঘন কালো ধোঁয়া তাদের কষ্ট আরো বাড়িয়ে দিত।

অধ্যাপক খালেকুজ্জামান বলেন, এই উদ্যোগ বর্তমান ও ভবিষ্যৎ উভয় প্রজন্মের জন্য একটি নিরাপদ পরিবেশ গড়ে তুলতে উৎসাহিত করেছে।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতত্ত্ব এবং খনি বিভাগের অধ্যাপক চৌধুরী সারওয়ারার জাহান বলেন, ক্রমবর্ধমান নগরায়ণ ও ইটভাটার সংখ্যা বৃদ্ধি সত্ত্বেও রাজশাহী নগরীর বায়ুদূষণ ক্রমেই হ্রাস পাচ্ছে। এই খবর খুবই উৎসাহব্যঞ্জক।

তিনি বলেন, গত ১০ থেকে ১২ বছরে ব্যাপক বনায়ন, ব্যাটারিচালিত যানবাহনের প্রবর্তন, সবুজায়ন বৃদ্ধি এবং ইটের ভাটার চিমনির উচ্চতা বাড়ানোর ফলে তা নগরীর দূষণের মাত্রা হ্রাসে ভূমিকা রেখেছে। এছাড়া নগরীতে তেমন কোনো বড় শিল্পকারখানা নেই, তাই তার পরিবেশে কোনো হুমকি নেই। রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ এবং স্থানীয় সরকার প্রকৌশল বিভাগের মতো অন্যান্য সরকারি সংস্থাও এই মহানগরীতে সবুজায়নের কাজ করছে।

প্রতিবেদন : আয়নাল হক, অনুবাদ : রুহুল গণি জ্যোতি

## বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় নীতিমালা তৈরি করছে পরিবেশ অধিদপ্তর

প্রাথমিক স্তর থেকেই  জৈব ও অজৈব বর্জ্য আলাদা করতে ব্যর্থ হলে গৃহস্থালি ও ব্যবসায়ীদের জরিমানা করার বিধান রেখে 'কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নীতিমালা'র খসড়া তৈরি করেছে পরিবেশ অধিদপ্তর।

পরিবেশ অধিদপ্তরের পরিচালক জিয়াউল হোসাইন বাসসকে বলেন "আমরা ইতিমধ্যে 'বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ১৯৯৫' অনুযায়ী নীতিমালার খসড়া তৈরি করেছি। নীতিমালা বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য খসড়া নীতিমালাটি আমরা শীঘ্রই পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ে পাঠাব"।

জৈব ও অজৈব বর্জ্য আলাদা করার বিষয়ে খসড়া নীতিমালায় একটি বিধান রয়েছে, যেখানে বলা হয়েছে, যদি কেউ এই দুটি বর্জ্য আলাদা করতে ব্যর্থ হয়, তাহলে তাদেরকে সর্বোচ্চ ২ হাজার টাকা জরিমানা করা হবে। এবং একই কাজ পুনরায় করলে সর্বোচ্চ ৪ হাজার টাকা জরিমানা করা হবে।

জিয়াউল হোসাইন বলেন, বর্জ্য রিসাইক্লিং করতে গৃহস্থালির মতো প্রাথমিক স্তর থেকেই জৈব ও অজৈব বর্জ্য আলাদা করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

তিনি আরো বলেন, বর্জ্যকে সম্পদে পরিণত করার স্লোগান নিয়ে বর্তমান সরকার দেশে কার্যকর 'কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সিস্টেম' তৈরী করতে অঙ্গীকারাবদ্ধ। এ লক্ষ্যে বর্জ্যকে রিসাইক্লিংয়ের মাধ্যমে সম্পদে পরিণত করতে হবে। এক্ষেত্রে নতুন নীতিমালা বর্জ্য রিসাইক্লিং করতে বিশেষভাবে সহায়তা করবে এবং দীর্ঘ মেয়াদে দেশের অর্থনীতিতে ব্যাপক অবদান রাখবে বলেও তিনি জানান।

দেশে কার্যকর রিসাইক্লিং শিল্প গড়ে তুলতে জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অধীনে '৩-আর প্রকল্প' ও '৬৪ জেলায় কমপোস্টিং' প্রকল্পসহ বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় সরকার অনেক প্রকল্প গ্রহণ করেছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

পরিবেশ অধিদপ্তরের পরিচালক আরো বলেন, 'পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় খসড়া নীতিমালাটি হাতে পাওয়ার পর আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা করে নীতিমালাটি পর্যালোচনা করবে। আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় পর্যালোচনার পর পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য এটিকে আইন মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হবে'।

খসড়া নীতিমালা অনুযায়ী যদি গৃহস্থালি থেকে জৈব বর্জ্য যেমন, রান্না ঘরের আবর্জনা এবং অজৈব বর্জ্য যেমন কাগজ, প্লাস্টিক, কাঁচ, কাপড়, রাবার এবং

কাঠের আসবাবপত্র তাদের ঘর থেকেই আলাদা না করে, তাহলে গৃহস্থালির মালিককে জরিমানা করা হবে। তাদেরকে জৈব ও অজৈব বর্জ্য আলাদা দুটি পাত্রে ঘরের সামনেই রাখার ব্যবস্থা করতে হবে।

ভবন নির্মাণের ক্ষেত্রে নির্মাণ কাজের আবর্জনা নির্মাণ এলাকার মধ্যেই সংরক্ষণ করতে হবে। যতক্ষণ না সিটি করপোরেশনের বর্জ্য সংগ্রাহকরা এটি সংগ্রহ করে। যদি নির্মাণ কাজের আবর্জনা নির্মাণ সাইটের বাইরে সরানো হয়, তাহলে কন্ট্রাক্টর বা নির্মাণ এলাকার মালিককে জরিমানা করা হবে। ফুটপাতের বিক্রেতা, দোকান এবং রেস্টুরেন্টকেও প্রাথমিক স্তর থেকেই জৈব ও অজৈব বর্জ্য আলাদা করতে হবে। এবং আলাদা দুটি পাত্রে রাখতে হবে। যদি তারা এটি করতে ব্যর্থ হয়, তাহলে তাদেরকে প্রথমবার সর্বোচ্চ ২ হাজার টাকা এবং একই কাজ পুনরায় করার জন্য সর্বোচ্চ ৪ হাজার টাকা জরিমানা করা হবে।

রিসাইক্লিং বিশেষজ্ঞ একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান 'ওয়েস্ট কনসার্নে'র ব্যবস্থাপনা পরিচালক মাকসুদ সিনহা পরিবেশ অধিদপ্তরের কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রকল্পে পরামর্শক হিসেবে কাজ করেন। তিনি বাসসকে বলেন, কৃষি ক্ষেত্রে সারের চাহিদা পূরণ করতে, বর্জ্য ব্যবহার করে সারা দেশে সার উৎপাদন কেন্দ্র তৈরি করাই আমাদের লক্ষ্য'। খসড়া আইনে জরিমানা করার বিধানকে ভালো উদ্যোগ উল্লেখ করে তিনি বলেন, যদি জনগণ বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে সচেতন না হন, তাহলে শুধু আইন আর জরিমানা করে এর কোনো সমাধান করা যাবে না।

বর্তমানে প্রায় ৪ হাজার ৫০০ টন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও এক্ষেত্রে পূর্ণ সফলতা পেতে, বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় জনগণকে সম্পৃক্তকরণ এবং এ বিষয়ে ব্যাপক সচেতনতামূলক কর্মসূচি গ্রহণের ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করেন স্থপতি ও নগর পরিকল্পনাবিদ সিনহা।

তিনি আরো বলেন, বাংলাদেশে কার্যকর কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সিস্টেম তৈরি করতে, আইন বাস্তবায়নের পাশাপাশি বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় জনসম্পৃক্ততা সমান গুরুত্বপূর্ণ।

প্রতিবেদন : তানজিম আনোয়ার, অনুবাদ : সৈয়দ এলতেফাত হোসেন

## দেশের ৬৪ শতাংশ ইটের ভাটা পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তিতে চলছে

সরকারের সহযোগিতা ও দৃঢ়ভাবে আইন প্রয়োগের মাধ্যমে বায়ুদূষণের জন্য অন্যতম দায়ী দেশের ইটভাটার প্রায় ৬৪ শতাংশকে পরিববেশবান্ধব প্রযুক্তির আওতায় আনা হয়েছে।

পরিবেশ অধিদপ্তরের বায়ুমান পরিচালক মো. জিয়াউল হক ইটের ভাটাগুলোকে পরিবেশ বান্ধব প্রযুক্তির অধীনে নিয়ে আসাকে একটি বিরাট অর্জন উল্লেখ করে বাসসকে বলেন, 'ওই সব ইটভাটায় প্রায় ৭০ থেকে ৮০ শতাংশ বায়ুদূষণ কমে এসেছে। আমরা বাকিগুলোকেও দ্রুত পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তির অধীনে নিয়ে আসার চেষ্টা করছি।'

সারাদেশে মোট ৬ হাজার ৬৪৬টি ইটের ভাটা রয়েছে। এর মধ্যে ৪ হাজার ২২৭টি ইট ভাটার মালিক তাঁদের ইটভাটাগুলোকে আধুনিক প্রযুক্তি যেমন 'জিকজ্যাক', 'হাইব্রিড হফম্যান' অথবা 'অটোমেটিক ট্যানেল'-এ রূপান্তরিত করে পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তির অধীনে নিয়ে এসেছেন।

পরিবেশ অধিদপ্তরের সাম্প্রতিক জরিপের তথ্য অনুযায়ী, দেশে এখনও ২ হাজার ৫৪১টি ইটের ভাটা ৮০ থেকে ১২০ ফুট উচ্চতাসম্পন্ন গতানুগতিক চিমনি ব্যবহার করছে, যা বায়ুদূষণে ব্যাপক প্রভাব ফেলছে।

জিয়াউল হক বলেন, গতানুগতিক ধারায় পরিচালিত ইটের ভাটাগুলোকে আধুনিক প্রযুক্তিতে রূপান্তরিত করতে, ইটের ভাটা মালিক সমিতির সঙ্গে জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে আলোচনা অব্যাহত রয়েছে।

সরকার 'ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০১৩' তৈরি করেছে, যা ইট প্রস্তুত করতে ইট কারখানায় গতানুগতিক প্রযুক্তি ব্যবহারের ওপর স্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা জারি করে ২০১৪ সালের জুলাই মাসে কার্যকর করা হয়।

এই আইনে ইটের ভাটাগুলোতে জ্বালানি সাশ্রয়ী এবং তুলনামূলকভাবে পরিচ্ছন্ন প্রযুক্তি যেমন 'জিগজ্যাগ', 'হাইব্রিড হফম্যান কিন', এবং 'ভার্টিক্যাল শ্যাফট ব্রিক কিন' স্থাপন করতে বলা হয়েছে।

আইনে আবাসিক, সংরক্ষিত, বাণিজ্যিক, কৃষি, বন, অভয়াশ্রম, জলাভূমি এবং পরিবেশগতভাবে ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় ইটের ভাটা স্থাপনে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে।

আইনে বলা হয়েছে, নিষিদ্ধ এলাগুলোতে ইটভাটা স্থাপন ফৌজদারি অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে এবং প্রাকৃতিক ক্ষতির মাত্রা অনুযায়ী অপরাধীদের বিভিন্ন মাত্রায় শাস্তি প্রদান করা হবে।

আবাসিক, সংরক্ষিত অথবা বাণিজ্যিক এলাকায় ইটের ভাটা স্থাপন করলে সর্বোচ্চ পাঁচ বছরের কারাদণ্ড বা ৫০ লাখ টাকা জরিমানা অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করা হবে।

আইনে আরো বলা হয়েছে, কেউ ইট উৎপাদন করতে কৃষিজমি, পাহাড় বা গিরিপথ থেকে মাটি সংগ্রহ করে তা কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহার করতে পারবে না।

পরিবেশ অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, ৩৫০টি ইটের ভাটায় 'আইন বাস্তবায়ন অভিযান' পরিচালনা করে নয় কোটি টাকা জারমানা আদায় করা হয়েছে এবং এর পাশাপাশি ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে ৩০টি ইট ভাটা উচ্ছেদ করা হয়েছে।

আইনটিকে আরো বাস্তবমুখী ও সময়োপযোগী করতে, আইনে কিছু সংশোধনী আনার জন্য পরিবেশ অধিদপ্তর, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়কে সম্প্রতি একটি প্রস্তাব পাঠিয়েছে।

পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা বলেন, বর্তমানে আইন অনুযায়ী নির্দিষ্ট এলাকায় ইটের ভাটা স্থাপনের ওপর কিছু বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয়েছে। যদি ওই বিধি-নিষেধগুলো দূর করা যায়, তাহলে ইটের ভাটার মালিকরা পরিবেশ বান্ধব আধুনিক ইটের ভাটা স্থাপনে আরো আগ্রহী হবেন।

বাংলাদেশে ইট তৈরি কারখানা একটি অন্যতম দ্রুত ক্রমবর্ধমানশীল শিল্প। এর বার্ষিক রাজস্ব আয় প্রায় ৮৬৬ কোটি টাকা। এটি গ্রিন হাউস গ্যাস নির্গমনের বৃহত্তম উৎসের একটি। যা প্রতি বছর ছয় মিলিয়ন টন গ্রিন হাউস গ্যাস ($Co_2$) উৎপাদন করে থাকে।

প্রতিবেদন : তানজিম আনোয়ার, অনুবাদ : সৈয়দ এলতেফাত হোসেন

## ঢাকার বর্জ্য পরিণত হবে সম্পদে

উন্নত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে নগরীর আবর্জনা সম্পদে পরিণত করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। পরিবেশ অধিদপ্তর এরই মধ্যে দুটি ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট তৈরির কাজ শুরু করেছে। এ দুটি প্ল্যান্টের মাধ্যমে নগরীর সব বর্জ্যকে সারে রূপান্তরিত করা হবে।

ক্লাইমেট চেঞ্জ ট্রাস্ট ফান্ডের অধীনে প্রায় ৫০০ কোটি টাকা ব্যয়ে এ সার কারখানা দুটি স্থাপন করা হবে। পরিবেশ অধিদপ্তরের নেয়া এই সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট ফোকাস প্রজেক্টটি মূলত ‘থ্রি আর’ (রিডিউস, রিইউজ এবং রিসাইকেল) নামে পরিচিত। ক্লাইমেট চেঞ্জ ফান্ডের সহায়তায় পরিবেশ অধিদপ্তর এ প্রকল্প  বাস্তবায়ন করবে।

থ্রি আর প্রজেক্টের পরিচালক রাহিদ হোসাইন বাসস’কে বলেন, দু’টি সার কারখানা স্থাপনের জন্য ইতিমধ্যে আমরা দুটি জায়গা নির্ধারণ করেছি। একটি নগরীর দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন মাতুয়াইলে এবং অন্যটি উত্তর সিটি কর্পোরেশনের আমিনবাজার এলাকায়। জায়গা দুটির সয়েল টেস্টও সম্পন্ন হয়েছে বলে তিনি জানান।

প্রতিটি কারখানা দৈনিক ২০ টন সার উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন হবে উল্লেখ করে তিনি বলেন, শিগগিরই কারখানা দুটি স্থাপনের জন্য আমরা টেন্ডার আহ্বান করব। আশা করছি আগামী বছরের শুরুতেই আমরা আবর্জনা থেকে সার উৎপাদনে যেতে পারব।

তিনি বলেন, বর্তমান সরকারের প্রধান নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির একটি হচ্ছে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বর্জ্যকে সম্পদে পরিণত করা হবে। প্রথমে এই প্রকল্পটি আমরা পাইলট প্রকল্প হিসেবে শুরু করছি। এখানে সফল হলে আমাদের পরিকল্পনা রয়েছে পরবর্তীতে এই কার্যক্রম সারা দেশে ছড়িয়ে দেয়া।

প্রকল্প পরিচালক বলেন, পরিবেশ অধিদপ্তর এই থ্রি আর প্রজেক্টের অধীনে চারটি বর্জ্য স্থানান্তর স্টেশন স্থাপন করবে, যার দুটি স্থাপিত হবে নগরীর উত্তর সিটি কর্পোরেশনে এবং অন্য দুটি স্থাপিত হবে দক্ষিণ সিটি করপোরেশনে।

এছাড়াও পরিবেশ অধিদপ্তর দেশের ৬৪টি জেলায় বর্জ্য থেকে সার উৎপাদনের লক্ষ্যে আরো একটি প্রকল্প ‘ক্লিন ডেভেলপমেন্ট মেকানিজম (সিডিএম)’

বাস্তবায়ন করছে। আর এই প্রকল্পের অধীনে ইতিমধ্যে রংপুর, ময়মনসিংহ, নারায়ণগঞ্জ এবং কক্সবাজার জেলায় সার কারখানা স্থাপন করা হয়েছে।

ওয়েস্ট কনসার্নের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং পরিবেশ অধিদপ্তরের টেকনিক্যাল পরামর্শক মাকসুদ সিনহা বলেন, আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে সারাদেশে সার কারখানা স্থাপন করা, যেখানে মূলত বর্জ্য ব্যবহার করে সার উৎপাদন করা হবে। এতে করে আমাদের কৃষি কাজে সারের চাহিদা শতভাগ পূরণ হবে।

দেশে উৎপাদিত বর্জ্যের প্রায় ৭০ ভাগেরও বেশি জৈব বর্জ্য উল্লেখ করে সিনহা বলেন, বর্জ্য ব্যবহার করে সার উৎপাদনের জন্য বাংলাদেশে রয়েছে অপার সম্ভাবনা। আর এতে করে বাংলাদেশ যেমন অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হবে তেমনি পরিবেশগত দিক থেকেও লাভবান হবে।

তিনি বলেন, প্রাইভেট সেক্টরকেও সরকার উৎসাহ দিতে পারে বিভিন্ন উদ্দীপনামূলক সহযোগিতা যেমন, লিজ ভিত্তিতে জমি দিয়ে, যাতে করে তারাও স্বল্প খরচে সার কারখানা স্থাপন করতে পারে। যদি বাণিজ্যিকভাবে এই বর্জ্য ব্যবস্থাপনার কাজটিকে লাভজনক করা না যায় তবে উদ্যোক্তারা কখনোই এই ব্যবসার সঙ্গে জড়িত হবেন না ।

তিনি বলেন, মেগা সিটি ঢাকায় দৈনিক প্রায় ৪ হাজার ৫০০ টনেরও বেশি বর্জ্য তৈরি হয়। এসব বর্জ্যকে একটি সঠিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনার আওতায় আনা ছাড়া অন্য কোনো উপায় নেই।

সিনহা বলেন, আমেরিকা, ইউরোপ অথবা জাপানের দিকে তাকালে দেখতে পাই তাদের তুলনায় আমাদের বর্জ্য উৎপাদন অনেক কম। পশ্চিমা বিশ্বে যেখানে জনপ্রতি প্রায় তিন কেজি বর্জ্য উৎপাদন করছে সেখানে আমাদের মাথা পিছু বর্জ্য উৎপাদন মাত্র ০.৫ কেজি। কিন্তু তারা তাদের উৎপাদিত এসব বর্জ্যকে সঠিক উপায়ে পুনঃউৎপাদনের কাজে ব্যবহার করছে যা আমরা পারছি না।

এছাড়াও সিনহা বলেন, পরিবেশ অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ যেমন, সিটি করর্পোরেশনকে নিশ্চিত করতে হবে, যাতে করে রিসাইক্লিংয়ের উদ্দেশ্যে সংগৃহীত এসব বর্জ্য প্রাথমিক পর্যায়ে পৃথক করা হয়।

তিনি বলেন, এজন্য দরকার প্রচার-প্রচারণার মাধ্যমে জনসচেতনতা তৈরি করা, যাতে করে সাধারণ মানুষ জৈব এবং অজৈব বর্জ্য বিষয়ে ধারণা লাভ করতে পারে। যদি সাধারণ মানুষকে বোঝানো যায় যে, এতে তারা লাভবান হবেন তবে তারা নিজেরাই প্রাথমিকভাবে বর্জ্য পৃথকীকরণের কাজটি করবেন।

পরিবেশ অধিদপ্তর দু'বছর আগে নগরীতে প্রায় ১.৮ লাখ ডাস্টবিন বিতরণ করে, যাতে করে সাধারণ মানুষ জৈব এবং অজৈব বর্জ্য নিজেরাই পৃথক করতে পারেন।

প্রতিবেদন : তানজিম আনোয়ার, অনুবাদ : প্রদ্যুত শ্রী বড়ুয়া

## ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় বাড়ছে সবুজ বিনিয়োগ

ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো পরিবেশবান্ধব শিল্প, বাণিজ্য ও অন্যান্য প্রকল্পে সহায়তার লক্ষ্যে স্বল্প সুদে ঋণ দেয়ায় গত কয়েক বছরে দেশে উল্লেখযোগ্য হারে সবুজ বিনিয়োগ বেড়েছে। ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো নিজেদের দৈনন্দিন ও দীর্ঘমেয়াদি কর্মপরিকল্পনায় পরিবেশবান্ধব কর্মসূচিও গ্রহণ করছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের দেয়া তথ্য অনুযায়ী, গত পাঁচ বছরে পরিবেশবান্ধব বিনিয়োগ নিশ্চিত করতে ৫৬টি ব্যাংকের মধ্যে ৪৩টি ব্যাংক এবং ৩৩টি আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ১৬টি বিদ্যুৎ, তৈরি পোশাক শিল্প ও শিল্প কারখানা খাতে ১ লাখ ৯০ হাজার কোটি টাকা ঋণ দিয়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের মুখপাত্র শুভংকর সাহা বাসসকে জানান, বাংলাদেশ ব্যাংক ২০১১ সালের ফেব্রুয়ারিতে সবুজ ব্যাংকিংয়ের জন্য একটি নির্দেশিকা জারি করে। এই নির্দেশিকার অধীনে দেশের সব ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান পরিবেশবান্ধব ব্যাংকিং কর্মসূচি শুরু করে। এরই প্রেক্ষিতে মোট ৫৬টি ব্যাংক এবং ৩২টি আর্থিক প্রতিষ্ঠান নিজ নিজ ব্যাংকিং নীতিমালা ও সবুজ বিনিয়োগ নির্দেশিকা তৈরি করে। কিছু ব্যাংক দেশের বিভিন্ন স্থানে সৌরবিদ্যুৎ দ্বারা পরিচালিত ৫০০টি ব্রাঞ্চ, ২৪৯টি এটিএম বুথ এবং এসএমই ইউনিট চালু করে।

ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো কর্মীদের সবুজ ব্যাংকিংয়ের ওপর নিয়মিত প্রশিক্ষণ দিচ্ছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, ২০১৭ সালের প্রথম তিন মাসে ৫৬টি ব্যাংক এবং ৮টি আর্থিক প্রতিষ্ঠান ২৩৬টি প্রশিক্ষণ আয়োজন করে ৩ হাজার ৭শ’রও বেশি কর্মীকে প্রশিক্ষণ দিয়েছে।

সব ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান এখন কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কাছে তাদের সবুজ ব্যাংকিং কার্যক্রমের ওপর নিয়মিত ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন পেশ করে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নির্দেশনা অনুযায়ী ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো একটি ‘ক্লাইমেট রিস্ক ফান্ড’ গঠন করেছে। প্রতিষ্ঠানগুলোর করপোরেট সোশ্যাল রেসপনসিবিলিটির (সিএসআর) বাজেট থেকে ১০ শতাংশ অর্থ এ খাতে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের ২০০ কোটি টাকা পুনঃবিনিয়োগ স্কিমের সহায়তায় ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো সোলার এনার্জি সিস্টেম, বায়োগ্যাস প্লান্ট

ও ট্রলুয়েন্ট ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টের মতো বিভিন্ন পরিবেশবান্ধব উপকরণের জন্য সহজ ঋণ দিচ্ছে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক নবায়নযোগ্য জ্বালানি, জ্বালানি দক্ষতা, বিকল্প জ্বালানি, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, পুনঃপ্রক্রিয়াকরণ ও পুনঃপ্রক্রিয়াজাত দ্রব্য, পরিবেশ-বান্ধব ইট ভাটা, পরিবেশ-বান্ধব সংস্থাপনসহ আটটি ক্যাটাগরিতে ৫১ ধরনের সবুজ পণ্যের মাত্রা নির্ধারণ করেছে।

এই আটটি খাতের অধীনে বিভিন্ন প্রকল্পে বিনিয়োগের জন্য ৫টি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্রীয় ব্যাংক প্রায় ১৪৬ কোটি টাকা দিয়েছে।

এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের সহায়তায় গ্রিন হাউজ গ্যাস নির্গমন হ্রাস এবং ইটভাটার ধোঁয়া থেকে নির্গত ধোঁয়া পরিশোধনের জন্য গৃহীত 'ফিন্যান্সিং ব্রিক কিন এফিসিয়েন্সি ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট'- চালু করা হয়েছে।

ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের (আইডিএ) অর্থায়নে ফিন্যান্সিয়াল সেক্টর সাপোর্ট প্রজেক্ট (এফএসএসপি)-এর অধীনে বাংলাদেশ ব্যাংক বেসরকারি শিল্প কারখানা, প্রধানত মাঝারি শিল্প সংস্থাকে দীর্ঘমেয়াদি আর্থিক সহায়তা দেয়ার পরিকল্পনা নিয়েছে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সিনিয়র একজন কর্মকর্তা জানান, এই প্রকল্পের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক রফতানীভিত্তিক সংস্থাগুলোর কাছ থেকে ৩৫ কোটি টাকার ৭৩টি প্রকল্প প্রস্তাবনা হাতে পেয়েছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক এসব প্রস্তাবনার মধ্যে থেকে ৮৮৫ কোটি টাকার প্রকল্প অনুমোদন করেছে। এর মধ্যে ১৮টি প্রকল্পের জন্য ৮৮১ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংক ২০১৬ সালের জানুয়ারি মাসে পরিবেশ-বান্ধব রফতানিমুখী পোশাক ও চামড়া শিল্পের টেকসই উন্নয়নের জন্য ১ হাজার ৬০০ কোটি টাকার গ্রিন ট্রান্সফরমেশন ফান্ড (জিটিএফ) নামে এক নতুন দীর্ঘমেয়াদি পুনঃবিনিয়োগ কর্মসূচি চালু করে। যা পরিবেশবান্ধব বিনিয়োগের এক নতুন দরজা খুলে দেয়।

প্রতিবেদন : এ কে এম কামাল উদ্দিন চৌধুরী, অনুবাদ : মাহফুজা জেসমিন

## Good initiatives make Rajshahi air cleaner

Planned afforestation and promotion of eco-friendly practices have helped significantly reduce air pollution in Rajshahi city.

Rajshahi city dwellers are now getting cleaner air than they used to get few years back, city authorities claimed.

Quoting data recorded in 'Round the clock Air Monitoring Station,' Mamunur Rashid, Deputy Director of Department of Environment (DoE), said levels of larger PM (particulate matter composed of various substances such as black carbon and mineral dust) dropped from 195 micrograms per cubic metres in 2014 to 63.9 in 2016, a reduction of about two-thirds and the largest in the world in absolute terms.

Smaller particles also halved to 37 micrograms per cubic metre from 70, it added.

Rashid said emission of toxic gas from motor vehicles went down to a great extent as most of the cars and buses were converted into CNG-run while auto- riskshaws using battery.

Besides, the city authorities have long been carrying out tree plantation and promotion of good practices for improving air quality and maintaining environment, said Mosaddique Hossain Bulbul, Mayor of Rajshahi City Corporation (RCC).

"We planted more than 5,000 trees on 10-kilomtre roads and encouraged citizens for building fruit orchards. The corporation won the prime minister's national award for tree plantation in 2009, 2010, 2011 and 2013," he said.

The city corporation is also implementing a project titled 'Zero soil' to cover all the available top soils with green and various trees," Mayor Bulbul said adding that more than

14,000 neem tree saplings were distributed among school students free of cost recently for transplantation.

The corporation is constructing footpaths covering the open soil on roadsides, improving the drainage system, increasing mango orchards and beefing up the cleansing operations, the mayor said.

RCC's existing practice of night time household waste and garbage removal and dumping those to a remote place has also a significant contribution to reducing environmental pollution.

"We have separate arrangement for collection of medical wastes from both public and private clinics and diagnostic centres and hygienic management of those," said Sheikh Mamun, Chief Conservancy Officer.

Prof Khalequzzaman, a senior teacher in the Department of Zoology of Rajshahi University, said the emerged greenery in and around Rajshahi city would instantly catch one's eyesight if one notices the city's topography from an aeroplane or any multistoried building.

"Massive afforestation and other activities for greenery in the past 10 to 12 years worked for reducing the air pollution level in Rajshahi," said Prof Chowdhury Sarwar Jahan of the Department of Geology and Mining in Rajshahi University.

Apart from RCC, many government agencies like Rajshahi Development Authority, Barind Multipurpose Development Authority and Local Government Engineering Department are also working on improving environment.

Report : Aynal Haque

## DoE drafts rules for better waste management

The Department of Environment (DoE) has drafted Solid Waste Management Rules (SWMR) with provision of imposing fines to household or traders failing to segregate organic and inorganic wastes from the primary sources.

"We have already drafted the rules under the Bangladesh Environment Protection Act 1995. We will send the draft rules to the Environment and Forests Ministry within a week to take necessary steps to enforce it," Ziaul Hossain, Director of DoE told BSS. The draft rules kept a provision to make fine of maximum Taka 2,000 in violating the rules by not segregating the organic and inorganic wastes and maximum Taka 4,000 for repetition of the same offense.

Ziaul said segregation of organic and inorganic wastes from primary source like household is very important to recycling the wastes. He said the present government is committed to build an efficient solid waste management system in the country with the motto of "waste is asset".

"We have to turn waste into asset through recycling. The new rules will give a big boost to the recycling sector of the country and in the long run it will help the economy immensely," he said.

The government has taken a number of projects on solid waste management including the "3R project" and "Composting in 64 districts" under the climate change trust fund aiming at building an efficient recycling industry in Bangladesh. After receiving the draft law, the Environment and Forests Ministry will call inter-ministerial meeting to review it and after getting feedback from the meeting the draft rules will be sent to the law ministry for vetting, the DoE director said.

Under the draft rules, the fines will be applicable to the household if they don’t segregate the organic waste like kitchen garbage and nonorganic wastes including paper, plastic, glass, cloth, rubber, and wood metal from their houses.

The households have to put organic and inorganic wastes in two separate bins in front of their houses. Under the rules, the building construction sites have to keep construction debris covered within their premises until those are picked up by the waste collector of the city corporation. If the debris will be moved outside of the construction site, the contractors or owner of the site will be fined.

The street venders, shops and restaurants have to segregate organic and inorganic wastes from the primary source and keep the waste in at least two separate bins. In failing to do so, they will be fined maximum Taka 2000 for the first time and Taka 4000 for recurrence.

Maqsood Sinha, Managing Director of Waste Concern, and the consultant in the DoE’s solid waste management project said our aim to build composting units across the country to produce compost fertiliser using waste for fulfilling the fertiliser demand of our agriculture sector. Terming the draft rule with provision of imposing fines is a good initiative, Sinha, said only law or charging fines can’t bring solution unless people are not make aware about waste management.

Sinha suggested conducting huge awareness programme as well as involving community in the waste management process to achieve full success in handling such huge waste that is now more than 4,500 tones, generated in Dhaka daily.

Report : Tanjim Anwar

## 64pc brickfields get eco-friendly technology

Nearly 64 per cent of the country's brickfields, widely considered as one of the major sources of air pollution, have so far been got eco-friendly technology, according to official sources.

"So far it's a good achievement. The environment-friendly technology reduced 70 to 80 per cent air pollution of these brickfields. We are trying to bring rest of the traditional brickfields under environment-friendly technology soon," Air Quality Director of Department of Environment (DoE) Ziaul Haque told BSS.

There are 6,646 brickfields across the country. Of these, owners of 4,227 brickfields so far converted their units into environment-friendly ones by modernising with eco-friendly technologies like Zigzag, Hybrid Hoffman or Automatic Tunnel.

According to the DoE's recent survey, 2,541 brickfields are still left with traditional 80 to 120 feet high chimney which are responsible for huge air pollution.

The DoE director said they are continuing discussions with brickfield owners' associations at the national and local levels so that all the remaining traditional brickfields can adopt modern technology.

The Brick Making and Brickfield Establishment (Control) Act 2013, which came into effect in July 2014, clearly prohibits conventional technologies in the brick-making industry.

The act suggests adopting energy-efficient and relatively cleaner technologies such as Zigzag, Hybrid Hoffman Kiln

(HHK) and Vertical Shaft Brick Kiln (VSBK).

The law prohibits establishment of brickfields in residential, protected, commercial and agricultural areas, and also in forests, sanctuaries, wetlands and Ecologically Critical Areas (ECAs).

The law says establishment of brick kilns in the prohibited areas will be treated as a criminal offence, and will prompts varying degrees of punishment to be determined by the nature of the areas involved.

Setting up a brick field in residential, protected or commercial locations will lead to a maximum punishment of five years in prison or a financial penalty of Taka 50 lakh or both.

The law says none can use soil from agricultural land, hill or hillock to make bricks. The DoE official sources said so far law enforcement drives were conducted to 350 brickfields and realized Taka nine crore as fines. Apart from realising fines, the mobile court evicted 30 brickfields.

Recently, the DoE sent a proposal to the Environment and Forest Ministry to bring some amendment to the law to make the existing act on brickfield more effective and time-befitting.

The brick-making industry is one of the fastest-growing sectors in the country, generating around Taka 866 crore revenue a year. It is also one of the largest sources of greenhouse gas emission, producing nearly six million tonnes of $CO_2$ gas annually.

Report : Tanjim Anwar

## Dhaka waste to be made assets

The government is going to set up at least two plants in the capital city at a cost of taka five crore to produce compost fertiliser by using waste as raw material aiming at turning the waste into assets.

The initiative has been taken under a solid waste management focused project called "3R" (Reduce, Reuse, Recycle) being implemented by the Department of Environment (DoE) under the climate change trust fund.

"We have already selected sites and done the soil test for one in Matuail under the Dhaka South City Corporation (DSCC) and for another one in Aminbazar under the Dhaka North City Corporation (DNCC) to set up the plants," 3R project director Rahid Hossain told BSS.

The production capacity of each of the plant will be 20 tonnes per day. “We will go for floating a tender for setting up the plants soon. We are hopeful about going to production of compost fertiliser made from waste by early next year,” he said.

This is a major step in line with the present government’s commitment in establishing a sound solid waste management system in the capital city Dhaka through making waste into asset, Rahid said.

“We are doing this project as pilot basis. We have the plan to replicate this across the country after getting success in the piloting,” he said.

Rahid said under the 3R project the DoE will also build four waste transfer stations in Dhaka.

The DoE is implementing another project titled “Clean Development Mechanism (CDM) aiming to set up compost fertiliser plant from waste in all 64 districts. Under the project, compost plants have already been set up in Rangpur, Mymensingh, Narayanganj and Cox’s Bazar.

Maqsood Sinha, Managing Director of Waste Concern, said more than 70 per cent of municipal solid waste in Bangladesh is biodegradable (organic).

He said in Bangladesh enormous potential exists to convert organic waste into compost to improve existing operations and to provide positive economic and environmental benefits, including increased revenue generation through carbon cofinancing and CDM.

However, Sinha said the government may provide some incentive to the private sector like giving land under lease

basis to set up compost plants. “If we can’t make the waste recycling task profitable in commercial basis, entrepreneur won’t involve in the waste management business,” he said.

Referring that the Dhaka mega city produces more than 4500 tonnes waste per day, Sinha said there is no other alternative to make these waste into asset for establishing a sound solid waste management system.

“If we look to the USA, Europe or Japan, we generate much less waste compare to those countries. Our per capita waste generation is only 0.5 kg daily that is around 3 kg in the western world. But they are managing their waste in a efficient way as they promote recycling,” he said.

Sinha said for establishing the recycling industry in Bangladesh the authorities concerned like city corporations under monitoring of DoE must ensure that waste will be segregated at the primary sources.

“A huge awareness campaign is needed to educate people about the importance of organic and inorganic wastes segregation for recycling. Whenever we can make people understand that the recycling will give them financial benefit, they will start practicing waste segregation from the primary sources,” he said.

The DoE had already distributed some 1.8 lakh of bins with different colours to households at different parts of Dhaka in pilot basis for encouraging people to dump inorganic and organic wastes separately from their houses.

Report : Tanjim Anwar

## Green investment rising on banks' drive

Investment in green initiatives showed significant rise in the past few years as the country's banks and financial institutions (FIs) have disbursed substantial low-cost loan to support eco-friendly industries, businesses and other projects.

The banks and FIs have also adopted green practices in their day to day business and long-term operations.

According to Bangladesh Bank (BB), 43 out of 56 banks and 16 out of 33 FIs in the past five years disbursed over Taka 1 lakh 90 thousand crore to help develop eco-friendly initiatives in the country covering power, garment and some major manufacturing sectors.

"Bangladesh Bank (BB) issued a policy guideline for Green Banking in February, 2011. Under the guideline, all operating banks and FIs have introduced environment-friendly banking activities in the country," BB chief spokesperson Subhankar Saha told BSS.

All the 56 banks and 32 FIs have also developed their own green banking policy and green office guides. Some banks opened around 500 solar powered branches, 249 ATMs and SME units in different parts of the country.

The banks and FIs are now providing regular training to their staff on green banking. BB data shows that 56 banks and 8 FIs arranged 236 training programmes for over 3700 staff in the first three months of this year.

All the banks and FIs are now regularly submit a quarterly report to the central bank on their performance in promoting green banking.

As per the central bank's instruction, banks and FIs have formed a "Climate Risk Fund" with allocating 10.0 per cent of their Corporate Social Responsibility (CSR) budget for this Fund.

With support from BB's Taka 200-crore refinancing scheme, the banks and FIs are disbursing easy loans to promote different green products like solar energy system, bio-gas plant and effluent treatment plant (ETP).

BB has increased the green product line to 51 under eight categories, including renewable energy, energy efficiency, alternative energy, waste management, recycling and recyclable product, environment-friendly brick-kiln, environment-friendly installation and miscellaneous.

The central bank so far released a total of $16.21 million to five participatory banks and FIs against their financing to various projects under these eight sub sectors.

It established a lending scheme namely "Financing Brick Kiln Efficiency Improvement Project", supported by Asian Development Bank (ADB) to help reduce greenhouse gas emissions and refine particulate pollution from brick fields.

BB intended to provide long term financing to private sector firms, mainly midsized manufacturing firms under the Financial Sector Support Project (FSSP) financed by the International Development Association (IDA).

BB in January 2016 opened a new long-term refinancing window named Green Transformation Fund (GTF) of $200 million to ensure sustainable growth of eco-friendly export oriented textile and leather sectors.

Report : A K M Kamaluddin Chowdhury